আমি আলবদর বলছি

কে. এম. আমিনুল হক

কে এম আমিনুল হক ১৯৫৩ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামের আলীনগর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম কে এইচ এম এ গণি সর্বজন শ্রদ্ধেয় কামেল বুজর্গ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার দাদা কে এম আলীমুদ্দিন শাহসাহেব এবং প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী তৎকালে আরবী-ইসলামী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। উভয়ে ছিলেন হাফেজে কুরআন। পুরুষানুক্রমে এই বংশের উর্ধতন মহান ওলীয়ে কামেলগণ দ্বীনী খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। তাঁদের কর্মপ্রবাহ ছিলো ঢাকা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জসহ ব্যাপক এলাকার ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত।

আমিনুল হক দ্বীনী ঐতিহ্যের ধারক এই পরিবারের সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠার কালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণ করেন নিজ এলাকায়। অতঃপর ভৈরব কে. বি. স্কুলে মাধ্যমিক ও ভৈরব হাজী আছমত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেন। কলেজ জীবনে তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হন এবং ভৈরব প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। '৭১-এর উত্তাল সময়গুলো এসে যাওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। তিনি সে সময় পাকিস্তানকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য বিবেকের তাড়নায় সক্রিয় অবস্থান নেন।

'৭১-এর ডিসেম্বরে তাকে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। ধারাবাহিক জুলুম-নির্যাতন ও কারাদণ্ড পরিণত হয় তার ভাগ্যলিপিতে। প্রহসনমূলক বিচারে তাকে চল্লিশ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। কারাবাস কালে গ্রন্থকার এইচএসসি এবং গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৮২ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ইরান সফর করেন এবং একই বছর পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। এছাড়া পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান সফরের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক আমিনুল হকের স্ত্রী আনোয়ারা খন্দকার ঢাকার একটি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে পাকিস্তান যখন অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়েছিল তখন যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করতে পারেনি, পরবর্তীকালে তাদের ঢালাওভাবে দালাল এবং দেশদ্রোহী বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এই অভিযোগে অনেকে নিহত হয়েছে এবং যারা প্রাণে বেঁচেছে তারাও কারাভোগ করেছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে এরকমই ঘটে, যারা বিজয় লাভ করে, তারা ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে বইপত্র লিখিত হয়েছে– প্রচুর না হলেও বেশ কিছু, কিন্তু এ সবই একতরফা। তথাকথিত দালালদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে এ কথা কেউ যেন শুনতেই নারাজ। সেদিক থেকে কে. এম. আমিনুল হকের লেখা "আমি আলবদর বলছি" একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। পাকিস্তান নামক মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে অনেক যুগের সাধনার পর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক বিচার শক্তি হয়ত আপেক্ষিকভাবে দুর্বল ছিল, কিন্তু তাদের দেশদ্রোহী বলতে গেলে শব্দের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে যদি কেউ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে না আসে তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন দল বিদ্রোহ ঘোষণা করা মাত্র পূর্বের জাতীয়তাবোধ সব মিথ্যা হয়ে ওঠে।

অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে সাহসিকতার সঙ্গে আমিনুল হক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।'

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
১৮ই এপ্রিল ১৯৮৯

www.pathagar.com

আমি আলবদর বলছি

কে. এম. আমিনুল হক

www.pathagar.com

প্রকাশক
কে এম আমিনুল হক
সাবিয়ানগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৮৮
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৫ আগস্ট ২০০৩

মূল্য : একশত পঁয়ষট্টি টাকা (সাদা)
দুইশত পঞ্চাশ টাকা (অফসেট)

AMI AL-BADAR BOLCHHI
Written and Published by K. M. Aminul Hoque
Sabianagar, Austagram, Kishorganj
Second Edition 15 August 2003

Price : Taka 165.00, US $ 10 (white)
Taka 250.00, US $ 12 (offset)

www.pathagar.com

আওলাদে রসূল (সাঃ) সৈয়দ মোস্তফা আল মাদানী (রঃ)

এবং

অগণিত শহীদানের উদ্দেশে

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমি আলবদর ছিলাম। একাত্তরের সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব। আমার বিবেকের সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম। কোন দল কোন গোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে অথবা কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একথা সত্য নয়। বন্ধুকের নলের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি তাও নয়।

২শ' বছরের গোলামীর ইতিহাস, সমসাময়িক হিন্দু চক্রান্ত, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের অতীত কার্যকলাপ, তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের দুরভিসন্ধি সব মিলে ২৫শে মার্চের পর আমার বিবেকে একটা ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। আমার তারুণ্যকে পরিস্থিতির সুলভ শিকারে পরিণত হতে মন সায় দেয়নি। বার বার মনকে প্রশ্ন করেছি : এদেশে ইট কাঠ দালানগুলো ও অন্যান্য জড় পদার্থের মত আমি নীরব দর্শক হয়ে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকব? এই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের শেষ কোথায়? যে হিন্দুস্তান তার নিজের দেশে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে মুসলমানদের নিধন করছে, সেই ভারত কী স্বার্থে পূর্ব-পাকিস্তানের আট কোটি মুসলমানদের জন্য দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল?

আওয়ামী লীগের তৎকালীন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ৫৪ হাজার বর্গমাইল একটি ভূখণ্ডকে সেই দেশের মানুষকে দিয়ে পদানত করার ভারতীয় প্রয়াস বলে আমার ধারণা হল। মনে হল এদেশের ৮ কোটি মুসলমানকে দিল্লীর আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত করতে চায় আওয়ামী লীগ। ইসলামী জজবাতের ঘুমন্ত সত্তা আমার মধ্যে জেগে উঠল। আমি সবকিছু জেনে শুনে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পিতা অথবা পিতামহদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেচল্লিশের গণরায়ের সপক্ষে হাতিয়ার তুলে নিলাম। সক্রিয় অংশ নিলাম প্রতিরোধ লড়াই-এ। তারপর রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সব ষড়যন্ত্রের শেষ পরিণতি হল ১৬ই ডিসেম্বর। চূড়ান্ত বিপর্যয় হল। বিচ্ছিন্ন হল দেশ। এক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির গণজোয়ারকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি, পারিনি। দেশের প্রত্যেকটি জনপদ রাজপথ গ্রাম আর গঞ্জে দেশপ্রেমিক মানুষগুলো লাঞ্ছিত রক্তাক্ত হল। মীরমদনরা নিক্ষিপ্ত হল মীরজাফরের কারাগারে। আমিও কারা প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ হলাম। আমার ৪০ বছর কারাদণ্ড হল। আমি দেখেছি বিচারক নিজেই ছিলেন আমার চেয়ে অসহায়।

এরপর পদ্মা মেঘনা যমুনায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। মুজিবের প্রতিশ্রুত ৩ বছরও পেরিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর হতাশা, নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক সংকট ঘিরে বসল গোটা জাতিকে। গলাবাজি আর সন্ত্রাস দিয়ে বিবেকবান প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকল। কিন্তু তবু মুজিব ধুমায়িত গণ-অসন্তোষকে ঢাকতে ব্যর্থ হল। পনের আগস্ট সূর্য ওঠার আগেই সুপ্তোত্থিত মোহমুক্ত দেশপ্রেমিক সৈনিকদের গুলীতে মুজিবের বুক বিদীর্ণ

www.pathagar.com

হল। তার খুন আর লাশের ওপর পা দিয়েই সম্ভবত সেদিন এদেশে সূর্যোদয় হয়েছিল। বুক ভরা নিঃশ্বাস নিয়েছিল এদেশের কোটি কোটি মানুষ। সেদিন তার ঠ্যাঙারে বাহিনী লাল নীল বিচিত্র বাহিনী তার সমর্থক জালেম লুটেরার দল ভীরু শৃগালের মত লুকিয়ে ছিল অন্ধকার গহ্বরে। সেদিন বাঙালীর চোখে অশ্রু নয় উল্লাসের হাসি দেখেছিল পৃথিবী।

আমরা কারাগার থেকে জাতীয় জীবনের এই নাটকগুলো নীরব দর্শকের মত দেখলাম। বোবা শ্রোতার মত শুনে গেলাম অনেক কিছু। আমাদের কি করণীয় আছে? একাত্তরে আমাদের বিবেক আমাদের সত্তা সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের হাত আছে হাতিয়ার নেই তূন আছে, তীর নেই।

কারাগার ছিল একটি নাট-মঞ্চ। দৃশ্যপট বদলের সাথে সাথে এই মঞ্চে আসতে শুরু করল নতুন নতুন মুখ। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, দলনেতা, কর্মী ও অনেকেই। যারা এইমাত্র ক্ষমতাসীন ছিলেন তাদেরও ঠিকানা হল এই কারাগার। কালের সাক্ষী হয়ে আমরা সবকিছু দেখেছি। এই কারাগারে ডান, বাম, মধ্য সবপন্থী নেতা ও উপনেতাদের পেয়েছি তাদের অনেকের সাথে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে। স্মৃতি থেকে যতটুকু পেরেছি, আমার এই সাজান স্বরলিপিতে টেনে আনার চেষ্টা করেছি। এর বাইরেও রয়েছে অনেক কিছু। পরবর্তীতে তুলে ধরার আশা রাখি।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। কারাগার থেকে বেরিয়ে আমার সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া অবশিষ্ট কিছু ছিলনা। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। স্মৃতি রোমন্থনের সময় কোথায়? কারাগারের শেষ দিনগুলোতে এ. কে. এম শফিউল্লাহ ও মোহাম্মদ ফারুক ডায়েরী সরবরাহ করে স্মৃতিগুলো লিখে রাখার জন্য। নৈরাশ্য অথবা আলস্য, যে কারণেই হোক না কেন সেগুলো ঠিকমত লিখে রাখা হয়নি। তবে স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে এখনও অনেক কিছু। এর কিছুটা এই বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনেক দেরী হলেও বইটা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। অবশ্যি এর জন্য বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশও অপরিহার্য ছিল। বইটিতে আমার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। আমি লুকোচুরি রাখঢাক অথবা ডিপ্লোম্যাসির আশ্রয় নিইনি। কাউকে ক্ষুণ্ন করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল আমার বিশ্বাসকে তুলে ধরেছি। আমার বিশ্বাস অহিপ্রাপ্ত অথবা সমালোচনার উর্ধে এমনটি নয়। নিয়মতান্ত্রিক সমালাচনাকে আমি স্বাগত জানাব।

আমার অতীত জেনে শুনে যে মহিলা আমাকে বিয়ে করেছেন সেই আনোয়ারা খন্দকার বেবীর প্রেরণায় বইটা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় যেভাবে আলবদরকে বর্বরতার প্রতীক হিসাবে দাঁড় করান হয়েছে, এতে ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়া একজন মহিলার আমার প্রতি বিরূপ ছাড়া অনুরক্ত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এমন কোন প্রাচুর্যের জৌলুসও আমার ছিলনা। আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের একতরফা বিশ্রী প্রচারণায় প্লাবিত সমাজের একজন হয়েও আনোয়ারা আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। শুরু থেকে চাপ দিয়ে আসছে আমার অভিজ্ঞতায় নিরপেক্ষ কিছু লেখার জন্য।

www.pathagar.com

তার ভাষায়– 'ইতিহাস তার নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে চলে। একদিন নিরপেক্ষ নির্ভেজাল ইতিহাস লেখা হবে। সেই আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের জন্য কিছু তথ্য রেখে যেতে পার।' আনোয়ারার সাধ কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি জানি না। তবে আমার বিক্ষিপ্ত কলমের আঁচড় আলোর মুখ দেখতে পেয়েছে তারই প্রেরণায়– একথা বলতে দ্বিধা নেই।

মীর কাসেম আলী মিন্টু ভাই, বিশিষ্ট ব্যাংকার মান্নান ভাই ও আশরাফ ভাই কারাগারে থাকা অবস্থায় আমাকে কিছু লেখার জন্য বলতেন। তাদের সেই প্রেরণাও বইটি লেখার ব্যাপারে শক্তি যুগিয়েছে। আকবর আলী সরকার, মঞ্জুর কাদের ও শফিক ভাই বলতে গেলে এ ব্যাপারে আমার সক্রিয় সহযোগী। এ ছাড়াও বইটি প্রকাশনায় সহযোগিতা করার জন্য আবদুস সাত্তার চোকদার, ডাঃ আবদুল হালিম, বজলুর রহমান শাহীন, আলী আহমদ, অধ্যাপক মাহতাবউদ্দিন প্রমুখের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন জনের সাথে আমার বিভিন্ন সংলাপ আমি সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার এই লেখা কতখানি সুখপাঠ্য ও সমাদৃত হবে সেটা আমার জানার কথা নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের ওপর আমার বইটির সঠিক মূল্যায়নের ভার দিচ্ছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণ জনিত কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল। আশা করি পাঠকগণ সেটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবু সব রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অনেক তাকিদ পেয়েছি। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের জন্য যারা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাঃ আফসার সিদ্দিকী, আবদুল লতিফ, ডাঃ আলতাফ হোসাইন খান, বিশেষজ্ঞ ডাঃ মঞ্জুর মোরশেদ, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুর্তুজা, আখতারুজ্জামান ও জাকির হোসেন মুকুল প্রমুখের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে, এত জটিল জীবনযাত্রার মাঝেও সময় করে সাধ্যমত বইটা ছেপে পাঠক-সম্মুখে উপস্থিত করতে পারলাম বলে মহান আল্লাহর নিকট অনন্ত শুকরিয়া।

আমিনুল হক
সাবিয়া নগর, অষ্টগ্রাম
কিশোরগঞ্জ

১৫ আগস্ট, ২০০৩

www.pathagar.com

এক

একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর। কিশোরগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ও হিন্দুস্তানী সেনার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রচণ্ড প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজাকার, আলবদর, মুজাহিদ ও পুলিশের মৃত্যুকামী সদস্যরা। ১৬ ডিসেম্বরে হিন্দুস্তানের হাতে পাকিস্তানী বাহিনী অস্ত্র সমর্পণের পর যে বিজয় সূচিত হয়েছে, কিশোরগঞ্জের প্রতিরোধ যেন তার কলঙ্কের তিলক। অসংখ্য সেল প্রতিনিয়ত এসে পড়ছে শহরের বিভিন্ন অবস্থানে। দালানগুলোর ইট খসে খসে পড়ছে। হতাহতের খবরও আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। গুলী, অজস্র গুলী, বৃষ্টির মত গুলী, তবু কারো দুঃসাহসে চিড় ধরেছে বলে মনে হয় না। প্রতিরোধের প্রচণ্ড নেশায় উন্মত্ত সকলে। কিশোরগঞ্জের এই প্রতিরোধকে বিশাল সমুদ্রের ছোট একটি ঢেউ অথবা বুদ বুদ কোনটি বলব সেটা আমার জানা নেই। ঝঞ্ঝা অথবা ঝড়ো হাওয়ার উন্মত্ততা শেষ হয়েছে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পরেই, অর্থাৎ আগের দিন। কিন্তু কিশোরগঞ্জে ঝড় তখনও। তখনও প্রচণ্ড লড়াই। আমি জানি এর শেষ কোথায়। রসদের পরিমাণও আমার জানা। সরবরাহের সম্ভাবনা আর কোন দিনই আমাদের সামনে আসবে না। আমার জানবাজ সহকর্মীদের সামনে পশ্চাৎ অপসারণ অথবা আত্মসমর্পণের কথা বলবার দুঃসাহস আমার নেই। ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা। এতগুলো জীবনের ঝুঁকি! অন্তহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমার আপোষহীন সিপাহীরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। আমি উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছি এক বাংকার থেকে আর এক বাংকারে, এক ট্রেঞ্চ থেকে আর এক ট্রেঞ্চে, এক অবস্থান থেকে আর এক অবস্থানে। সবার একই ভাষা, সেই ১৪শ' বছর আগের কারবালার ভাষা, যে ভাষায় হযরত হোসেনের (রাঃ) প্রতি তাঁর সহগামীরা আনুগত্য ব্যক্ত করেছিলেন। উৎকণ্ঠা কারো নেই। সবার চোখে আর চাওনিতে অব্যাহত লড়াইয়ের দৃপ্ত শপথ ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার মন থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। আমার সহকর্মীদের মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করার ইচ্ছার মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি। ১৪শ' বছর পর কারবালার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমার মনকে আমি তৈরী করে ফেলেছি।

www.pathagar.com

বেলা গড়িয়ে এলো। সূর্যটা অস্তাচলে। গোধূলির রঙ আমি দেখছি। এ রঙে পৃথিবী এমন করে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। আকাশটা লালে লাল। সূর্যটার বুক বিদীর্ণ হয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আহত সূর্যের গোঙ্গানি যেন রণাঙ্গনে বিমূর্ত। মনে হয় রক্তাক্ত পথ দিয়েই সূর্যোদয় ঘটে। রক্ত-পিছল পথ দিয়েই সূর্যটা অস্তাচলে ঢলে পড়ে। দুনিয়ার মানচিত্রে পাকিস্তানের অভ্যুদয়, কত অজস্র জীবনের বিনিময়ে। কত খুন আর আগুনের পথ অতিক্রম করে মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২শ' বছরের গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়েছে। মানচিত্রের একটা দিক থেকে পাকিস্তানের চিহ্ন মুছে ফেলতে তেমনি রক্ত ঝরবে এটাই স্বাভাবিক।

মসজিদ থেকে আযান ভেসে আসল। "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।" আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমার মন-মানসিকতা আবার যেন শানিত হয়ে উঠল। না, কোন শক্তির কাছে নয় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করাই আমাদের মঙ্গল। পানি নিয়ে ওযু করতে বসলাম। অন্তহীন ভাবনা। এ জাতির অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে আমার দু'চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে এলো। অশ্রু আর ওযুর পানিতে একাকার হয়ে গেল আমার মুখমণ্ডল। আল্লাহ্র দরবারে হাত তুললাম– 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া মাবুদ, ইয়া যাজা ও সাজার মালিক, সমস্ত জাতিকে কতিপয় উচ্চাভিলাষী রাজনীতিক অন্ধ করে রেখেছে। আমার এ বেগুনাহ কাওমকে রাজনীতিকদের গুনাহগারীর সাজা দিও না। তোমার ঐশী আযাব থেকে এদের আশ্রয় দাও।'

প্রাণ ভরে নামাজ পড়লাম। তখন প্রত্যেকটি নামাজই মনে হত আমার জন্য শেষ নামাজ। মাগরেবের নামাজের বেশ কিছুক্ষণ পর নেজামে ইসলাম পার্টির প্রধান সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা আতাহার আলী সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি তার জামেয়া এমদাদিয়া থেকে আমাকে তলব করেছেন। আমি মোটেও বিলম্ব না করে তার কাছে ছুটে গেলাম। পৌঁছে দেখলাম মহকুমা অফিসার জনাব আবদুর রহিম, মহকুমা পুলিশ অফিসার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বসে রয়েছেন। আওয়ামী লীগের মহকুমা সেক্রেটারী অধ্যাপক জিয়াউদ্দিনকে দেখেই আমি ভয়ঙ্কর মানসিক বিপর্যয় অনুভব করলাম। মওলানা আতাহার আলী এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক নেতা, তিনি আমাদের অনেকের আপোষহীন প্রেরণার উৎস। তাঁর শত শত অনুগামী এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সক্রিয় অংশীদার। যাই হোক, আমি সালাম দিয়ে তার কোন নির্দেশ, বক্তব্য অথবা পরামর্শের প্রত্যাশা করছিলাম। আমার যেন মনে হচ্ছিল,

www.pathagar.com

তিনি কোন এক আপোষ ফর্মুলায় উপস্থিত হয়েছেন। আমি দৃষ্টি অবনত করে বসে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। মাথা উঁচু করে মাঝে মাঝে দেখছিলাম, মওলানা অপলকে তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে। তাঁর অশ্রুসজল সকরুণ চাওনি আমাকে বিব্রত করছিল ভয়ঙ্করভাবে। নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, "আমিন, কুদরতের ফায়সালা আমাদের সপক্ষে নেই। ৫৪ হাজার বর্গমাইলের পাঁচ-দশ বর্গমাইল প্রতিরোধের প্রাচীর দিয়ে বিভ্রান্তির জোয়ার আটকাতে পারবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, আমি মনে করি রক্তক্ষরণের চাইতে অস্ত্রসংবরণই উত্তম। হক-বাতিলের ফয়সালা আগামী দিনগুলোর জন্য রেখে দাও।" তাঁর এই বক্তব্যে অনেক বেদনা, অনেক অন্তর্জ্বালা আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পেলাম। মওলানা আতাহার আলীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস আমার নেই। কেননা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। তার সহযোগিতায় এবং সৎ পরামর্শে সমস্ত অন্যায় অপকর্মের ভাগাড়গুলোকে আমি নির্মূল করতে পেরেছি। আমার এও বিশ্বাস ছিল যে তিনি কোন অন্যায় অযৌক্তিক পরামর্শ দিতে পারেন না। এ ছাড়াও আমাদের এই বয়সটা আবেগ দ্বারা তাড়িত, আর তিনি এর বাইরে থেকে পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে দেখছেন। আমি তার নির্দেশ মেনে নিলাম সহজভাবে। আমি মোটেও দেরী না করে মওলানা আতাহার আলী সাহেবকে তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। দেখলাম অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন প্রচণ্ড আক্রোশে আমার দিকে চেয়ে আছে। ফিরে এলাম আমার ডেরায়।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন অবস্থান থেকে সমস্ত গ্রুপের কমান্ডারকে ডেকে পাঠালাম। পরামর্শে বসলাম। অনেকেই শেষ অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করল। কিন্তু এর শেষ কোথায়? আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, রক্তাক্ত পরিণতি ছাড়া এর আশাব্যঞ্জক কোন দিকই অবশিষ্ট নেই। আরও বললাম, মওলানা আতাহার আলী যুদ্ধ-বিরতির সপক্ষে সুপারিশ করাতে তাঁর অনুসারী মুজাহিদরা রণেভঙ্গ দিবে। এছাড়াও গুলীর মওজুদ নিঃশেষের পথে। এ নিয়ে হয়তো বা কয়েক ঘন্টা অথবা কয়েকদিন লড়তে সক্ষম হব। কিন্তু তারপর? তারপরও যদি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে কোন বাহিনীর এগিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে যে কোন ঝুঁকি নেয়া সঙ্গত মনে করতাম। বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, সময় ও সুযোগমত যে যখন পারে আমার জানবাজ যোদ্ধারা রণাঙ্গন পরিত্যাগ করবে। আমাদের একটা সুবিধা ছিল যা পশ্চিম

www.pathagar.com

পাকিস্তানীদের ছিল না। তা হল, গণ- আবরণে গা ঢাকা দেওয়ার সুবিধা। যেহেতু আমাদের ভাষা, বর্ণ, পোশাক-আশাক এবং চলাফেরার ব্যাপারে প্রতিপক্ষদের সাথে কোন ব্যবধানই ছিল না। সবাই মোটামুটি যুদ্ধকে এড়িয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও রাত ১০টা নাগাদ মওলানা আবদুল জব্বার সাহেবের ছেলে ইমদাদুল হক এবং শহীদুল্লাহ আমাকে না জানিয়ে মুজাহিদ, রাজাকার, আলবদর ও শহরের অতি উৎসাহী মানুষদের নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সপক্ষে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে। দেখলাম, ইসলামের সৈনিকদের আত্মোৎসর্গ করার উদ্দীপনা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমার সহকর্মী অসংখ্য তরুণ-প্রাণের করুণ পরিণতির কথা ভেবে আমার বুক চাপড়াতে ইচ্ছে করছিল। ক্রমশ আমরা অসহায়ত্বের দোর গোড়ায় এগিয়ে চললাম। আমাদের দুর্জয় বন্দুকের নল ধীরে ধীরে বোবা হয়ে গেল। ১৮ তারিখ সকালে ইমদাদুল হক এবং শহীদুল্লাহকে মুক্তিফৌজরা নির্মমভাবে হত্যা করল। অন্যদিকে রাত্রেই আর এক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম, রাজাকার প্রধান মওলানা মহিউদ্দিন আযমী সম্ভবত মুক্তিবাহিনীর সহানুভূতি পাওয়ার প্রত্যাশায় এক অতি উৎসাহী ভূমিকা নিলেন।

জামেয়া এমদাদিয়া থেকে মাইক নিয়ে মওলানা আযমী সর্বত্র ঘোষণা দিলেন যে, আগামীকাল মুক্তিফৌজ অমুক অমুক সড়ক দিয়ে প্রবেশ করবে। আমাদের ভাইয়েরা তাদের প্রবেশ পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে অভিনন্দন জানাবে। এবং শহীদি মসজিদের সম্মুখভাগে আমাদের বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করবে। চুক্তিমত কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। এমন কি কোন প্রতিশোধ নেয়া হবে না। মওলানা আযমীর এই ঘোষণাও ছিল আমার নির্দেশের বাইরে। মওলানা আযমী হয়তো পরিস্থিতির চাপে বিদিশা হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতির মত ভেবে বসেছিলেন। কিন্তু এরও পরিণতি শুভ হল না। শহরে ঢুকে মুক্তিফৌজদের প্রথম গুলী যার বুক বিদীর্ণ করল, তিনিই হলেন সেই মহিউদ্দিন আযমী। এ ছাড়াও মওলানা হেদায়েত উল্লাহসহ আরো পাঁচ-ছয় জনের শাহাদতের খবর আমার কাছে এসে পৌছল।

ওদিকে রাত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে একটি খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ মাযহারুল হক এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর দান করি। আমাদের প্রতি ডাক্তার সাহেবের ছিল অন্তহীন সহানুভূতি।

আত্মীয় পরিজন, জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও আরো অনেকেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করে

www.pathagar.com

নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। তারা বললেন নিরাপদ আশ্রয়ে আমাকে সরে যাওয়ার জন্য। জাতীয় বৃহৎ স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার উল্লেখ করলেন। এ সত্ত্বেও আমার মন সাড়া দিল না মোটেও। কেননা আমার শত শত জানবাজ সহকর্মীদের অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলে যেতে বিবেক সায় দিল না। আমি আমার নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও রয়ে গেলাম।

সকালে এলাকার ৩০জন নেতৃবৃন্দসহ ডাক্তার মাযহার সাহেবের বাসায় সমবেত হলাম। তার চোখে মুখে চিন্তা আর উদ্বেগের ছায়া। কিন্তু ম্লান হেসে বারবার তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন। তার চাওনিতে দুঃশ্চিন্তার স্পষ্টতা দেখে মনে হল সম্ভবত তিনি মুক্তিফৌজদের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। কেননা তিনি শহর ঘুরে দেখে এসেছেন, মুক্তিফৌজরা শত শত মানুষকে শহরে ঢুকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে। মনে হল তিনি ভাবছেন, তাকে উপেক্ষা করে তার আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর হয়তো বা মুক্তিফৌজ চড়াও হতে পারে। আমি বললাম, "ডাক্তার সাহেব, আমাদের চাইতে সম্ভবত আপনি নিজেই অসহায়ত্ব অনুভব করছেন বেশী। আপনার অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না। এর চেয়ে মুক্তিফৌজ চড়াও হবার আগে আপনি আমাদেরকে হিন্দুস্তানী বাহিনীর কাছে সমর্পণ করে দিন।" কিংকর্তব্যবিমূঢ় ডাক্তার সাহেব আমার কথা থেকে যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। আমর কথাগুলো তার পছন্দ হল। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ভারতীয় কর্ম-কর্তাদের নিকট টেলিফোন করলে সেনাবাহিনী এসে আমাদেরকে তাদের হেফাজতে নিলো। তখন সম্ভবত বেলা ২টা হবে। হিন্দুস্তানী সৈনিকরা আমাদেরকে নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে তাদের হেফাজতখানার দিকে নিয়ে চললেন। পথে মুক্তিবাহিনীর একটি দলের সাথে দেখা হল। তারা সম্মানিত নেতা মওলানা আতাহার আলীর পায়ে ধরে সালাম করলো, এদের অন্যতম ছিলেন ক্যাপটেন মতিউর রহমান। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত মেজর। যাই হোক, ইতিমধ্যে আমরা সরকারী হাইস্কুলে এসে পৌঁছলাম। এখানকার কমনরুমে সেনবাহিনীর হেফাজতে আমাদের রাখা হল।

আছরের সময় ন্যাপের একটা দলকে আমাদের অবস্থানের দিকে আসতে দেখলাম। এরা প্রত্যেকেই চাদর গায়ে দেয়া। কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "আলবদর কমাণ্ডার কোথায়?" আমি বেরিয়ে এলাম। আমার বাহিনীর গ্রুপ কমাণ্ডার জাকির ভাইকে ডেকে বাইরে আনা হল। প্রত্যেকের চাদরের মধ্য থেকে লোহার

www.pathagar.com

রড বেরিয়ে এলো। শুরু হল লোহার রড দিয়ে নির্মম নির্যাতন। জাকির ভাইয়ের মাথা ফেটে দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন জাকির ভাই। আমার উপর চলতে লাগল একই নির্যাতন। একজন আঘাতের পর আঘাত করে ক্লান্ত হলে আর একজন শুরু করে। এভাবে ক্রমাগত নির্যাতনে আমার শরীর নেতিয়ে পড়ল। ডান হাতে পেলাম প্রচণ্ড আঘাত। জাকির ভাইয়ের মত আমার মাথা হয়তো ক্ষত বিক্ষত হবে এমন আশঙ্কা করে আমি বাম হাতে লোহার রড চেপে ধরলাম। তিন চার জনে টানা-হেঁচড়া করেও ওরা আমার হাত থেকে রড ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল না। ইতিমধ্যে হিন্দুস্তানী সেন্ট্রী এসে পড়ায় আমি নিষ্কৃতি পেলাম। ওদিকে আর এক দল হলের ভেতর প্রবেশ করে মওলানা আতাহার আলী সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দিল। তিনিও নিমিষে রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন। আর একজন নির্যাতন চালিয়ে এডভোকেট বদরুজ্জামানের হাত ভেঙ্গে দিল। মুসলিম লীগ নেতা এমপি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব আবদুল আওয়াল সাহেবের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালানো হল। এতে তার ডান হাত ভেঙ্গে যায়। তার সুস্থ হতে অনেক দিন সময় নেয়। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং জনপ্রিয় এমপি। সোলাইকার চেয়ারম্যান তারামিয়া ও তার বড় ভাই বাদশাহ মিয়ার ওপর নির্যাতন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। উভয়েরই পুরুষাঙ্গ দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলিং ফ্যানের সাথে সংযোগ করে সেটা পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে তাঁদের আর্তচিৎকার ও আহাজারিতে কারবালার ভয়াবহতা প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁদের প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। মোটের উপর আমরা সবাই সেইসব জাহেল বুজদীল ও কাপুরুষের খেলার সামগ্রীতে পরিণত হই।

রাত এগারটা। ন্যাপের নেতৃবৃন্দকে আমাদের অবস্থানের চারিদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হান্নান মোল্লা আসগর ভাইয়ের কাছে এসে বলল, "যা করেছেন তার প্রায়শ্চিত্য আপনাদের পেতে হবে।" সম্ভবত হান্নান মোল্লা আসগর ভাইয়ের ক্লাসমেট বলে সে তার উপর নির্লজ্জ আক্রমণ চালাতে পারেনি।

অন্যদিকে মোমেনশাহী জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি কাজী আবদুল বারী ও তার সহকর্মীরা বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করে চিৎকার করে বলতে থাকে, "অষ্টগ্রামের আমিন ও দৌলত মওলানা কোথায়?" হান্নান মোল্লা আমাদের কক্ষ থেকে জবাব দিল 'না' এখানে নেই, এখানকার সকলেই শহরের।' সম্ভবত সে আমাদের চিনতো না। দৌলত মওলানা আমার কানে কানে বললেন– 'আমিন, বলে ফেলি

www.pathagar.com

যে আমরা এখানে আছি। কাপুরুষের মত লুকিয়ে থাকতে মন চাচ্ছে না।' আমি তাঁকে নিষেধ করলাম। সবাই যেন নির্যাতন দেখে দেখে এবং মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাজী বারীরা চলে গেল।

পরে জানতে পারি, অষ্টগ্রামে জনসভা করে তারা জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের প্রত্যাশায় মাতাল মানুষগুলোর কাছ থেকে আমাদেরকে প্রকাশ্য ফাঁসী দেয়ার সপক্ষে সম্মতি আদায় করেছে।

রাত ১১টার দিকে মওলানা আবদুল হালিম পাকুন্দিয়া ও ক্যাপটেন মতিউর রহমান এলেন। তাঁরা উভয়েই মওলানা আতাহার আলী সাহেবকে সহানুভূতি জানালেন। মওলানা আবদুল হালিম সাহেব তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্ভবত মওলানাদের মধ্যে পাকুন্দিয়া সাহেবই ভারতীয় বাহিনীর সহযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু কেন, তা আমার জানা নেই। তবে তাঁর প্রতি কারো অশ্রদ্ধাও দেখিনি।

ক্যাপটেন মতিউর রহমান আমার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন– "দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সোচ্চার, সে জামায়াত কি করে ইয়াহিয়ার নিপীড়নের সহযোগী হতে পারল!' তাঁর ঐ বক্তব্য থেকে আমার মনে হল জামায়াতের অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর ক্যাপটেন মতিউর রহমানের ধারণা স্বচ্ছ। অন্তত একটা ব্যক্তিকে আমি পেলাম, সীমাহীন রাজনৈতিক ধূম্রজালের মধ্যেও যার অন্তরে রয়েছে সচেতন বিবেকের ক্ষীণ স্পন্দন। আমি জানি, আজ নয়, সময়ের আবর্তে একদিন বিবেকের এই ক্ষীণ স্পন্দনই বেগবান হয়ে উঠবে। আমি কোন জবাব না দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। এরপর এলেন সাবেক SDO খসরুজ্জামান। তার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৭০ সালে আমি যখন ভৈরব কলেজের ছাত্র এবং ভৈরব ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি, তখন SDO খসরুজ্জামান ভৈরব প্রেসক্লাবের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলেন, পাকিস্তান আন্দোলন অথবা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আলেম সমাজের কোন ভূমিকা ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি আলেম সমাজকে পরগাছা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালান। আমি প্রেসক্লাবের সদস্য হিসেবে এর প্রতিবাদ জানাই। যাই হোক, স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে জনাব খসরুজ্জামান কিশোরগঞ্জের ব্যাংকসমূহ লুট করে ভারত পলায়ন করেন।

www.pathagar.com

তিনি আমার বন্দী কক্ষে প্রবেশ করে উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বলেন– 'আমিন কোথায়?' আমি দাঁড়ালে তিনি বলেন, "দু'পয়সার ইসলামের জন্য জেহাদ করেছিলেন। এখন আমার হাতে পিস্তল থাকলে গুলী করতাম।" মওলানা আতাহার আলী সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেন– "শিয়ালের কান্না গেল কোথায়? শিয়ালের কান্নায় পাকিস্তান রক্ষা হল না? ঘৃণা হয়, এদের মুখ দেখতে।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনাব খসরুজ্জামান ছাত্র সংগঠন এনএসএফ-এর সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মোজাফ্ফর ন্যাপের সাথে জড়িত হন।

সেই একই রাত্রে মুক্তিফৌজ আমার ৫শ' টাকা আর হাতঘড়িটা নিয়ে গেল। এছাড়াও যার কাছে যা ছিল সবই তারা জোর করে ছিনিয়ে নিল। সকালবেলা আমরা হিন্দুস্তানী ফৌজদের জানালে তারা সেইসব মুক্তিফৌজদের কাছ থেকে অপহৃত টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়। কিন্তু সেসব কোন দিনই আর ফিরে আসেনি। আমরা জানতাম কোন দিন ওসব আর ফিরে আসবে না। আন্দোলনের শুরু থেকে দিনে দিনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে যে লুট করার মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন কোন যাদুর কাঠি নেই যা দিয়ে এ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অবাঙালীদের সম্পদ লুট করার মধ্য দিয়ে কর্মীদের বিবেককে কেড়ে নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তারা গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মানুষের সম্পদ লুট করে। লুট করে অগণিত কুমারী মেয়ের ইজ্জত। পক্ষান্তরে আমরা বিশেষ করে আলবদরের কথা বলছি, সাধারণ কর্মীদেরকে কড়া দৃষ্টির মধ্যে রাখতাম। কোন দুর্বলতা কোন অভিযোগ কোনভাবে এসে পড়লে তড়িঘড়ি এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হত। এমন কি আমাদের চোখের সামনে কারো দ্বারা কোন অঘটন ঘটলে তার প্রতিকার করেছি আমরা নিজেরাই।

যাই হোক, একদিন ছাত্রলীগের ভিপি আফজাল জানিয়ে গেল, তার ভাষায় 'বঙ্গবন্ধু' ফিরে আসলে বিচার করা হবে। কাউকে আর মারা হবে না। তবে লড়াই করলেও আপনাদের ব্যাপারে কোন নোংরামীর দৃষ্টান্ত জানা নেই। অষ্টগ্রামের ফিরোজ সাহেবও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন।

আহতদের আর্তনাদ, দুঃসহ যন্ত্রণা এবং সার্বক্ষণিক মানসিক চাপের মধ্যে একে একে ৩টা দিন পেরিয়ে গেল। আমার মনে হত যেন আমরা ১৬ ডিসেম্বরে মরে গেছি। এখনকার নির্যাতনকে কবরের আযাব বলে আমার মনে হতে লাগল। দলের

www.pathagar.com

পর দল এসে আমাদের উত্যক্ত করতে লাগল। জয়বাংলা বলার জন্য চাপ দিতে লাগল। আমাদের কেউ চাপের মুখে সেই ঘৃণিত শ্লোগান উচ্চারণ করেছিল কি না আমার তা জানা নেই। তবে এ সংক্রান্ত একটি মর্মান্তিক ঘটনা আমাকে আজও পীড়া দেয়।

বন্দীদশার তৃতীয় রাত্রে, সম্ভবত ২১ ডিসেম্বরের রাত সেটি। মুক্তিফৌজের একটি দল এসে উপস্থিত হল। আমাদের বন্দী জীবনের সাথী একজন এডজুটেন্টকে ধরে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। যাবার সময় কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বিদায় নিলেন তিনি। তার সেই বিদায়ই যে শেষ বিদায় এমনটি ধারণা করেনি কেউ। পরে জানলাম জয় বাংলা বলার জন্য তাকে চাপ দেয়া হয়। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করা সত্ত্বেও জয় বাংলা উচ্চারণ করাতে ব্যর্থ হয় নির্মম মুক্তিফৌজেরা। পক্ষান্তরে প্রতিটি বেয়নেট চার্জের সাথে সাথে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের ঐশী নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

আরও বেশ ক'টা দিন চলে গেল অন্তহীন আযাবের মধ্যে। এরপর দু'জন মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে আসল, একজন সুমুজ আলী আর অন্যজন গিয়াসউদ্দিন। এই গিয়াসউদ্দিন যুদ্ধ শুরু হবার আগে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিল। তার উপস্থিতি সেই আত্মিক সম্পর্কের টানে কিনা জানিনা; তবে সে আমার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে এসেছিল, যেটা আমার না শুনলেই বোধ হয় ভাল ছিল। তার কাছ থেকে জানলাম, আমার ফুফা মধুমুন্সী যিনি ২৫ বছর ধরে কখনো ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কখনো সদস্য হয়ে দেশ সেবা করেছেন তাকে হত্যা করা হয়েছে। ভগ্নিপতি আলাউদ্দিন মোল্লাকে এবং তার চাচাত ভাই মুর্তুজ আলী মোল্লাকে গুলী করা হয়েছে। মামা আমান মেম্বার নিহত। ফুফাত ভাই বাদশাহ মিয়াকেও বাঁচিয়ে রাখেনি। অন্য আর এক আত্মীয় জজ মিয়াও আর নেই। এছাড়া আরও অনেক প্রতিবেশীকে নির্মমভাবে হত্যার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেল গিয়াসউদ্দিন। আমি নির্বাক হয়ে শুনে গেলাম। যেন আমার কানে গলিত লোহা ঢেলে দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আমার দু'চোখ বেয়ে ব্যথার অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল সম্ভবত ঘাতকরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার ধারণা এ হত্যার পেছনে সন্ত্রাসী বদর ও সমুজের সক্রিয় হাত ছিল।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিকভাবে আমাকে একটা কথা বলতে হয়। গিয়াসউদ্দিনের সহযোগী সুমুজ আলী ও বদরের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ক্রুদ্ধ জনতা তাদেরকে হত্যা করে এবং পরে টুকরো টুকরো করে। পরে আমি লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে এ খবর শুনতে পাই। নিউটনের তৃতীয় সূত্র যেন বস্তুর সীমা পেরিয়ে নৈতিকতায় এসে পড়েছে। এই সূত্রে বলা হয়, প্রত্যেক ক্রিয়ার সম্মুখী ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আল-কোরআনের সূত্রে বলা হয়, 'আমি যদি জালেমকে দিয়ে জালেমকে শায়েস্তা না করতাম তাহলে পৃথিবীটা জুলুমে পরিপূর্ণ হয়ে যেত।'

আমাদেরকে সেনাবাহিনীর হেফাজতে নেয়ার কয়েক মাসের মধ্যে সরকারী স্কুল থেকে পিটিআই-এ স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। মুক্তিফৌজ ও যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্টদের মন-মানসিকতায় এমন একটা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় যাতে আমাদেরকে শারিরীক মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা মানসিক সুখ অনুভব করতে থাকে। তাদের বিবেক আর অনুভূতি এমনই পাথরে পরিণত হয় যে, সাধারণ সৌজন্য ও মহানুভবতা এবং উত্তম চিন্তা-চেতনার একটুও অবশিষ্ট ছিল না। যাই হোক, পিটিআই-এ আমাদের নিয়ে যাবার সময় বন্দীদের দুটো সারিতে দাঁড় করানো হল। একটি সারির সম্মুখে দাঁড়াতে হল আমাকে। অন্যটির সামনে দাঁড় করানো হল শ্রদ্ধেয় মওলানা আতাহার আলী সাহেবকে। আমাদেরকে সরকারী স্কুল থেকে পিটিআই-এর দিকে হাঁটতে বলা হল। মুক্তিফৌজদের ধারণা ছিল, রাস্তার দু'পাশ থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উক্তি দিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু সেটা আর হল না। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম এর উল্টো। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের চোখ দেখলাম অশ্রুসজল। কারো মুখে কোন কথা নেই। এমন কি শিশুরাও বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। এরা ছিল আমারই প্রতিষ্ঠিত শিশু প্রতিষ্ঠান শাহীন ফৌজের সদস্য। আমার মনে হতে লাগল, ১৭৫৭ সালে সিরাজের স্বপক্ষে যারা সত্যিকারভাবে লড়াই করেছিলেন তাঁদেরকেও ইংরেজ ও তার দালালেরা এমনি করে জনতার সামনে দিয়ে নিয়ে গেছে। ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনের সিপাহীদের করুণ পরিণতি দেখতে হয়েছে এদেশের নিরুপায় মানুষকে।

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ। দিনটা ঠিক আমার মনে নেই। কোন এক সকালে দেখলাম কয়েকজন সাবেক ইপিআর অর্থাৎ বর্তমান বিডিআর এর সদস্য আমার কক্ষে এসে আমাকে বলল– আপনাকে ব্যারাকে তলব করা হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ তৈরী হয়ে গেলাম। তাদের অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। যদিও তারা

www.pathagar.com

কেউ আমার গায়ে হাত তুলেনি কিন্তু বিভিন্ন কটাক্ষপাতের অবতারণা করে সারাটি পথ মানসিক যন্ত্রণা অব্যাহত রেখেছিল। অবশেষে স্টেডিয়ামের সন্নিকটে এসে পথচলা ক্ষান্ত হল। আমাকে নিয়ে আসা হল সামরিক বাহিনীর অস্থায়ী ব্যারাকে। একটি কক্ষে লেফটেন্যান্ট কামালের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি দেখলাম, কামাল সাহেবের চোখে মুখে ভয়ংকর আক্রোশ আর ক্ষোভের চিহ্ন। মনে হল, কোন বিশেষ মহল থেকে আমার বিরুদ্ধে তার কানে বিষ ঢালা হয়েছে। আমাদের নিয়ে কামাল সাহেবদের মানসিক ভীতিও কম ছিল না। এতক্ষণ পিস্তলটা তার বালিশের কাছে ছিল। আমাকে দেখে তিনি তড়িঘড়ি হাতে নিয়ে পেছন দিকে সরিয়ে দিলেন। পরে আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন– 'তোমাদের কাউকে হত্যা করা হবে না। স্বাধীনতার যুদ্ধে যেসব ব্রীজ কালভার্ট নষ্ট হয়েছে, আমরা চাই তোমাদের হাতেই সেসব মেরামত অথবা নির্মাণ হোক।' আমি নীরব থাকলাম। এ প্রসঙ্গে আমার অনুচ্চারিত অভিব্যক্তি প্রকাশ না করলেও মনে মনে বলেছিলাম– 'তোমাদের সমস্ত গুনাহর কাফফারা মৃত্যুর দোর-গোড়ায় এসেও আমাদের দিতে হবে, সে আমরা জানি। তোমরা ধ্বংস করবে আমরা গড়ব। তোমরা বিদেশীর দালালি করবে আর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হব আমরা। যুগে যুগে ইসলামের সৈনিকরা সমগ্র জাতির ভুলের মাশুল দিয়েছে তাদের জীবন দিয়ে।'

লেঃ কামাল বললেন– 'তুমি অনেক হত্যাযজ্ঞের নায়ক।' আমি নীরব থাকলাম। কেননা তাদের আবেগের কাছে আমার সমস্ত প্রতিবাদ ও বক্তব্য অরণ্যেরোদন মাত্র। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় লেখাপড়া করতে?' বললাম– 'ভৈরবের হাজী আছমত কলেজে।' জিজ্ঞেস করা হল– 'প্রিন্সিপাল তোমাকে জানেন?' বললাম জানেন। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন। সম্ভবত ভাইস প্রিন্সিপাল হানিফ সাহেব টেলিফোন রিসিভ করেছিলেন। তার সাথে আমার প্রসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা হয়। তিনি কি বলেছিলেন আমি জানিনা। তবে লেঃ কামালের চেহারায় পরিবর্তন হতে আমি দেখেছি। রিসিভার রেখে দিয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– "আপনি মালেককে চেনেন?" বললাম, 'জ্বি হ্যাঁ, শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক তিনি। ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে তাকে শহীদ করা হয়।' আমি লক্ষ্য করলাম তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন। আমাকে সম্বোধন এতক্ষণে 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে পরিবর্তন হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিকে আমাকে টুলে বসতে দেয়া হয়। আমি বসিনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। কামাল সাহেব চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম। তিনি বলে চলেছেন– 'ঢাকা ভার্সিটিতে

www.pathagar.com

পড়ার সময় আমি মালেককে জানতাম। খুব ভাল ছাত্র, তার মৃত্যুতে আমরাও আহত হই, যদিও আমি ছাত্র ইউনিয়নে ছিলাম। আমি বুঝতে পারি না, কি অন্ধ মোহে আপনারা এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেমেছিলেন। ৮ কোটি মানুষের গণস্রোত ও প্রচণ্ড গতির সামনে কি করে আপনারা শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই গতি পাল্টে দেওয়ার জন্য, ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হই। অথচ আপনারা লুট করেছিলেন এমনটিও নয়। বৈষয়িক সুবিধাভোগীও আপনাদের বলা যাবে না। আপনারা আলবদরের যারা রয়েছেন তারা চিন্তা-চেতনার ও যোগ্যতার নিরিখে বিচার করলে পেছনের সারির নন। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আপনারা আজ অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছেন!' আমি নীরব শ্রোতার মত শুনে গেলাম। এরপর আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসলেন তিনি। আমার পারিবারিক সমস্ত কিছু জানতে চাইলেন। আমার জবাবে পরিবারের যে ছয় জন নিহত হয়েছেন সে প্রসঙ্গ অনুক্ত রইল না। এরপর কামাল সাহেব বললেন, 'গণবিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য আপনার সমস্ত পরিবারকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। হয়তো বা আপনাকেও আপনার জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। আপনার কি মনে হয় না যে আপনি একটা বিরাট ভুল করেছেন?'

আমি বললাম– 'আবেগ-তাড়িত হয়ে আমি কিছু করেছি বলে মনে হয় না। আমি যা করেছি অনেক চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়েই। আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক কি বেঠিক এটা নিরূপণের সময় এখনও আসেনি, আগামী দিনের ইতিহাস আমাদের ভূমিকা কিভাবে নিবে সেটাই বড় কথা। তবে এটা ঠিক, মুসলমান হিসেবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না। নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়ার পথও ছিল বন্ধ। একটা পথ খোলা ছিল, ভারতে পাড়ি জমানো। হ্যাঁ সেখানে গিয়েও আমরা বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পারতাম। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে কোনদিন সম্ভব হতো না। কেননা হিন্দুস্তানী সাহায্যকে আমি ঘৃণা করি। মুসলমানদের সাথে তাদের হাজার বছরের বৈরী মানসিকতার আকস্মিক পরিবর্তন মোটেও শুভ মনে করতে পারি না। ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্বল করাই তাদের লক্ষ্য। মীরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতায় সিরাজের পতন ঘটিয়ে নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য, এমনকি তার জন্যও কোন কল্যাণ ডেকে আনেনি। ইতিহাসের একই ভুলের আবর্তে আমি পা রাখতে চাইনি।'

'যখন পরিস্থিতি আমি অবলোকন করছি কোন পক্ষ অবলম্বন না করে, আমি যখন আমার অঞ্চলের মানুষগুলোকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর নির্যাতন

www.pathagar.com

থেকে বাঁচাবার চিন্তা-ভাবনায় নিরত, ঠিক সে সময় কয়েকবার মুক্তি বাহিনী আমার বাড়ীতে হানা দিয়ে আমাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। এর ফলে সাম্প্রতিক ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে তৃতীয় কোন অবস্থান নেয়ার পথ আমার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। কাপুরুষোচিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মন-মানসিকতা কোনকালেই আমার ছিল না। আমি সঠিক বিচারে মন্দের ভাল হিসেবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক পথ মনে করে একাত্তরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। এখন আমরা একতরফা প্রচারণার শিকার।'

দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লেঃ কামাল আমার খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 'এ কয়দিন আমি ভাত খাইনি। অসুস্থতার অস্বস্তিতে আমি বিব্রত ছিলাম। আমার সহযোগী ভাইয়েরা কোথায় কিভাবে বাইরে থেকে খাবার ম্যানেজ করতেন, সেটা আমার জানা নেই। এসব খেয়েই রয়েছি এ কয়দিন।' কামাল সাহেব বললেন– 'আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি, কি বলেন?; আমি দ্বিমত পোষণ করলাম না। আমাকে বাবুর্চিখানায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি খেতে বসলাম। মনে হল আমি কতকাল খাইনি। আর সত্য বলতে কি এ কয়দিন গোস্ত খাওয়াতো দূরের কথা চোখেও সেসব দেখিনি। আমি পরম তৃপ্তিতে খেলাম। ভাতের চেয়ে গোস্ত খেলাম বেশী। এরপর ফিরে এলাম আবারও কামাল সাহেবের চেম্বারে। এসে দেখলাম এখানে কেউ নেই। আমি বসে থাকলাম। কামাল সাহেব ফিরে এসে কিছুটা আমার সাথে সহানুভূতিসুলভ হাল্কা আলাপ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে হিন্দুস্তানী বাহিনীর ২ জন অফিসার এলেন। কামাল সাহেব তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে নিয়ে তাদের সাথে হাসি-মশকরায় অবতীর্ণ হলেন। এক পর্যায়ে আমার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে 'অনেক হত্যাযজ্ঞের নায়ক আমি'– এ কথা বলতে ভুললেন না। আমার মনে হল ভারতীয় অফিসাররা রাজপুত। তাঁরা কখনো হিন্দীতে কখনো ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। তারা আমাকে বললেন– 'বাংলাদেশের হাজার হাজার প্রগতিশীল ছাত্র ভারতে ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তা সত্ত্বেও আপনি কেন দেশে রয়ে গেলেন?' বললাম– 'আমি ভারতকে কখনও হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিনি।'

তারা বললেন– 'আপনার ধারণা ছিল পাকিস্তান টিকে যাবে এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা নেয়ার ব্যাপারে সংঘাতকালীন ভূমিকা আপনার জন্য হবে একটা বিরাট সার্টিফিকেট।' বললাম– 'বৈষয়িক লোভ লালসার বাইরে থেকে আমরা আমাদের ভূমিকা রেখেছি। শুধুমাত্র ঈমানের দাবী আমার কাছে যা ছিল তাই

www.pathagar.com

করেছি। এর বাইরে চিন্তা করার কোন অবকাশই আমাদের ছিল না এবং এখনও নেই।'

– আপনি কী করতেন?

– ছাত্র ছিলাম। ছাত্র হিসাবে ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য ছিলাম।'

– আপনি কতজন লোক হত্যা করেছেন?

– 'রণাঙ্গনে কতজন মরেছে সেটা আমার জানা নেই, আমি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে ছিলাম না। সার্বিক পরিচালনা করেছি। নিজে গুলী চালানোর অবকাশ আমার ছিল না। তবে যুদ্ধ চলাকালীন কেউ নিহত হয়ে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব আমারই, কেননা আমার নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। কতজন মারা গেছে সেটা আমাদের চাইতে আমাদের প্রতিপক্ষরাই সঠিক বলতে পারবে। লড়াইয়ের ময়দানে হতাহতের ব্যাপারটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়।'

তারা বললেন– 'আপনাদের গ্রামে-গঞ্জে এবং মহকুমা শহরে যে প্রাচুর্য আমরা দেখেছি, আমাদের জেলা শহরগুলোতেও তেমন নেই, তা সত্ত্বেও এখানকার তরুণরা বিদ্রোহী হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হল কেন এটা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।' আমি এ প্রসঙ্গে নীরব থাকলাম। কামাল সাহেবকে দেখলাম তার দৃষ্টি নিচের দিকে। মনে হল, তাদের জন্য এটা একটা চপেটাঘাত। এরপর কামাল সাহেবের চেম্বার থেকে বিদায়ের পালা। সবাই একত্রে বেরুলাম। লেঃ কামাল আমাকে তার গাড়ীতে উঠতে বললেন। আমাকে আমার সেই অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে তারা চলে গেলেন। আমি আমার সেই হল কক্ষে ঢুকে দেখতে পেলাম অনেকের অশ্রুসজল চোখ। মওলানা আতাহার আলীসহ আমার সব সহযোগী অধীর আগ্রহে আমার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে পেয়ে যেন তারা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাদের ধারণা ছিল আমাকে আর তারা পাবে না। পাবে সেই এডজুটেন্টের মত আমার শাহাদতের সংবাদ। এতক্ষণ তারা দোয়া 'ইউনুস' পড়ে আমাকে জীবন্ত ফিরে পাওয়ার জন্য খোদার কাছে কান্নাকাটি করছিল। হয়তো আমার সেই সহযোগী আল্লাহর নির্যাতিত বান্দাদের দোয়ার বরকতে ফিরে আসতে পেরেছি। মজলুমের দোয়া নাকি আল্লাহ্ সাথে সাথে কবুল করেন। অনেকে এসেই আমাক জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাদেরকে সমস্ত বিবরণ খুলে বললাম।

www.pathagar.com

আর একদিন এক কালের আমার সহকর্মী বর্তমান মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার গিয়াসউদ্দিন এসে উপস্থিত হয়ে আমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল এবং বাড়ীর খবরাখবর দিল। গিয়াসউদ্দিন এও জানালো যে, আমার মা আমার জন্য কিছু খাবার তাকে দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন আমার পরনের কাপড়। সেসব আমার অবস্থান পর্যন্ত এসে পৌছেনি। সে বলল যে, তার সহযোগীরা সব জামা কাপড় নিয়ে গেছে এবং খাবারগুলো খেয়ে ফেলেছে। এজন্য তাকে দুঃখ প্রকাশ করতেও দেখলাম। তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। এজন্য তাকে অন্যান্যদের কাছ থেকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলতে গেলে কানে কানে বলেছিলাম, 'তুমি বরং আমার খালু আশরাফ চেয়্যারম্যান সাহেবের বাসায় যাও। ওখানে আমার জামা-কাপড় রয়েছে। সে সবের কয়েকটা আমাকে এনে দিলে আমার দারুণ উপকার হবে। তুমি আমার একাজটা করেই বরং বাড়ী যেও। এক জামা-কাপড়ে দারুণ বিব্রতবোধ করছি। নামাজ কালামেও তৃপ্তি পাচ্ছিনা।' গিয়াসউদ্দিন সেসব আমাকে এনে দিতে সম্মত হল। কিন্তু সে জামা-কাপড়ের একটিও আজ পর্যন্ত আমার হাতে এসে পৌছেনি। আমার জামা-কাপড় আর গেঞ্জী পরে তারা সদলবলে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের পরনে সেসব কাপড় আমি দেখেনি। তার ভাষায়– 'আমি আর সকলকে এড়িয়ে আপনার জিনিস পৌছাতে পারিনি।' আমি অসহায়ের মতো নীরবে তাকিয়ে থাকলাম। সবচেয়ে করুণ ও দুঃসহ নির্মমতার প্রকাশ ঘটাতেও তারা ছাড়েনি। আমার পাশের গ্রামের এক তরুণীর সাথে আমার বিয়ের কথা আমাদের গার্জেন পর্যায়ে মোটামুটি ঠিক হয়েছিল। সেই তরুণীকে একজন মুক্তিযোদ্ধা বন্দুকের নলের মুখে বিয়ে করে এবং সেই বিয়েতে খালুর বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া সুটকেসটি উপহার দেয়া হয়। এসব ঘটনাসমূহের অবতারণা করা হয় আমাকে এবং আমার মা ও আত্মীয় পরিজনদের মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার জন্য।

কিছুদিন পর আমাদেরকে কিশোরগঞ্জ জেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। সোজা পথ দিয়ে অথবা গাড়ীতে জনমানুষের প্রদর্শনী ছাড়াও আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা না করে আমাকে কলেজের পাশ দিয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এর একমাত্র কারণ, যেন আমি বিভিন্নভাবে জনতার হাতে লাঞ্ছিত হই। আমি যেন এখন এক খেলার সামগ্রী। আমাকে ঘিরে জনমানুষের ভিড় সৃষ্টি করাই হল পুলিশদের উদ্দেশ্য। কলেজের ছাত্ররা আমার প্রতি বিদ্রূপাত্মক উক্তি করুক এমনটি চেয়েছিল পুলিশেরা। কিন্তু সেটা হল না। পথিমধ্যে শুধুমাত্র কতিপয় কলেজ ছাত্রীর মন্তব্য আমার কানে এসেছিল। তা হল, 'আল বদরের

www.pathagar.com

পান্ডাকে দেখ, নিয়ে যাচ্ছে।' এরা আমাকে জানতো। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের স্বপক্ষে ভাষণ দিতে দেখেছে। কারাগারের সম্মুখে দেখলাম অনেক মানুষের ভিড়। সকলে আমাকে দেখার জন্য সমবেত হয়েছে। আলবদরকে দেখার এমন আগ্রহ দেখে মনে হল, আমি যেন কোন এক ভিন্ গ্রহ থেকে এসেছি। এ দেশ এ মাটির সাথে আমার যেন কোন সম্পর্ক নেই অথবা কোনদিন ছিল না। সম্ভবত পত্র-পত্রিকার উদ্ভট প্রচারণা থেকে মানুষের আগ্রহ এমন তীব্র হয়েছে।

অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমাকে জেলের ভেতরে পা রাখতে হল। ভেতরে ঢুকিয়েই অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে একটা সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আমার মনে হল গোটা দেশটা একটা কারাগার। সেই কারাগার থেকে ছোট, ছোট থেকে অতি ছোট কারাগারে প্রবেশ করলাম, আওয়ামী লীগের ঔদ্ধত্বের কাছে অসহায় কারা কর্তৃপক্ষের মেহেরবানীতে। এখানে আমাকে নিয়ে দাঁড়াল ৭ জন। অথচ খুব বেশী হলে স্থান সংকুলান হয় ৩ জনের। এখানে যারা ছিল, যদিও এরা মানুষ কিন্তু তাদের চাল-চলন, আলাপ-আলোচনা ও তাদের সমস্ত অভিব্যক্তি থেকে মনে হত এরা নর্দমার কীট। গনোরিয়া সিফিলিসের রুগী এরা। সারাক্ষণ তাদের আলাপ আলোচনায় সারা জীবনের অপকর্মের ফিরিস্তি একে অপরের কাছে অকপটে প্রকাশ করছে। এদের সাথে আলাপ আলোচনা অথবা কোন রকম কথা বলার আগ্রহ কোন সময়েই আমার জাগেনি। আমি ৬টা লোক সাথে পেয়েও একান্ত একা। নির্লিপ্ত হয়ে সারাক্ষণ বসে অথবা শুয়ে কাটাতাম, আমার জীবন মৃত্যু যার হাতে, সেই মালিকের রহমত কামনা করে। পরে জেনেছিলাম, এই অন্ধ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করানোর মূলে ছিলেন আমারই মত ২ জন বন্দীর বিভ্রান্তিকর প্রচারণা। তারা হচ্ছেন শান্তি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক মহকুমা অফিসার ও মুসলিম লীগ নেতা বাদশাহ মিয়া। তারা কারা কর্তৃপক্ষ ও আওয়ামী লীগের করুণা ও রহমতের প্রত্যাশায় আমাকে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। তারা ধারণা দিয়েছিল, সমস্ত অপকর্মের নায়ক আমি। অথচ তাদের প্রকোষ্ঠে আর একজন থাকতেন এডভোকেট সাইদুর রহমান। তিনি আমাকে নিয়ে কোন খারাপ ধারণা ব্যক্ত করেননি। বরং আমার প্রতি ছিল তার গভীর মমতা।

ছয় জন কারাসঙ্গী থাকা সত্ত্বেও আমি একা। আমার একাকীত্ব আমাকে নিমগ্ন করেছে পুরোপুরি। আমার ফেলে আসা বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে একসূত্রে

www.pathagar.com

গাঁথার চেষ্টা করছি। আর আত্মবিশ্লেষণ করে চলেছি সারক্ষণ। মনের পর্দায় ভেসে উঠছে...

সত্তরের নির্বাচন শেষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিকে উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অন্যদিকে ইসলামী সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া। দুটোরই অবাস্তব কাল্পনিক স্বাচ্ছন্দের প্রতিশ্রুতি আর চোখ ঝলসানো প্রচারণার তোড়ে সমগ্র জাতিটা দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতির অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা যাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল নির্বাচনের রায় ঘোষণার পর তারা নির্বাক হয়ে পড়ল। অতি আশায় উচ্ছল কোটি কোটি মানুষ হল প্রত্যাখ্যাত। এই প্রত্যাখ্যান পর্যায় স্বাভাবিক পথ ধরে হয়েছে এমনটি বলা যায় না। আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা আমাদের সহকর্মী বহু পোলিং এজেন্টকে পোলিং বুথ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দৃশ্য এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল বলে আমার জানা নেই। এমনটি হবে এটা অনেকেই আঁচ করেছিল অনেক আগে থেকে। ঢালাও পয়সার বিনিময়ে এবং পোষা গুণ্ডাদের উগ্র মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে জাতির বিবেককে কেনার সামর্থ্য আওয়ামী লীগ অর্জন করেছিল। বেশ কিছু আগে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ভাষণ দেয়ার সময় টাকা সংগ্রহের জন্য শত শত ড্রাম বসান হয়েছিল। এ থেকে কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল সেটা বলা হয়নি। তবে এর অছিলায় কোটি কোটি টাকার হিন্দুস্তানী মদদ জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। এটা অনেকেই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার হিম্মত ছিলনা অনেকের।

এ প্রক্রিয়া কোন তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া নয়। এর শুরু অনেক আগে থেকে। বলতে গেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে। এর মূল উদগাতা আওয়ামী লীগ অথবা শেখ মুজিব কেউই নয়। এর নেপথ্যে যাদের কালো হাত সবচেয়ে সক্রিয় ছিল সেটা হল কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো। আর এ ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুত আগামী দিনগুলোকে নিয়ে শুরু হয় প্রসাদ ষড়যন্ত্র। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে উপমহাদেশের মানচিত্র ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেই দ্বিজাতি তত্ত্বকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অস্বীকৃতি জানানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনালগ্নে কোটি কোটি ইসলামী জনতার উদ্দেশে যে বাণী সম্প্রচারিত করা হয়েছিল সেটা হল

www.pathagar.com

কায়দে আযমের ভাষায়, 'আমাদের নতুন শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। ১৪শ' বছর আগে এটি রচিত হয়েছে। আমরা তার প্রতিফলন ঘটাব মাত্র।' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, এরও কারণ রয়েছে। জনগণের আবেগ ও মন-মানসিকতা ইসলামিক হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব যাদের হাতে এসে পড়ে, তারা হচ্ছেন নবাব, জমিদার ও গোলামী মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত তথাকথিত এলিট গোষ্ঠী। তাদের মন-মানসিকতায় ইসলামী চেতনার ক্ষীণতম আলো বিরাজ করলেও ইসলামী জীবন-বোধ সম্বন্ধে তাদের অন্তঃকরণে সঠিক ধারণা অনুপস্থিত ছিল। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ইসলামী জনতার দাবী হয়েছে উপেক্ষিত। তাদের আন্দোলন ও বক্তব্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা বলে। এমনকি তাদেরকে পাকিস্তান বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে বিষোদগার করা হয়েছে বার বার।

আলেমদের মধ্যে অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মওলানা মাদানীর কাতারে টেনে এনে ইসলামের অগ্রনায়কদের ভাবমূর্তিকে খাটো করার জন্য তাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু ও ভারতের দালাল হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এদের বিরুদ্ধে গুণ্ডাও লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত পাকিস্তান বিরোধীরা এক পা এক পা করে নেপথ্য যবনিকা থেকে রাজনৈতিক মঞ্চে এগিয়ে আসতে শুরু করে।

জামায়াত যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবীতে গণআন্দোলন শুরু করার আয়োজন-উদ্যোগ নেয় তখনই ছাত্রদের মাধ্যমে ৬ দফা রাজনৈতিক ময়দানে আনাগোনা শুরু করে। পঁয়ষট্টির যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে মার খেয়ে হিন্দুস্তান পিছন দিক থেকে এ জাতিকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা নেয়। ৬ দফা আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে থাকলেও প্রকৃত পক্ষে এটা আসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র‍্যাডের টেবিল থেকে। সময় মত আগরতলা ষড়যন্ত্রের রহস্যও উদঘাটিত হয়। আওয়ামী লীগ তখন ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের নিভু নিভু বাতি জ্বেলে রেখেছিলেন কোন মতে।

ছাত্রদের মধ্যে র‍্যাডের এজেন্টরা ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করে। তখন রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের সহায়ক শক্তি ছিল ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে এরা সিদ্ধহস্ত। গণআন্দোলন যখন তুঙ্গে, যখন আইয়ুব খানের সাথে

www.pathagar.com

বোঝাপড়া হবে, এ সময় ১১ দফাকে আকস্মিকভাবে গণআন্দোলনের জোয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। বামপন্থী সাংবাদিকতার সুবাদে ১১ দফা ব্যানার হেডিং-এ সবক'টি দৈনিকে প্রকাশ পেতে থাকে। এতে ছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা আর বাকীটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রোগ্রাম। রুশ-ভারত ষড়যন্ত্র হাত ধরে পাশাপাশি এগিয়ে চলছে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। একই মোর্চা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী উঠল। এ দাবীও গণজোয়ারে ছেড়ে দেয়া হল। ফলে ধিকৃত ষড়যন্ত্রের নায়কের মুক্তির দাবীটা জনগণের আওয়াজে পরিণত হতে দেরী হল না। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল এটাকে এড়িয়ে যেতে পারল না। পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রকারী ভারতের দালাল পরিণত হল জাতীয় হিরোতে।

আল্লাহ আসন্ন বিপদের লাল সংকেত দিয়েছে সময় মত এবং বার বার। তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মালেক ভাইয়ের মত চরিত্রবান ও সেরা ছাত্রের শাহাদাত সে সময় হল কেন? অথচ এই আসন্ন ঝড়ের সংকেত বুঝল না ইসলামপন্থীরা। তারা সংঘবদ্ধভাবে বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হল।

সত্তরের ১৮ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে ইসলামী জনতার রক্ত ঝরার পরও ইসলামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। ওটাও ছিল আসন্ন ঝড়ের সংকেত। আমি পল্টনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি কি ভয়াবহ দৃশ্য! একটা কারবালা যেন। শত শত মানুষকে রক্তাক্ত হতে দেখেছি। শহীদও হয়েছে কয়েকজন। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা রাত্রে মাইক যোগে প্রচার করেছে, 'নিরস্ত্র জনতার ওপর জামায়াতে ইসলামী গুণ্ডাদের নির্লজ্জ হামলা।' কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস!

এইভাবে আওয়ামী লীগ তাদের সুপরিকল্পিত প্রচারণা দিয়ে জনতার বিবেককে ধীরে ধীরে অন্ধতার দিকে টেনে নিয়ে চললো। সরকার নিরপেক্ষতার আবরণ দিয়ে তার চোখ দুটোকে বেঁধে রাখলো। আওয়ামী লীগের কালোহাত প্রশাসনকে পর্যন্ত স্পর্শ করলো। সরকারের নীরবতার সুযোগে হিন্দুস্তান আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানে যা কিছু করতে চেয়েছিল তার সমস্তটাই নির্বিঘ্নে করতে পেরেছে। এতে মদদ দিয়েছে সরকার, মদদ দিয়েছে ভূট্টো, মদদ দিয়েছে অন্যান্য সব ক'টি দল। বলতে গেলে পরোক্ষভাবে জামায়াতে ইসলামীও।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসীবাদী কায়দায়। দুই দিকে দুই জাহেলিয়াতী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো। মুজিব-ভূট্টো স্পষ্ট বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে জনগণকে নিয়ে চললো এক ভয়ঙ্কর সংকটের দিকে। ইয়াহিয়া মুজিবের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করল। কিন্তু

www.pathagar.com

ভূট্টোকে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হল। রাজনীতিতে শুরু হল অরাজকতা। মুজিব-ভূট্টো যা চেয়েছিল দেশ সে অবস্থায় এসে উপনীত হল।

অপরাধ করতে করতে আওয়ামী লীগের দুঃসাহসিক সীমা ছাড়িয়ে গেল। যখন হত্যাযজ্ঞ শুরু হল অবাঙালীদের ওপর, যখন জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার গর্জে উঠল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের লক্ষ করে, তখন সরকারের টনক নড়ল। তখন যমুনার পানি অনক দূর গড়িয়ে গেছে। গোটা দেশে তখন কারবালা সংঘটিত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিটি অবাঙালী বসতি উজাড় হয়ে গেছে। এটাও ছিল হিন্দুস্তানী পরিকল্পনা। অবাঙালী ও ইসলামপন্থীদের হত্যাযজ্ঞের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান বাহিনীর নির্বিচার নিপীড়ন শুরু হলে স্বাভাবিকভাবে বাঙালীরা হিন্দুস্তানে পলায়ন করবে তারপর সেখান থেকে পাকিস্তানকে পাকিস্তানী দিয়েই ভেঙে টুকরো করা যাবে।

একই সূত্র থেকে একই পরিকল্পনার পথ ধরে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এগুতে লাগলো। ভূট্টোর দোসর টিক্কা খানের সামরিক অপারেশন ভয়াবহতা সৃষ্টি করলো। দুষ্কৃতিকারী আর প্রকৃত অপরাধীরা ততক্ষণে সীমান্তের ওপারে। নিরীহ সাধারণ মানুষেরা সহানুভূতির বদলে পেল সামরিক অপারেশনের ভয়াবহতা।

এক ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা নিয়ে তখন আমি গ্রামের বাড়ীতে। এখান থেকে প্রকৃত পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছিনা। সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি বিদিশা। দেশের ভবিষ্যত নিয়ে দারুন উদ্বিগ্ন। এক নীল নক্সার শিকার হয়ে আমরা দেশের ৮ কোটি মানুষ কী সাধ করে হিন্দুস্তানের পায়ের তলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি! হিন্দুস্তানের মদদ কি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে? এ প্রশ্ন আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি বার বার। এখন আমরা কি করতে পারি? অশান্ত উদ্বেল দেশটাতে কিভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে? এমন শত শত প্রশ্ন, শত শত সমস্যার পাঁকে যেন আমি হারিয়ে যাচ্ছি।

আমার এ উদাস উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে মা দারুণ বিব্রত বোধ করছিলেন। মা এক সময় আমাকে বললেন– 'তুমি এভাবে বাড়ীতে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। যাও বাজারের দিক থেকে ঘুরে আস তো।' মার কথায় আমি দ্বিমত পোষণ করলাম না। আমি বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছি আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে। সবকিছু শূন্য মনে হচ্ছে। খাঁ খাঁ করছে সবকিছু। দু'পাশে কড়োই গাছ ঝিম ধরে আছে। ঝিম ধরে আছে বিশ্বপ্রকৃতি। এত পরিচিত এই পথঘাট, এই এত আপন আমার এ গ্রামটা। এই মাটি, এই ভূখণ্ড যেখানে

www.pathagar.com

আমি লালিত হয়েছি, যেখানকার সৌন্দর্য সুষমা পান করে আমি বেড়ে উঠেছি। মাটির সোঁদা গন্ধ আর মউলেল সুরভী শুঁকে শুঁকে আমি জীবনটাকে উপলব্ধি করেছি। এই গ্রামবাংলার সাথে আমার কি নিবিড় সম্পর্ক অথচ আমি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির কাছে সুস্থ রাজনীতি বিপন্ন। জগতশেঠ আর মীরজাফরের রাজনীতির কাছে মীরমদনের রাজনীতি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম অষ্টগ্রাম বাজারে। এসে ঢুকলাম ভূঁইয়াবাড়ীর চা স্টলে। এখানে লোকজন কম মনে হল না। জমজমাট চা বেচাকেনা চলছে। কিন্তু চেনা মুখ চোখে পড়ছেনা আমার। সবই যে অপরিচিত মুখ। আমি ভাবছি আমার মানসিক অবস্থা কি সব মানুষকে অপরিচিত করে দিয়েছে? নাকি এরা সব নবাগত! আমি এমন একটা ভাবনার মধ্যে রয়েছি এমন সময় দেখলাম, আমার এক পরিচিত মুখ কাজী বারী। মোমেনশাহী ন্যাপের সহ-সভাপতি। কোন এক সময় তার কর্মী ছিলাম আমি। অন্ধতার ঘোর কাটলে আমি অবস্থান নিই তার বিপরীত বলয়ে। আমাকে দেখেই কাজী বারী সদম্ভে বললেন– 'কি আমিন, তোমার সিনা তো বেশ চওড়া হয়ে গেছে।' তার কথাটা শুনেই আমার চেতনা ফিরে আসলো। আমি এখন স্পষ্ট বুঝলাম, এ অপরিচিত মুখগুলো এখানে কেন? বুঝলাম আমি আমার অজান্তে শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়েছি। ঘটনার আকস্মিকতায় একটা তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা আমার মধ্যে এলেও আমি নিজেকে সামলে নিয়ে একটুখানি চাতুরির আশ্রয় নিলাম। বললাম, 'বারী ভাই যে'। চায়ের দোকানীর উদ্দেশে বললাম– 'বারী ভাই আর আমার জন্য লাগান ২ কাপ চা। বিস্কুটও দেন, আমি এক্ষুণি আসছি।' কাজী বারী আমার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা আঁচ করতে পারল না। আমি কেটে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত বাজারটা আমার কাছে মনে হতে লাগলো আমার শত্রু। মনে হচ্ছিল সবাই যেন আমার পিছে ধাওয়া করছে। আমি ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলছি। চলার পথে দেখলাম হাফেজ আবদুল হাইও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। চাপা কণ্ঠে বললেন– 'এখানে কেন। তাড়াতাড়ি সরে যান। ইপিআর, আওয়ামী লীগ আর কমিউনিস্টরা বাজারে ক্যাম্প করেছে। মওলানা আঃ গণি খান সাহেবের বাড়ীর সকলকে হত্যা করেছে। এদের টার্গেটে আপনিও আছেন। বাড়ীতেও থাকবেন না।' বাজার একটু আড়াল হলে আমি দৌড় দিলাম আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

বাড়ী এসেই বাবা-মাকে নিয়ে বসলাম। পরিস্থিতির সমস্তটাই বিশ্লেষণ করে বললাম– 'আমি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিলেও এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেনা। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি?

www.pathagar.com

বাবা বললেন– 'কোন বুজদীলের মৃত্যু মুসলমানের নয়। তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি। যে কোন মূল্যে আল্লাহর পথে থাকাই উত্তম।' মা বললেন– 'এই পরিস্থিতিতে তোমার যা ভাল মনে হয় তাই করো। তোমার পথ আগলে রাখতে চাইনা।'

আমার সে রাত্রে ঘুম নাই। আমি সারা রাত ঘুরে ঘুরে আমার বন্ধু বান্ধব ও নিজস্ব লোকদের সাথে যোগাযোগ করলাম। দেখলাম সবাই আমার মতই চিন্তা করছে। ভারতীয় প্রচারণার ধূম্রজালে এরা কেউ আটকেনি। নিজস্ব চিন্তার পরিসর দিয়ে সবাই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে।

রাত ভোর হয়ে এল। ফজরের নামাজ শেষ করে বাবার কাছে বিদায় নিলাম। আমাকে অনিশ্চিতের মধ্যে ছাড়তে বাবার অন্তর কাঁদছিল। আমি তার মুখে দেখেছি হাঁসি কিন্তু সে হাসির আড়ালে কি দারুণ বেদনা লুকিয়ে আছে, একমাত্র পুত্র হয়ে সেটা অবশ্যই আমি উপলব্ধি করি। মা'র চোখ দেখলাম অশ্রুসজল। সূর্য উঠার আগেই আমি গ্রাম ছাড়লাম। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকায়, আমি এসে পৌছলাম ভৈরব।

২৫ মার্চের পর এই প্রথম পা রাখলাম ভৈরবে। এখানে আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য নেই। কেমন যেন স্থবির মনে হল। প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা এই ভৈরব যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন বয়ে গেছে এই ভৈরবে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি এগিয়ে চলছি। চকবাজারে এসে থমকে দাঁড়ালাম। হাজী সবদের আলী সাহেবের দোকানের ভেতরে ঢুকতেই হাজী সাহেব আমাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, "ওদের বাঁচাতে পারলাম না। মনসুরের বাবা-মা ভাই-বোনকে বাঁচাতে পারলাম না। ওরা সব শেষ।"

আমি তার কথা বুঝলাম না। অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে হতবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি। তিনি বলে চলছেন, 'এখানকার সব অবাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। মনসুরের বাবা, মা, ভাই বোন সহ ৫শ' বিহারীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে হত্যা করেছে। মনসুরকে আমার দোতালায় লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়েছি।' আমার চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে এলো। মনসুর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, ডিগ্রীর ছাত্র। আজ সে এতিম সর্বহারা। আমার ভেতরের মানবিক সত্তা জেগে উঠল। আমার অন্তরে ঘুমন্ত সিংহ গর্জে উঠল যেন। এইসব জুলুম অত্যাচার আর অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিলাম। বিভিন্ন সূত্রে আমি জানলাম, এসব

www.pathagar.com

অমানবিক হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান, মোজাফ্ফর ন্যাপের লেঃ রউফ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নং আসামী), অধ্যাপক মতীন ও আওয়ামী লীগ নেতা সিদ্দিক। এদের ব্যাপারে আমি চিন্তা করলাম হিন্দুস্তানের প্ররোচনায় এরা কি করে পারলো মুসলমানদের খুনে তাদের হাত রঙীন করতে। কি করে পারলো অবোধ শিশুদের বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হল আমার মনে।

খাঁটী সরিষার তেল আর ঘি বিক্রি করতেন আমাদের সফি ভাই। আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। বললেন, 'আমিন ভাইয়া আমার বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। আমার আত্মীয় পরিজন সকলকে শেষ করে দিয়েছে ওরা।' আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমার শপথ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠলো।

ভৈরবে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে আমি সংক্ষিপ্ত একটা ট্রেনিং নিলাম। ইতিমধ্যে সুযোগ-সন্ধানীরা সেনাবাহিনীর আশেপাশে ভিড় জমিয়েছে। এরাও দেখলাম মোজাফফর ন্যাপের লোকজন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের শয়তানী প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে আমি প্রতিবাদী হয়ে উঠি। আমার ব্যাপারে সুযোগ সন্ধানী তোষামোদকারীরা সেনাবাহিনীকে ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে। এরপর ভৈরবকে আমার জন্য নিরাপদ মনে করলাম না।

আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চলে এলাম। এখানে সংগঠনের অন্যতম নেতা ফারুক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি সেনাবহিনীর সাথে যোগাযোগ করে আমার উন্নত ট্রেংনি এর ব্যবস্থা করে দিলেন। ট্রেনিং শেষ করে এখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করি। ইতিমধ্যে আমি বাড়ীর টান অনুভব করতে থাকি। বাবা-মা'র সান্নিধ্য পাবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। একদিন কুমিল্লার গোয়ালনগর ইউনিয়ন কাউন্সিলের কলিমউদ্দিন চেয়ারম্যানের সাথে গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হলাম।

আমার ধারণা ছিল এর মধ্যে হয়তো অষ্টগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এসে শুনলাম এখানকার অবস্থা আগের মতই। সশস্ত্র ইপিআর, আওয়ামী লীগ আর বামপন্থীদের চারণভূমি এই অষ্টগ্রাম। গ্রামে আমার আসার সংবাদ ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। এ খবর জানলাম দেলোয়ার মাষ্টার অর্থাৎ দিলু ভাই এর চিরকুটে। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আমার বিরোধী আওয়ামী লীগের লোকরা সবাই এসে আমার বাড়ীতে ভিড় জমিয়েছে। সবার কৌতূহলী চোখ আমার দিকে। আমার আসন্ন পরিণতি দেখার জন্য সবাই যেন

www.pathagar.com

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমি আমার দুর্বল অবস্থান আর ভয়াবহ অবস্থা আঁচ করলাম। কিন্তু তাৎক্ষণিক কী করতে পারি! এর মধ্যে হয়তো সশস্ত্র পতিপক্ষরা আমার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে। এত চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকানো সম্ভব নয়। হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে জিজ্ঞাসা করছে আমি কেন এলাম। আমার দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটিয়ে সকলকে শুনিয়ে জোরে জোরে বললাম– 'আমি আমার প্রস্তুতি না নিয়ে এমনি এসেছি, আমি কি এমনই গাধা। দাওনা ওদের আসতে।' আমার চোখে মুখে ভীতি নেই, নির্বিকার অভিব্যক্তি। আমার এ কথায় সম্ভবত কাজ হয়েছিল। প্রতিপক্ষরা তাৎক্ষণিক আমাকে আঘাত হানার সাহস করেনি। ওরা থমকে ছিল। আমার দিক থেকে কোন আঘাতের প্রতীক্ষা করছিল হয়তো বা। হাতে আমি বেশ সময় পেয়ে গেলাম।

আমি তড়িঘড়ি আমার নিকটতম আত্মীয়দের সহযোগিতায় গোপন নৌকাযোগে অন্যত্র সরে যাই। আমাদের নৌকা যখন মাত্র মাইল খানেক পথ অতিক্রম করেছে ঠিক সে সময় আমার সশস্ত্র প্রতিপক্ষরা আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে।

পরবর্তীতে, যারা আমাকে স্থানান্তরে সহযোগিতা করেছিলেন তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল, যদিও তাদের প্রাণে মারা হয়নি। নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয় মওলানা আবদুল মোমেন, ভাগ্নে জামালউদ্দিন ও আর একজন প্রতিবেশী।

এরপরে আমার সবরকম ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য পুরোপুরি নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলি। অষ্টগ্রামের সাবিয়ানগর থেকে কুলিয়ার চর হয়ে কিশোরগঞ্জে এসে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারপর আমাদের সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম। ইতিমধ্যে রাজাকারদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে জুলুম হয়েছে এমন অভিযোগও আসছিল। আলবদর গঠন করে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সব রকমের অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলাম। জনগণের মধ্যে ভীতি ও সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি ঘটেছিল, সেটা অল্প কয়দিনেই কেটে গেল। জনগণের আস্থা ফিরে এলে আমরা গণ সমর্থন পেতে থাকলাম। কিন্তু এসব হল অনেক পরে এসে। শুরু থেকে এ সুযোগ না আসাটা জাতির জন্য ছিল চরম দুর্ভাগ্য।

www.pathagar.com

দুই

কিশোরগঞ্জ জেলের ধারণ ক্ষমতা ১শ' জনের বেশী নয় অথচ ৭শ' লোককে সেখানে রাখা হয়েছে। এখানকার অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর পরিবেশে সকলেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখান থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজছিল সকলে। কিন্তু নিরুপায়। কারা প্রকোষ্ঠে মাথা কুটে মরা ছাড়া কোন পথ আছে কি? তবু সবখানে ফিসফিস, কানে কানে কথা, নীরব গুঞ্জরণ। উপায় বের করার প্রচেষ্টা চলছে যেন। একদিন তারা মিয়া ও কতিপয় তরুণ আমাকে জানালেন কারাগার ভাঙবার সিদ্ধান্ত। তারা যে পথ ও পদ্ধতির কথা বলল তাতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হল না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেরিয়ে কোথায় যাবেন?' জবাব পেলাম, 'বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে।' বললাম– 'সেটাতো বড় কারাগার বরং এখানে ভাল আছেন, নিরাপদে আছেন। বাইরে অরাজক রাজ্য, ভয়ংকর সন্ত্রাস আর ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। কারাগারের বাইরে বাংলাদেশে আমরা নিরাপদ নই মোটেও। অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করে এখানেই থাকার চেষ্টা করুন। এখানকার অখাদ্য খেয়ে হলেও, মানবেতর পরিবেশে থাকতে মন না চাইলেও এটাই আপাতত আমাদের নিরাপদ আশ্রয়।' এরপর সম্ভবত জেল ভাঙার পরিকল্পনা তারা বাতিল করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাটা গোপন থাকেনি। মুখে মুখে শেষ পর্যন্ত কারা কর্তৃপক্ষের কান পর্যন্ত পৌঁছে। তাদের এই ধারণা জন্মে যে, এসব রিকল্পনার মূলে রয়েছি আমি, অতএব এখান থেকে আমাকে সরানো জরুরী। একদিন আমাকে একজন কনস্টেবল এসে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে বলে এবং আমাকে জানায় এ কারাগার থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য উপর থেকে হুকুম এসেছে। আমি তৈরী হলাম। আরও ৩ জন আমার সহগামী হলেন এমপি লোকমান হেকিম, সাবেক গভর্নর শহীদ আবদুল মোনায়েম খানের নাতি আনোয়ার হোসেন খান এবং এনএসএফ-এর নেতা আবুল কাশেম।

বিকেল ৪টা নাগাদ কিশোরগঞ্জ জেল থেকে বের করা হ'ল। হাঁটিয়ে নেয়া হ'ল স্টেশন পর্যন্ত। এখানে পুলিশরা আমাদের ৩য় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে নিতে চাইল। কিন্তু আমরা যেতে চাইলাম না। শেষ পর্যন্ত ১ম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে নিয়ে আসা হল। দেখা গেল এখানে অনেক চেনা মুখ। আমাদের জন্য সাধারণ সৌজন্যবোধে

www.pathagar.com

সিট ছেড়ে দিলেও তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় আমাদের প্রতি নিন্দাসূচক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। আমরা নীরব দর্শক হয়ে বোবার মত বসে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন আসলো। আমরা ট্রেনে উঠলাম। পুলিশেরা আমাদের মার্জিত ব্যবহার ও আচার আচরণের কারণে ট্রেনের মধ্যে আমাদের হাতের বেড়ী খুলে দিল। ট্রেন ছাড়লো। আমি কিশোরগঞ্জ ছেড়ে চলেছি। ভাল লাগছিল না মোটেও। এই মাটি এই আকাশের নিচে সর্বোত্তম কোরবানীর স্পৃহা নিয়ে প্রচণ্ড গোলাগুলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসেছি। কত আত্মোৎসর্গকারী সহযোগীদের তাজা রক্ত এ মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। এই মাটি এই পবিত্র মাটি ছেড়ে আমাকে যেতে হচ্ছে। সাধ করে নয়। নিজের প্রতিতো এখন আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কবর হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর। তবু বললাম, মনে মনে বললাম, 'খোশ রহো আহলে চামান মাইতো চামান ছোড়কে চালে।'– হে বাগানবাসী তোমরা আনন্দে থাক। আমিতো এই সাজানো বাগিচা ছেড়ে চলেছি।

তখন সুবেহ সাদিক। শম্ভুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছল। ময়মনসিংহ থেকে মাত্র ৩ মাইল দূর, ট্রেন আর এগুবেনা। কেননা সামনের সেতু ভাঙা। যুদ্ধকালীন সময়ে সেটা ভেঙে দেয়া হয়। এবার পায়ে হাঁটা পথ। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে নদী পার হলাম। সমস্ত আকাশটায় সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস। রাত্রির অন্ধকার পালানোর পথ খুঁজছে। আমি ভাবছি আমাদের জাতির ভাগ্যে পালাবদলের এমন মুহূর্ত কি কোনদিন আসবে না! ইসলামের সূর্যটা কারাবালার রক্তাক্ত পথ ধরে, সেই যে বিদায় হয়েছে, তারপর অন্ধকার। কখনো নিবিড়, কখনো আধো আলো। কখনো জোনাকীর আলো জ্বেলে অথবা দীপশিখা দিয়ে যুগের অন্ধকার বিদূরিত করার প্রয়াস প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু আজও মুসলিম বিশ্বে ইসলামের সূর্যোদয় হয়নি। ওজু করলাম কালের সাক্ষী প্রবহমান নদীর নির্মল পানিতে। তারপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে শিশির ভেজা দূর্বাঘাসের সবুজ গালিচায় নামাজ পড়লাম। দোয়া করলাম প্রাণ ভরে।

পূর্বাচলে সূর্যটা ধীরে ধীরে উঁকি মারছে। অনেকদিন পর অবারিত আকাশের নিচে প্রশান্ত নির্বিরোধ পরিবেশে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করলাম। তখন পৃথিবীটা পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে উঠছে। মনে হল, এটা প্রকৃতির পক্ষ থেকে সূর্যটাকে অভিনন্দন জানানোর প্রয়াস। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। এমন কি মসজিদ ফেরা কোনও মুসল্লিও চোখে পড়ল না। আর তেমন

www.pathagar.com

চোখে পড়ার কথাও নয়। মসজিদে যাতায়াতকারী মুসলমানদের অধিকাংশ তো কারাগারে। আর যারা বাইরে রয়েছে তারা পলাতক। এ কারণে মুসল্লিদের সংখ্যা নগণ্য হওয়া স্বাভাবিক। আর ওদিকে মুক্তবাংলার তথাকথিত ফৌজরা নিশাচর হয়ে উঠেছে। এদের অধিকাংশের তো এখন ঘুমানোর সময়। অতএব পথঘাট জনশূন্য। আমরা মনে করলাম এও আল্লাহ্‌র মেহেরবানী।

ইতিমধ্যে আমরা শহরের মধ্যে এসে গেছি। তখন ইতস্তত দোকান পাট খুলছে। কিন্তু সবারই চোখ আমাদের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। হয়তো ভাবছে, এমন প্রত্যূষে এরা কারা? আমার সাথীরা দেখতে শরীফ, সভ্য এবং নম্রতার প্রতীক। এদের ব্যাপারে পুলিশি তৎপরতা তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। তাদের বিস্ময়ে হতবাক হওয়া স্বাভাবিক। এই সাত সকালে পুলিশের বেষ্টনীতে যারা এসে থাকে তারা তো আমাদের মত নয়। তেমন মস্তানি সুরত আমাদের কারো ছিল না।

আমরা পুলিশদের বললাম, 'আমাদের হাতের বেড়ী পড়িয়ে দিন। তা না হলে আপনাদেরকে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে।' তারা ইতস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা মত কাজ করল।

হাঁটতে আছি। কিছু কিছু মাসুম বাচ্চা বই নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম মক্তবে কোরআন পাঠ করতে যাচ্ছে। আমার মনে হ'ল এসব ছোট্ট শিশুদের বুকে টেনে নিয়ে বলি– 'আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করে তোমাদের জন্য এক নিরাপদ ভবিষ্যত রচনা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য দিয়ে জাতির ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনো।'

জেল গেটে এসে পড়লাম, দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাইরে। কেননা তখন অফিসার নেই। এখন আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। অনেকক্ষণ পরে অফিসাররা আসার পর আমাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। ঢুকেই দেখলাম মওলানা মুসলেহ উদ্দিন। তিনিও আমাদের মত একজন কারাবন্দী। তিনি পিডিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের মত দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকেও আজকের এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে। তাকে দেখেই আমি সালাম দিলাম। তিনিও আমাকে পেয়ে দারুণ খুশী হলেন।

বাইরে থেকে নতুন যারা আমদানী হয় তাদের তদারকীর দায়িত্বে ছিলেন কিশোরগঞ্জ মহকুমা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জনাব মোশাররফ হোসেন

www.pathagar.com

সাহেব। আপাতত আমি তার হেফাজতে। আমি ভাবলাম মোটামুটি সময় আমার ভালই কাটবে। এখন আমি আমদানী খাতায় রয়েছি। নবাগতদের স্কুলে রাখা হত। স্কুল কেন বলা হত আমার জানা নেই। সেসব জানবার আগ্রহও আমার ছিল না। দুই রাত্রি আমাকে সেখানে থাকতে হয়। মোশাররফ সাহেবের ওপর সবাই বিরূপ। বিরূপ হওয়া স্বাভাবিক। যা দেখলাম তাতে আমিও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কারাগারে যে খাদ্য সরবরাহ করা হত সেটা একে তো নিম্নমানের এবং পরিমাণে কম। তা সত্ত্বেও সেই স্বল্প পরিমাণ খাদ্যে কর্তা অর্থাৎ মোশাররফ সাহেব নিজের অতিরিক্ত ভাগ বসাতেন। এছাড়া স্বল্প পরিসর একটি কক্ষ। সেখানে প্রায় ২শ' লোক। পালা করে শোয়ার জায়গাও মেলে না। এতদসত্ত্বেও তাকে আমি দেখেছি, একটা বিরাট স্থান দখল করে তিনি রয়েছেন তার একার জন্য। আমি অবাক হলাম। জামায়াতে ইসলামীর মত আদর্শবাদী সংগঠনের নেতৃপর্যায়ের হয়েও তিনি কিভাবে এমন নির্মম, এমন নিষ্ঠুর হতে পারলেন? আমার সেদিনই মনে হল খোদার তরফ থেকে আমাদের জন্য এমন জিল্লতি নির্ধারিত হওয়ার এ সবই কারণ। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের তৎপরতা খোদার নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের আবেগ-তাড়িত হয়ে, জীবনের সমস্ত কিছু কোরবানী দিয়েও দেশটাকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানে অনেক অমানুষ এসেও মানুষের সাথে মানবিক আচরণ করে থাকে। তার কারণ, সবার ভাগ্য এখানে এক সূত্রে গাঁথা। এমন এক স্থানে এসে মোশাররফ সাহেব যে আচরণের প্রদর্শনী করেছেন তাতে তার মত লোকেরা ক্ষমতাসীন হলে জাতির ভাগ্যে দুর্বিপাক ছাড়া কিছুই মিলবে না। তার সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে আমার মন চাইল না। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার ব্যাপারে আমি জামায়াত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও তিনি এখন কিশোরগঞ্জ জামায়াতে ইসলামীর নেতা। এ দেখে মনে হল, আমীর মোয়াবিয়া যেন আমীরুল মোমিনীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

যাই হোক, ২ দিন পর আমাকে জেল সুপার মোফাখ্খার সাহেবের দপ্তরে তলব করা হল। আমি তার সম্মুখে উপস্থিত হতেই আমার দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর যে আচরণ করলেন তা হল, তিনি যেন বিচারকের আসনে সমাসীন আর আমি এক অসহায় খুনের আসামী। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কয়টা মানুষ হত্যা করেছো?" তার প্রশ্নের ধরনে ভীষণ বিরক্তি অনুভব করলাম। জবাবও দিলাম একটু বাঁকা করে। বললাম– 'জবাবটা আমি আদালতে যথাসময়ে দেব। কারা কর্তৃপক্ষের কাছে নয়'। জবাব শুনে তিনি গর্জে উঠলেন।

www.pathagar.com

বললেন, 'তেজ তো এখনো কমেনি। জানো আমি কী করতে পারি'? জমাদারকে ডাক দিলেন। ডাক শুনে জমাদার এসে উপস্থিত হলে বললেন– 'এর পায়ে জুতো কেন?' জমাদার কাশেম আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর জুতা খুলিয়ে আবার আমাকে আনা হল তার সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী করতাম? বললাম– 'কলেজে পড়তাম।' তিনি বললেন– 'চেহারা সুরত তো ভদ্র ঘরের বলে মনে হয়। কিন্তু খুন-খারাবীর ফিরিস্তিও তো কম নেই।' বলে গেলেন নিজের মনে, তারপর কাগজে কি লিখলেন সেটা আমার জানার কথা নয়। আমাকে স্কুল থেকে আনা হল হাজতী ওয়ার্ডে।

ওদিকে আদালতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার শুনানী শুরু হয়েছে। একই মামলায় আমাকে এবং মওলানা কুতুবউদ্দিন সাহেবকে আদালতে হাজির হতে হচ্ছে প্রত্যেক দিনই। আমার স্বপক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন এডভোকেট সাত্তার ও তাহেরউদ্দিন সাহেব। বাদী পক্ষে রয়েছে সরকারী পিপি, আওয়ামী লীগের এমপি এডভোকেট আবদুল হক। তিনি আলবদরের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত। তার দাপট তখন আদালতের স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে অশালীন ঔদ্ধত্যের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমার স্বপক্ষের এডভোকেটকে স্বাভাবিকভাবে মামলার জেরা করতে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি খানিকটা ভীত। কেননা আমার স্বপক্ষে তার বক্তব্য না জানি তাকেও আসামীর পর্যায়ে টেনে আনে।

বিচারক তাঁর আসনে নির্বাক। ভীত-বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এমপি আবদুল হকের গর্জনে তার আসনটা কেঁপে উঠেছিল কিনা জানিনা, তবে রায়টা আমার বিপক্ষে দিতে সম্মানিত বিচারক বাধ্য হয়েছেন। তার কারণ ২০ বছর কারাদণ্ডের রায় শোনার পর যখন আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করি তখন তিনি অসহায়ের মত সকরুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর যখন হাতে কোমরে বেড়ী দিয়ে পুলিশেরা আমাকে কাঠগড়া থেকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, তখন আমার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন– 'আপনি হাইকোর্ট করলে খালাস পাবেন।' তখন অবশ্য পিপি এডভোকেট আবদুল হক আদালতে ছিলেন না। এই একই মামলায় মওলানা কুতুবউদ্দিন সাহেবের ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এখন তিনি সিলেটে দরগা মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

আমাকে কারাগারে ফিরিয়ে আনা হল। এসে দেখলাম সকলে আমার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে প্রহসনমূলক বিচারের রায় তাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

আমাকে পেয়েই তারা অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি তাদের উদ্দেশে কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি তুলে ধরি 'ফাইন্নামায়াল উসরে ইউসরা, ইন্নামায়াল উসরে ইউসরা'– কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের পরে আছে স্বস্তি। আরও বললাম, 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে'। এই মেঘ এই আবর্ত একদিন কাটবেই, এখন প্রয়োজন ধৈর্যের। আল্লাহ এ পরীক্ষাই নিতে চান আমাদের কাছে।

এবার আমাকে অলংকার পরানোর পালা এল। বিচার প্রহসনে প্রমাণিত হয়েছে আমি খুনী। আমি এক দুর্ধর্ষ আসামী। আমাকে তো শিকল পরাবেই। কারাগারের ভাষায় ডাণ্ডাবেড়ী। সাড়ে সাত সের ওজনের সবচেয়ে ভারীটাই পরান হল আমাকে। এরপর আমাকে আনা হল জাহান্নাম থেকে হাবিয়ায়। অর্থাৎ সাধারণ ওয়ার্ড থেকে ফাঁসীর সেলে। সবচেয়ে মারাত্মক আসামীর জন্য এটি তৈরী। কারাগারের ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আমার স্থান হল এখানে। এখানে আমি একা, একান্ত একাকী। প্রকোষ্ঠের দরজা তালাবদ্ধ। এর পরেও একটি দরজা, সেখানেও তালা। তদুপরি সশস্ত্র সেন্ট্রী। আমাকে ঘিরে পুলিশী তৎপরতা দেখে আমার মনে হল, জেমস বন্ডের ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক আমি।

অন্ধ প্রকোষ্ঠে নির্লিপ্ত একাকী আমি। ভাল লাগছে, বড্ড ভাল লাগছে আমার। এখানে আমি যেন একান্তভাবে খোদার অস্তিত্বকে অনুভব করছি। অন্তর দিয়ে আমি ডাকছি তাঁকে। আমি যেন হৃদয়ের অনুভূতি ঢেলে তাঁকে স্পর্শ করছি। মনে হল আমার মালিকের নিবিড় সান্নিধ্য পেলে অনন্তকাল ধরে এই অন্ধ কুঠরীতে মোটেও কষ্ট হবে না আমার। আমার মওলার ইচ্ছার সাথে আমার ইচ্ছা একাকার হয়ে গেছে। আহ্, কি সুখ আমার! এখন আমার মনে হচ্ছে জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইবরাহিম (আঃ) হয়তো এর চেয়ে বেশী সুখ পেয়েছিলেন। লালনের ভাষায় : এ মরণ যে সুখের মরণ।

আবার আদালত। আওয়ামী লীগের আদালত, মুজিব প্রশাসনের আদালত। সেই একই স্টাইল। সেই একই বিচার প্রহসন। আবার ২০ বছর। আওয়ামী লীগের এমপি এডভোকেট আবদুল হক বিচারকের ওপর ভর করেছেন। জ্বীনের আছরপ্রাপ্ত রুগীর মত মাননীয় জজ সাহেব এমপি আবদুল হক সাহেবের রায়টাকে প্রকাশ করলেন মাত্র। আমার মন মস্তিষ্কে এই রায়ের কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। হিন্দুস্তানী কূটচক্রের আবেষ্টনীতে যে প্রশাসন বাঁধা, সে প্রশাসন নিজেই তো অসহায়। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য ইসলামী চেতনার মানুষগুলোকে তারা বিপন্ন

www.pathagar.com

করবে এমন প্রত্যাশার বাইরে আমি কখনও কিছু ভাবিনি। আমার ফাঁসী হলেও অস্বাভাবিক মনে হত না। ৪০ বছর কারাদণ্ড বলতে গেলে খোদার এটা এক মেহেরবানী। ২শ' বছর আগে এমনি প্রহসন হয়েছিল মুর্শিদাবাদের আদালতে।

কারাগারের ভেতরে কারাগার। তার ভেতরে একটা ছোট্ট অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখেও আমাকে সাড়ে সাত সের ওজনের ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত করা হল না। নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে আমাকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ঘর্ষণের ফলে আমার পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হল। ডাণ্ডাবেড়ী থেকে মুক্ত হবার আবেদন করলাম। তাও নাকচ হল। অন্ধ কুঠুরীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখার অন্তহীন পিপাসা আমার অন্তরে জেগে উঠল। সে আলো মুক্ত পৃথিবীর সূর্যরশ্মি নয়। অক্ষমতার জন্য যে দীপশিখার ভার বহন করতে আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, পর্বত অস্বীকৃতি জানায় সেই কালামে পাক আল কোরআনের কিছু আলো চাই। আমার এই আবেদন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলেন। তফসীরের জন্য নিয়োগ করা হল মওলানা আবদুল হান্নান সাহেব ও মুফতি মওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবকে। তারা নিয়মিত তাফসীর করার জন্য আমার সেল প্রকোষ্ঠে ও ১৯নং ওয়ার্ডে আসতেন। পরবর্তীতে তাফসীর ক্লাসে যোগ দিলেন অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান, বিগচান খান (শহীদ আবদুল মোনয়েম খান-এর ভাইস্তা), সেলিম দারোগাসহ আরও ৩ জন কারাবাসী পুলিশ অফিসার। এরা দালাল আইনের আসামী।

অন্ধ প্রকোষ্ঠে কারাবাসের দুটো বছর পেরিয়ে গেছে। অনেক দিন পর আমার আহত মানসিকতায় আনন্দের ছোঁয়া সকাল থেকে অনুভব করছি। কিন্তু কেন? আমি তখনও বুঝে উঠিনি। মনে হচ্ছে কি যেন আমি পেতে চলেছি। অনেক তপস্যা অনেক সাধ্য সাধনার পর হেরার গুহায় মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অন্তঃকরণে কিছু পাওয়ার পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। যা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বিহ্বল করেছিল। আমার আবেগে তেমন আনন্দের আতিশয্য অনুভব করছি।

বেলা ১১টা। একজন সেন্ট্রী তালা খুলে জানাল– 'ভিজিটিং রুমে আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য লোক এসেছে। আপনি আমার সাথে আসুন।' আমি বিশাল বিস্তৃত অন্তহীন মরুতে এক নাগাড়ে পথচলা পরিশ্রান্ত তৃষ্ণাবিধূর মুসাফির। সামনে অদূরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে মরুদ্যান-ওয়েসিস, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি কাঁপছি, বালির সমুদ্রে পা আটকে যাচ্ছে বার বার। আমাকে আনা হল ভিজিটিং রুমে। আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী কিছু পেলাম। অনেক পাওয়ার আনন্দে

www.pathagar.com

আমি উদ্বেল, বিস্ময়ে বিমূঢ়, মুখের ভাষা মূক হয়ে গেছে। আমি দেখছি আমার পরম পাওয়াকে। আর হৃদয় দিয়ে গেলাসে গেলাসে পান করছি স্বর্গীয় সুখ। মা, আমার মা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আড়াই বছরের তৃষ্ণা আর চব্বিশ বছরের জমাট বাঁধা গভীর মমতা নিয়ে অশ্রুসজল চোখে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো তাঁর সন্তানকে গভীর আগ্রহে তিনি দেখছেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই নির্বাক। ফেলে আসা দুঃসহ দিনগুলোর সমস্ত ক্লেদাক্ত ব্যথা মা-সন্তান উভয়েই ভুলে গেছি। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি ডাকলাম 'মা! মাগো।' এবার মায়ের চোখে অশ্রুর ঢল নামল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর অক্ষর সাজিয়ে মা যেন আমার অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদের ফিরিস্তি লিখে চলেছেন। কাঁদছে মায়ের সাথে আসা আমার বিধবা বোন কাঞ্চন। তার কত আদর মমতা আর আশীর্বাদের স্পর্শ আমার গায়ে লেগে আছে তার হিসেব নেই।

আমি আবার ডাকলাম, মা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি ভুল করেছি মা?' মায়ের স্পষ্ট জবাব– 'না'। বলতে থাকলেন : 'আর এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। অন্তহীন ব্যথার দুঃসহ বোঝা নিয়ে আমি বেঁচে আছি এইভেবে যে, আমার সন্তান কোনদিন অন্যায় অপকর্মে জড়ায়নি। হক আর বাতিলের সংঘাতে আমার কলিজার টুকরা আমার সন্তান হকের স্বপক্ষে জানবাজি রেখেছে। মানুষ এখন সব বুঝে। আমি দোয়া করি হকের স্বপক্ষে তুমি যেন চিরদিন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার। আল্লাহ যেন তোমাকে সার্বক্ষণিক ধৈর্যের তাওফীক দেয়। বাতিলের ধ্বংসস্তূপের ওপর হক আর ইনসাফের ঝাণ্ডা একদিন উড়বেই।'

মা আমার কাছে, আরো কাছে এসে আমাকে স্পর্শ করে বললেন, 'বাবা আমার বুকটা শূন্য হয়ে আছে। শূন্য হয়ে আছে আমার বাড়ী-ঘর। তোমার ঘরের চারপাশে এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। তোমার কুকুরটাকেও ওরা হত্যা করেছে। তোমার বন্ধুরাও এখন আর আসেনা। অন্তহীন একাকীত্ব নিয়ে আমি একা তোমার মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। আর তোমার জন্য সবকিছু আগলে আছি।' মাকে বললাম– 'মওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কোরআন আর হাকীকত সিরিজের যে বইগুলো আছে, কেউ এলে তার হাতে পাঠিয়ে দিও।' মা এগুলো অনেক যত্ন করে মুক্তিফৌজের দৃষ্টির বাইরে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। মার সাথে সাক্ষাতের কিছুদিন পর আমার চাচাত ভাই খন্দকার বজলুর রহমানের হাতে বইগুলো পাঠিয়ে দেন। এই বই ক'টিকে পুঁজি করে আমি কারাগারে সাংগঠনিক কাজ শুরু করি।

www.pathagar.com

একদিন মামা জনাব আবুল হাশিম সাহেব মোমেনশাহী কারাগারে এলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। তিনি সদ্য মক্কা থেকে ফিরেছেন। হজ্জে যাওয়ার আগে তিনি চিঠিতে আমার প্রতি গভীর মমতার কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, আল্লাহর ঘর খানা-এ-কাবায় তিনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার প্রতি তার প্রাণের গভীরে যে তীব্র অনুভূতি রয়েছে সেটা আমি জানতাম। এই মামা এবং তার স্ত্রী, আমার মামীর স্নেহমমতার ছায়া পরিবেষ্টিত ছিল আমার শৈশব। কৈশোর-যৌবনেও আমি তাদের স্নেহ-বঞ্চিত হইনি। রাজনৈতিক শঠতার শিকার হয়ে অন্ধ জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আমি ধিকৃত হলেও আমার জন্য মামা-মামীর ছিল অপরিসীম দোয়া। আমার কারণে মামাকে লাঞ্ছিত হতে হয়, এমন কি তাকে হত্যা কারার জন্য বধ্যভূমিতে নেয়া হয়। তার উদ্দেশ্যে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু খোদার মেহেরবানীতে সবকটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীতে তার গুণগ্রাহী প্রতিবেশী, মুক্তিফৌজ ও অন্যান্য মানুষের চাপে তাকে তার হত্যাকামীরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কারাগারে আমার সাথে দেখা হতেই তিনি বললেন– 'এখনও তোমার পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী। এটা থাকার কথা নয়। আমি তো খাস করে তোমার জন্য দোয়া করেছি। আমি ভেবেছিলাম এসেই অন্তত তোমাকে ডাণ্ডাবেড়ীমুক্ত দেখব।' তখন তিনি আমাকে ডাণ্ডাবেড়ী মুক্ত না দেখলেও সময়ের স্বল্প ব্যবধানে আমি এ থেকে মুক্ত হই এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলোও আমার দূর হয়। মামার পরহেজগারীর তুলনা হয় না। তিনি জামায়াতকে রাজনৈতিক সমর্থন দিতেন। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি ছিল তার অবিচল আস্থা।

একদিন শুনলাম ঢাকা থেকে কারাগারসমূহের ডিআইজি জনাব কাজি আবদুল আওয়াল সাহেব আসবেন। চারিদিকে মোটামুটি সাজ সাজ আয়োজন। এসেও পড়লেন একদিন। কারা পরিদর্শন করতে করতে অবশেষে আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাথে আছেন সব কয়জন ডেপুটি জেলার ও অন্যান্য অফিসার।

আমি সালাম দিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য জমাদার কাশেম মুখ খুললেন। বললেন, "স্যার এই যে আমিন। এই জেলের সবচেয়ে বড় টেরর। খুনের আসামী স্যার, বহু মানুষ খুন করেছে। ২টা কেসে ৪০ বছর জেল হয়েছে স্যার। এখানে এই সেলে আমরা খুব কড়া নজরে রেখেছি স্যার।" ডিআইজি সাহেব শুনে গেলেন কেবল। খুব খুশী হলেন এমনটি মনে হল

www.pathagar.com

না। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন– 'কি করতেন।' বললাম– 'ভৈরব কলেজে পড়তাম।' গভীর মমত্ববোধ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাইকোর্ট করেছেন?' বললাম– 'না'। আবার প্রশ্ন– কেন? বললাম– 'যারা করতে পারতেন তাদের অনেকে শহীদ হয়েছেন। বাকী যারা রয়েছেন তারা পলাতক। তবে কেউ কেউ আশ্বাস দিলেও তারা তেমন কিছু আমার জন্য করেনি।' তিনি বললেন– 'আপনি তো ভেতর থেকেই করতে পারতেন।' বললাম– 'তা হয়তো পারতাম। কিন্তু বাইরের আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সময় পেরিয়ে গেছে।' ডিআইজি দুঃখ প্রকাশ করলেন আর জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কি?' বললাম– 'অসুবিধা তো সবটাই। তবে সবচাইতে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই ডাণ্ডাবেড়ী। এ নিয়ে নামাজ কালামও স্বস্তির সাথে পড়তে পারছিনা।' ডিআইজি জেলারদের উদ্দেশে বললেন– 'জেলার সাহেব! বেড়ীটা খুলে দিবেন।' জেলার আমিনুল ইসলাম সাহেব প্রত্যুত্তরে বললেন– 'স্যার অসুবিধা আছে।' ডিআইজি এ ব্যাপারে কোন পুনরুক্তি না করে শুধু বললেন, 'ঢাকা পাঠিয়ে দিন।'

ডিআইজি সাহেব চলে গেলেন। সপ্তাহ গড়িয়ে গেছে। একদিন জানলাম আমাকে, আবু ইউসুফকে ঢাকা জেলে স্থানান্তর করা হবে। আবু ইউসুফও আলবদরের সদস্য ছিল। তারও ২০ বছর কারাদণ্ড হয়। তারিখটা '৭৪-এর ১৭ জানুয়ারী। বেলা ১০টায় আমাদেরকে কারাগার থেকে বের করা হল। বেরিয়ে দেখলাম সংগঠনের কে এম মঞ্জুর এলাহী ভাই সহ নবীন কর্মীরা আমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। সিপাহীরা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, 'কাছে কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদের বাসা বেড়িয়ে যেতে পারেন। তখন সংগঠনের ভাইয়েরা আমাকে মৃত্যুঞ্জয় রোডে জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন নোয়াখালীর রব সাহেবের বাসায় নিয়ে এলেন। সেখানে খাওয়া দাওয়া করলাম, খোলামেলা অনেক আলাপ আলোচনা হল। জানলাম মুজিবের বেসামাল অবস্থা। গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভীতি সঞ্চার করে যতদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে। একাত্তরে যে হাতগুলো মুজিবকে জীবন্ত ফিরে পাওয়ার জন্য দোয়া করেছিল সেই হাতগুলো খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে মুজিবকে।

বিকেলে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। ট্রেন আসতে তখনও দেরী। অনেক পরিচিত মানুষ অনেক চেনামুখ চোখে পড়ছে। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছিলাম।

www.pathagar.com

পুলিশরা আমার পাশেই বসা। দেখলাম একটা তরুণ ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। এসে জিজ্ঞেস করল 'আমিন দা, আমাকে চিনছেন?' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু না, আমার পরিচিত কোন আদলের সাথে এ চেহারার মিল নেই। বললাম– 'নাতো ভাই, আপনাকে তো চিনছিনা।' তরুণটি আহত হল যেন। একটু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল– 'আমি কোমল রায়।' বললাম– 'বেশ জোয়ান হয়ে গেছতো! আর বলোনা ভাই এ কয়টা বছর যে ধকল গেছে আমিতো আমাকেই ভুলে গেছি। কিছু মনে করোনা।' কোমল আমাকে ভাল ফুটবল প্লেয়ার হিসাবে জানে। ও আমার দারুণ ভক্ত ছিল এককালে। সে নিজেও ভাল খেলোয়াড় হওয়ার জন্য কসরত চালাত। জিজ্ঞেস করলাম– 'খেলাধুলা চলছে তো তোমার'? বলল– 'চলছে, কিন্তু সেই আগের মত কি আছে দাদা। এখন সবাই যার যার তার তার। মানুষ যেন সব কেমন হয়ে গেছে।'

বলতে ইচ্ছে হল, এখনি কী হয়েছে! কেবল তো শুরু। অথচ আমাদের রক্ত লোলুপ ধর্মোন্মাদ ও মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করার জন্য প্রতিপক্ষরা কতইনা প্রচার চালাচ্ছে। আমরা জাতীয় আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুশীলন করার চেষ্টা করি, এটাই আমাদের অপরাধ। কোন হিন্দু অথবা অন্য কোন সংখ্যালঘু এমনকি কেউ আছে যে হলপ করে বলতে পারে, আমরা তাদের সাথে অসামাজিক অথবা অন্য কোন খারাপ আচরণ করেছি? এটা প্রচারণা। শুধুমাত্র মিথ্যা প্রচারণা। ভারতের তথাকথিত প্রগতিশীল বাবু ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এদেশের অভিজাত হিন্দুরা তাদের গোয়েবলসীয় প্রচারণার দ্বারা এদেশের হিন্দু সমাজকে অশান্ত উদ্বেল করে তুলেছে। এদের বিরূপ করে তুলেছে মুসলমানদের ওপর। এদেশের মাটিতে বসবাস করেও গণমানুষের সাথে একাকার হতে পারছেনা এরা। আর এদেরকে উত্তেজিত করে এবং এদের মনমানসিকতায় কাল্পনিক ভীতির সঞ্চার করে হিন্দুস্তানের মদদপুষ্ট কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক চক্র তাৎক্ষণিক ফায়দা নেবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরাই কৃত্রিম দরদ, মমত্ববোধ আর পৃষ্ঠপোষকতার আবরণে সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের জন্য কাঁটার শয্যা রচনা করছে।

ট্রেন এসে গেল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠলাম। দেখলাম সেখানে আরও কিছু পুলিশ অফিসার আগে থেকেই বসেছিলেন। তারা আমার পরিচিত, এক সময় খুব কাছাকাছি ছিলাম আমরা। যখন কিশোরগঞ্জের পুরো দায়িত্বটা ছিল আমার উপর, তখন তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা আমাকে

www.pathagar.com

জানে। জানে আমার ভেতর-বাহির। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভিবাদন জানালো। খুনের আসামী আমি, আমার কোন এক সময়ের পুরনো সহযোগীদের কাছে পেয়ে বেশ ভাল লাগল। মনে পড়ল আমার সংগ্রামী দিনগুলোর বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। এরাও তো হিন্দুস্তান যেতে পারত। কিন্তু না, ভুল করেও ওদিকে পা বাড়ায়নি। জাতীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতির কথা ভেবেই সম্ভবত তারা এমনটি করেনি। উৎকোচ সংক্রান্ত পুলিশদের স্বাভাবিক অসংযমী আচরণের বহিঃপ্রকাশ যুদ্ধকালীন ৯ মাস তাদের মধ্যে দেখিনি। তারা যা কিছু করেছেন নেহায়েত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তারা আমার সাথী পুলিশদের বলে দিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়। বললেন– 'তোমরা যদি আমিন সাহেবকে সত্যি খুনের আসামী মনে করে থাক তাহলে ভুল করবে। উনি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক নিষ্ঠুর শিকার। আমরা তাকে দেখেছি অত্যন্ত কাছে থেকে, আমরা তাকে জানি। তোমরা ছেড়ে দিলেও উনি পালাবেন না।' পুলিশরা জবাব দিল, "স্যার, মানুষ নিয়েই তো আমাদের কারবার, প্রকৃত ক্রিমিন্যাল চিনতে কি আমাদের ভুল হয় স্যার। উনাকে জিজ্ঞেস করুন, তার সাথে কোন বেয়াদবী করেছি কিনা?'

রাত তখন ১১টা। এসে পৌঁছলাম কমলাপুর স্টেশনে। কালের সাক্ষী এই কমলাপুর স্টেশন। স্টেশনের সেই আগের জৌলুস নেই। জেল্লা ফিকে হয়ে গেছে। লাবণ্যের কোথায় যেন ঘাটতি মনে হচ্ছে। আরও দেখলাম, শত শত ছিন্নমূল মানুষ। কঙ্কালসার মানুষগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে শু য়ে-বসে আছে। জীবন যুদ্ধে পরাজিত মানুষের ভিড় এখানে। শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুত গণমানুষের কল্পিত সোনার 'বাংলা'র বিবর্ণ চেহারা দেখে আমি আহত হলাম দারুণভাবে। এই স্টেশন, এশিয়ার বৃহত্তম স্টেশন। শেখ মুজিব গংরা যাকে বড় দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, যুদ্ধকালীন সময়ে যিনি কোন ভূমিকা না রাখা সত্ত্বেও রুশ-ভারত চক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন, সেই সাবেক গভর্নর শহীদ আবদুল মোনয়েম খানের অবদান এই স্টেশনটি। কালের আবর্তে এই স্টেশনই মুজিবের তথাকথিত সোনার বাংলার ছিন্নমূল মানুষগুলোর শেষ আশ্রয়স্থল।

স্টেশন থেকে রিক্সাযোগে মতিঝিলের দিকে এগুলাম। মতিঝিল এজিবি কলোনীতে রয়েছেন আমার ভগ্নীপতি সার্ভে অফিসার জনাব জসিমউদ্দিন আহমেদ। বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কড়া নেড়ে কোন সাড়া পাচ্ছিনা। পরে

www.pathagar.com

আমার নাম বলাতে এবং ভেতর থেকে গোপনে সতর্ক পর্যবেক্ষণের পর দরজা খুললেন। পরে জানলাম রাজধানী ঢাকা সন্ত্রাস, ডাকাতি আর রাহাজানীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এসব অপকর্মের নেটওয়ার্ক জাতির পিতার উত্তরসূরী জাতীয় রত্ন শেখ কামালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ল– 'প্রত্যেক জিনিসই তার উৎসের দিকে ফিরে যায়।' শেখ মুজিবের সোনার বাংলা চোরের খনিতে পরিণত হয়েছে; তার ভাষায়– 'আমি ডানে তাকালে চোর, বামে তাকালে চোর, যেদিকে তাকাই সেদিকেই চোর।' আয়নার সামনে দাঁড়ালে কি দেখেন তা অবশ্যি তিনি বলেননি। যাইহোক, মানুষ সন্ত্রাস ও ভয়ঙ্কর ভীতির মুখোমুখি। রাত হলে মানুষ ঘর থেকে বেরুতে চায়না আর একটু বেশী রাত হলে দরজা খোলার তো প্রশ্নই উঠে না।

দীর্ঘ চার বছর পর দুলাভাইয়ের সাথে আমার দেখা। ইতিমধ্যে বুড়িগঙ্গায় কত পানি গড়িয়ে গেছে। বিবর্তনের গতিধারায় কত মানুষ কতভাবে পাল্টে গেছে। কিন্তু আমার ফুফাত বোনটা যেন আগের মতই সেই মমতার মূর্ত প্রতীক। বিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি তাঁর মধ্যে। বড় ভাল লাগল। মাত্র দুটি বছর অথচ দুটো যুগ পর যেন আমরা এমন কাছাকাছি এসেছি। তাও একটি মুহূর্তের জন্য। আবেগের আতিশয্যে বোন-দুলাভাই দু'জনে একইভাবে উদ্বেল। মাত্র একটি মুহূর্ত, এর মধ্যে কত কথা, কত আদর-আপ্যায়ন, কত আলাপ আলোচনা। বড় ভাল লাগল। রাত ১২টা। বিদায় নিলাম।

রওয়ানা হলাম টিকাটুলীর দিকে। উদ্দেশ্য চাচা-মামার বাসা। চাচা খন্দকার মোহাম্মদ ইসমাইল ফুডের ডেপুটি ডাইরেক্টর। ডেকে তুললাম। চাচা আমাকে পেয়ে কি দারুণ খুশী। চাচার স্নেহ মিশ্রিত সংলাপে বাবা স্নেহসুলভ আচরণের কথা মনে পড়লো। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। পিতার সহোদরকে মনে হল যেন আমার সেই হারানো পিতা, আমার সম্মুখে বসে আছেন। প্রাণ খুলে আলাপ করলাম। মনে হল কতকাল মহাকাল পেরিয়ে এসে এমন প্রাণের স্পর্শ পেলাম আমি। পাশে মামার বাসা। মামা সফিউদ্দিন সাহেব অবসরপ্রাপ্ত সিও (ডেভ)। তিনিও এলেন। আত্মীয় পরিজনদের উচ্ছ্বসিত স্নেহের বারিধারায় আমার আত্মা সিক্ত হয়ে উঠল।

রাত গভীর। সময়ের পরিসর স্বল্প অথচ এরই মধ্যে রান্না হয়ে গেছে। আমার সাথী পুলিশদের সাথে নিয়ে খেতে বসলাম। কি যে ভাল লাগছে। মাতৃত্বের গন্ধ মিশে আছে এ রান্নায়। চাচী নিজ হাতে রান্না করেছেন। মা-চাচীতে পার্থক্য আর

www.pathagar.com

কতটুকু! বাড়ীর রান্না, দারুণ খেলাম। তৃপ্তিতে মন প্রাণ ভরে গেল। চাচা চাচী দুজনের সাথে কথা বললাম। এত সময় ধরে এমন করে কোনদিন তাদের সাথে মুখোমুখি আলাপ করিনি। ফজরের আযান তখনও হয়নি। তবে বাকীও তেমন নেই। এবার বিদায় নেয়ার পালা। চাচাও আমাদের সাথে বাইরে এলেন। চাচার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে কণ্ঠ জড়িয়ে এসেছিল, বাষ্পরুদ্ধ ছিল তার শেষ কথাগুলো।

পথে বেরিয়ে পড়লাম। বেশ কিছু পথ হাঁটতে হল। তারপর রিক্সা পেয়ে গেলাম। এসে পৌঁছলাম কেন্দ্রীয় কারাগারে। পথেই ফজরের আযান শুনেছি। নামাজের সময় আসন্ন। অজু করলাম। নামাজ পড়লাম পুলিশ ব্যারাক মসজিদে। আত্মীয় পরিজনদের সান্নিধ্য পাওয়া আনন্দের রেশ রয়ে গেছে বলে সফরের ক্লান্তি কাহিল করতে পারছেনা। ভোরের নির্মল হাওয়া উল্লসিত হয়ে দালানে দালানে ঠোকর খেয়ে ফিরছে। আর মাঝে মাঝে কারো সাজানো ফুলের বাগান থেকে সুরভী ছিনতাই করে দস্যু বাহরামের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে সবার মধ্যে। হাসনাহেনার আতরদানি নিঃশেষ হয়নি তখনও। খু-উব ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি গান ধরি। 'ঐ দূর দিগন্তে ডাক এল, ডাক এল, ডাক এল। স্বর্ণ ঈগল পাখা মেল, পাখা মেল, পাখা মেলরে।' স্বর্ণ ঈগলের ডানায় অফুরন্ত শক্তি থাকলেও পা তো শেকলে বাঁধা।

আমি বাহির থেকে কারাগারকে দেখছি, যেমন করে গোরস্থান দেখে মানুষ। জীবনে চল্লিশটি বছর এখানেই কাটবে আমার। অবশিষ্ট আর কতটুকু থাকবে আমার জন্য। হয়তো একদিনও নয়। কারাগারকে গোরস্থান মনে করা আমার জন্য অযৌক্তিক নয়। একটু পরেই আমি কেন্দ্রীয় কারাগারের বাসিন্দা হব। অতএব বাইরের পৃথিবীটাকে একটু ভাল করে দেখে নিই। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখতে চাইলাম। সাথী পুলিশদের কোন আপত্তি ছিলনা ওতে। ওরাও আমার সাথে সাথে হাঁটছে। হেঁটে হেঁটে ঘুরলাম নাজিমউদ্দিন রোড, চকবাজার, বখশিবাজার, উর্দু রোড। দেখলাম এত ঝড়ের মধ্যেও উর্দু রোড তার অস্তিত্ব ঠিকই বজায় রেখেছে। জিন্নাহ্ এভিন্যু বঙ্গবন্ধু এভিন্যু হয়েছে। ইকবাল হল জহুরুল হক হল হয়েছে। পাকমোটর বাংলামোটর হয়েছে। কেবল মাত্র উর্দু রোড বাংলা রোড হয়নি, হয়তো বা এটা আওয়ামী লীগের হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে।

দেখলাম, জেলখানার আশেপাশে অনেক মানুষের ভিড়। এরা সব ঢাকার কুট্টি। আমাকে এই সাত সকালে শেকল বাঁধা অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখে অনেকে

www.pathagar.com

এগিয়ে এল। আগ্রহ সহকারে জানতে চাইল। বললাম সবকিছু। জনতা উত্তেজিত, সবার মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। বলল– 'আমাদের খাজা খায়রুদ্দিন সাহেবকেও শালা হিন্দুস্তানের দালালরা আটকে রেখেছে ভাইজান, চিন্তা করবেন না কিছু। শালারা বেশী দিন আটকে রাখতে পারবেনা। আপনাদের আমরা জেলের দরজা ভেঙে বের করে নিয়ে আসব।'

পুলিশরা একটু ভয় পেয়ে গেল। এ অবস্থায় আর এদের কাছাকাছি আমাকে রাখা সমীচীন মনে করল না। আমাকে সাথে নিয়ে উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে সরে গেল। বুঝলাম, হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। আবারও ঘুরলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সবকিছু। এক ফাঁকে নাস্তাও করলাম।

শেষ বারের মত এক কাপ করে চা খেয়ে কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কারা কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হল বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে পা রাখলাম। আমার সাথী পুলিশরা তাদের কাগজপত্রের কাজ সেরে বিদায় নিল। যাবার আগে শেষবারের মত আমার সালামত কামনা করে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল। এবার আমাকে নিয়ে আসা হল কেস টেবিলে। এখানে আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হল। কেস টেবিলের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেস টেবিলের চীফ রাইটার কামরুজ্জামান ভাই এসে আমার সাথে কুলাকুলি করলেন। এক মহান ভ্রাতৃত্বের আবেগ অনুভূতি লক্ষ্য করলাম। আমরা একই আন্দোলনের শরিকদার। এরপর এলেন তাহের ভাই, সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হক ভাই ও আজহার ভাই। সবারই একই অনুভূতি। এই অনুভূতি দেখে আমার মওলানা আবুল কালাম আযাদের একটি লেখার কথা মনে পড়ল। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন– 'সুদূর মিশরেও যদি কোন মুসলমানকে ফাঁসী দেয়া হয় আর তার দাগ যদি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের গলায় না দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে ইসলামী অনুভূতি বেঁচে নেই।' এত বড় একটা ঝড়, এত বড় একটা পট-পরিবর্তনের পরেও আমাদের ইসলামী উখুওয়াতে চিড় ধরেছে বলে মনে হল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কামরুজ্জামান ভাই বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় নেতা।

কেস টেবিলে কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়া হল। পা দুটো দারুণ হাল্কা অনুভূত হল। পা মাটিতে রাখতেই পৃথিবীটার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কিছু অভাব মনে হল। আসলে সাড়ে সাত সের ওজনের বোঝা কমে যাওয়ার জন্যই

www.pathagar.com

এমন মনে হচ্ছিল। সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চাদের মত বিক্ষিপ্ত হাঁটলাম কিছুক্ষণ। এরপর কামরুজ্জামান ভাই আমাকে ১০ সেল ডিভিশনে পৌঁছে দিলেন। এখানে এসে দেখলাম শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়া, জাসদের আকরাম ও মেসবাহ, বর্তমান মন্ত্রী পরিষদের সদস্য (এরশাদ মন্ত্রীসভা) সিরাজুল হোসেন খান; নারায়ণগঞ্জ মুসলিম লীগ নেতা হাজী রফিক, কালীগঞ্জের শাহ্জাহান চেয়ারম্যান এবং সাবেক ওসি ইউসুফ চৌধুরী আগে থেকে এখানে অবস্থান করছেন। আমি নিজেই তাদের সাথে পরিচয় করে নিলাম। বিভিন্নমুখী স্রোত এক মোহনায় এসে আমরা একাকার। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী মানুষ আমরা এক পরিবারের মত এখানে অবস্থান করছি। সেলের ২০ জনের এক চুলায় রান্না, একই রকম খাওয়া দাওয়া, কোন রকম বিরোধ-অন্তর্বিরোধের চিহ্ন এখানে নেই। অথচ এই মানুষগুলো বাইরের মুক্ত আলো বাতাসে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অপরের উপর মারমুখো। কিন্তু কেন? এই কেন-র জবাব আমি খুঁজে পাইনা। তবে মনে হয় বাইরের পৃথিবীতে এসে মানুষের স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন নেপথ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে। ফলে দৃশ্যপটের আড়াল থেকে বাইরের শক্তিসমূহ সূতোর টান দিয়ে নাচাতে থাকে সকলকে। সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয়। আল্লাহর পথে ফিরে আসা ছাড়া এই সংঘাত, এই রক্তপাতের অবসান কোন দিনই হবে না।

বর্তমান সরকারের মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান আমাদের সাথে ৬ মাস কাটিয়েছেন। তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। তার মাথায় তখন গিজ গিজ করছিল সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে তার বিবেক অন্ধ ছিল। শয়নে-স্বপনে, বিশ্রামে-জাগরণে সব সময় সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের ভূত যেন তার ওপর ভর করেছে। আমাদের মধ্যে যারা অগ্রজ, যারা লেখাপড়া আর পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে তার চেয়ে খাটো নয়, তারা কারাবাসের অফুরন্ত অবসরে তার মাথার সেই ভূত ছাড়ানোর তদবীর করত। কিন্তু সেই তদবীরের ফলে সমাজতন্ত্রী ভূত তার মাথায় আরও পাকাপোক্ত হয়েছে কিনা জানিনা তবে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে তাকে একই অবস্থানে দেখেছি। বিবর্তনবাদ তার মাথায় এসে স্থির হয়ে গেছে। আর কোন ক্রমবিকাশ ঘটছেনা। মেজাজের ভারসাম্য তার ছিলনা। এটা সম্ভবত তার স্বাস্থ্যগত কারণে। তবে আমার সাথে তার সম্পর্কটা সখ্যতার পর্যায়ে ছিল। আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের সাথে তার মিল না থাকলেও আওয়ামী লীগ ও ভারত বিরোধী মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন আমাদেরই মত একই অবস্থানে। বর্তমানে

www.pathagar.com

তার রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোকনা কেন অতীতে তার ত্যাগ ও তিতীক্ষার ইতিহাস আছে।

একদিন দেখলাম, মওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী কারাগারে এলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। খুলনার কোন এক জলসায় তার মুনাজাতকে কেন্দ্র করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পাবনার মনসুর আলী তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেলওয়ার হেসেন সাঈদীর প্রতি ক্যাপটেন মনসুর আলীর আক্রোশ অনেক আগের। পাবনা সবসময় ছিল আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। অনেক দেশপ্রেমিক মুসলমানের রক্তে পাবনা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাত রাঙা। সেই সন্ত্রাসী পাবনায় আওয়ামী লীগের আধিপত্যের ভিতকে নাড়াতে সক্ষম হন দেলওয়ার হোসেন সাঈদী। এজন্য তাঁকে তাঁর জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হয়। তাঁর সুললিত কণ্ঠের বিপ্লবী তফসীরের মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে আওয়ামী লীগ বিরোধী চেতনার লাভা ঢালতে সক্ষম হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর ক্যাপটেন মনসুর সেই সুযোগটা নিতে ভুল করেননি।

আমি এবং সাবেক এনএসএফ প্রধান সৈয়দ নেসার নোমানী সবরকম চেষ্টা চালিয়ে দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে ১০ সেল ডিভিশনে আমার সেলে থাকার ব্যবস্থা করলাম। তার মত চিন্তাশীল এবং প্রভাবশালী মানুষকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের সাথে রাখা মোটেও সঙ্গত হয়নি। কিন্তু না রাখলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুরের ক্ষোভ আর জিঘাংসা নিরসন হয় কী করে? সাঈদী সাহেব আমাদের সেলে আসাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হল। তার সাহচর্যে থেকে কোরআন হাদীসকে আরও বিস্তৃত জানবার সুযোগ হল। সকালবেলা ফযরের নামাজের পর ১০ সেল ডিভিশনের সকলেই তার সাহচর্য নেবার চেষ্টা করতেন। তফসীর ছাড়াও তিনি ইসলামের বৈপ্লবিক দিক নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার অবতারণা করতেন।

দেলওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেবের নিকট-সাহচর্যে তাঁর সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে একদিন প্রস্তাব করলাম– 'সাঈদী ভাই, আমরা তো বাতিলের সাথে সংঘাতের মুখোমুখি। এ সময় মস্তিষ্ককে সংবেদনশীল রাখলেই শুধু চলবেনা শরীরটাকেও সবল আর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন করা দরকার।' উনি বললেন– 'তাতো ঠিকই। আমি মজলিসি মানুষ হয়ে বিপদ হয়েছে। তাছাড়া সফরে সফরেই আমার সময় কাটে। শরীর দেখব কখন।' আমি বললাম– 'এর মধ্যেই সময় করতে হবে। তা না হলে বাতিল শক্তির কাছে আপনি সহজলভ্য বস্তুতে পরিণত হবেন।' তিনি একমত হলেন। আমি ব্যায়ামের প্রস্তাব দিলে তিনি রাজীও হলেন।

www.pathagar.com

সময় ঠিক হল, বাদ মাগরিব। এই সময় বেছে নেয়ার কারণ, সেলগুলো তালাবদ্ধ হলে নিরিবিলি পরিবেশ পাওয়া যায়। ব্যায়াম অনুশীলন শুরু হল। আমি তো যথারীতি করেই থাকি। সাঈদী ভাই আমাকে অনুসরণ করলেন। পরপর একই নিয়মে চললো কয়দিন। কিন্তু তারপর! তারপর তিনি শয্যাগত। ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। ভীষণভাবে, দারুণ শরীর টাটানি, হাত পা ফুলে একাকার। নড়াচড়া তার জন্য কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। পরদিন সকালে আমার সেলে তার ভক্তদের ভিড়। সবার জিজ্ঞাসা, হুজুরের হলোটা কি? সাঈদী ভাই লা-জবাব। সিপাহসালারের এমন দুরবস্থা সত্যি পীড়াদায়ক। সাঈদী ভাই লজ্জায় কাউকে কিছু বললেন না। শেষে কেউ যদি বলে বসে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি! ব্যায়াম-ট্যায়াম তো উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাদের জন্য! যদিও সেটা সত্যি নয়। সাঈদী ভাইয়ের কষ্ট দেখে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। তার শারীরিক অবস্থা ঠিক হতে সময় লাগল বেশ কয়দিন। এরপর ব্যায়ামের ধারে কাছে যেতে সাঈদী ভাই সাহস করলেন না।

এর আগে মালেক ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় ১০ সেলের সামনে একটি পরিত্যক্ত ঘর জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নামাজের জায়গা হিসেবে চালু করেন। একই সাথে তফসীর ক্লাসের ব্যবস্থা হয়। শুরুতে পালাক্রমে মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, মওলানা মোহাম্মদ মাসুম, মওলানা ইউসুফ তফসীর করতে থাকেন। সেখানেই আমরা প্রত্যেক দিন বিকালে সাঈদী ভাইয়ের তফসীর শোনার আয়োজন করি। ব্যায়াম ঘটিত অসুস্থতার কারণে কয়েকদিন বন্ধ থাকলেও আবার যথারীতি চালু করা হয়। একদিন তফসীর প্রদানকালীন সময়ে অফিস রাইটার এসে মওলানার হাতে তার ছাড়পত্র দিলেন। মওলানা আনন্দের আতিশয্যে আর তফসীর করতে পারলেন না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে গলেন। মুক্ত আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য তার এত তাড়া। চলে গেলেও তিনি আমাকে ভুলেননি। পরে এক সময় আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন।

কারাগারে সাঈদী ভাইকে ঠাট্টাচ্ছলে বলতাম, 'সাঈদী ভাই, কারাবাসের পর তো আপনি আলেমদের মধ্যে শীর্ষে এসে যাচ্ছেন। তখন তো এই অধম কারাসঙ্গীদের কথা আপনার মনেই থাকবে না।' কোন জবাব দিতেন না। শুধু হাসতেন, লাজ বিনম্র হাসি।

পাকিস্তান আমলে আমরা তাকে কেউ জানতাম না। বায়াত্তরের জাহেলিয়াতের অন্ধ তমসায় গোটা দেশ ছেয়ে গেলে দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ইসলামের মশাল হাতে

www.pathagar.com

নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন। বন্দুকের নলের মুখে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে ভাসছিল কেবল মাত্র সাঈদীর ছোট্ট একটি ডিঙ্গা, বৈঠা হাতে তিনি উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে ইসলামের ছোট্ট কিস্তী নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। মিনারে মিনারে আযান দিয়ে সম্মোহিত জাতির চেতনা ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু যখন তন্দ্রার ঘোর থেকে গোটা জাতি জেগে উঠল তখন আর সেই নকীব সাঈদী ময়দানে নেই। কি এক অন্ধ মোহে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছেন। আয়েশী জীবন যাপনের মধ্য দিয়েই তিনি আল্লাহর কাছে নাজাত প্রাপ্তির সহজ পথ সন্ধান করছেন।

জেল থেকে বেরুবার বেশ কিছু পর অষ্টগ্রাম ও বাজিতপুরে ইসলামী সম্মেলনের জন্য দেলওয়ার হোসেন সাঈদীকে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশে আমি ও সাবেক গভর্নর শহীদ মোনায়েম খানের ছেলে কামরুজ্জামান খান (খসরু ভাই) টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাঁর বাসায় উপস্থিত হই। ভেতরে ঢোকার সময় দেখলাম সুন্দর একটা কোরআনের আয়াতের স্টিকার লাগানো। যেসব ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে বিলি করা হয়। আমন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলে আমি সাগ্রহে ইরানের বিপ্লব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জবাবে তিনি বলেছিলেন– 'ইরানের বিপ্লব নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লব। আমি ইরান সফরের সময় ঘুরে ঘুরে দেখেছি। বলতে গেলে ইরানের বিপ্লবকে বাজিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। যে কোন স্থানে বেড়ানোর সুযোগ ইরান আমাকে দিয়েছিল। আমি সর্বস্তরের জনগণের সাথে মিশেছি, তাদের সাথে কথা বলেছি, তাতে মনে হয়েছে, জনগণের অন্তর থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত ইসলাম একটা বিপ্লব সাধন করেছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি যে কোন দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিপ্লবের ছোঁয়া একইভাবে লেগেছে।' সেদিন তাঁর এই উপলব্ধিটা দারুণভাবে ভাল লেগেছিল। ইরান থেকে নিয়ে আসা শতাব্দীর সফল ইসলামী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাঈদী সাহেব ছড়িয়ে দিতে পারতেন। নির্যাতিত মানুষের সিনায় সিনায় ছড়িয়ে দিতে পারতেন নতুন বিপ্লবের ফয়েজ। কোটি কোটি তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মার অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর যথেষ্ট ছিল। দেশের নিগৃহীত নিষ্পেষিত জন-মানুষের ঢল রাজপথে নামাতে পারতেন এই দেলওয়ার হোসেন সাঈদী। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই জাতির; কোন এক নেপথ্য হাওয়ার স্পর্শে বিপ্লবীকণ্ঠ সাঈদীর চোখেই এখন তন্দ্রার ঘোর।

একদিন দেখলাম মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন কারাগারে এলেন। আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের বিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য তার এ কারাবাস। তিনি আমাদের কাছাকাছি ২৬ সেল ডিভিশনে থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুস্তানের কট্টর সমালোচক। প্রাসঙ্গিকভাবে সর্বশেষ মুগল সম্রাট বাহাদুরশাহের গজলের একটি কলি মনে পড়লো– 'সবকুছ লুটাকে হুঁশমে আয়ে তো কিয়া কিয়া– সবকিছু হারিয়ে চেতনা এলে আর কী হবে'? মীরজাফরের সহযোগী মীর কাসিম তার জীবন দিয়েও বাংলার সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবু আহত বিবেক তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীনের মত তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের তূনের তীর বুমেরাং হয়ে তাদের বুকেই এসে বিঁধছে। সেই যন্ত্রণায় অস্থির তারা। কিন্তু তাদের সেই দুঃসাহসিক হাত এখন শূন্য। তাদের দুর্জয় হাতিয়ার এখন কুচক্রীদের অস্ত্রাগারে। মুক্তিযোদ্ধা হয়েও মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন কারাগারের সেল প্রকোষ্ঠে। মওলানা মতিনও জয়নাল আবেদীন সাহেবের পাশাপাশি ২৬ সেল ডিভিশনে অবস্থান করেন। তাদের অপরাধ একই। মীরজাফরের বিরুদ্ধে মীর কাসিমের ভূমিকা নিয়েছেন তারা।

মওলানা মতীন আওয়ামী লীগের কৃত্রিম দেশপ্রেম আর গণসমর্থনের বহর দেখে এক সময় অন্ধমোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তার আশৈশব লালিত চেতনা বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত মুক্তির জন্য নিবেদিত হয়ে ওঠেন। হতে পারে তিনি এটাকে তার আত্ম প্রতিষ্ঠার সহজ পথ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের হত্যাযজ্ঞের রাজনীতি, ব্যাপক দুর্নীতি ও দিল্লী নির্ভর আদিম স্বৈরাচার দেখে তার মোহভঙ্গ হয়। তিনি আবার ফিরে আসেন তার উৎস-মূলে। মেজর জয়নাল আবেদীনের সাথে সীরাত কমিটি গঠন করে নির্বাসিত ইসলামী চেতনাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন কার্যকারণে মোহগ্রস্ত হয়ে অথবা চাপের মুখে কৌশলগত কারণে অথবা হাল্কা চেতনায় বিভিন্ন বলয়ে আবর্তিত হলেও তাকে ঘিরে রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ।

দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর বিদায়ের পর আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও শহীদুল্লাহ কায়সার সংক্রান্ত হত্যা মামলার আসামী জনাব আবদুল খালেক মজুমদারকে আমার সেলে নিয়ে এলাম। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একঘেঁয়ে অলস মুহূর্তগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস হয়তোবা। আবদুল খালেক মজুমদার একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকা সিটি জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল নেতা ছিলেন। একজন দায়িত্বশীল

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব হিসেবে কারাগারে তার আচার আচরণ, তার সন্ত্রস্ত অনুভূতি, তার প্রলুব্ধ চেতনা, তার স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ আমাদের যথেষ্ট আহত করেছে। অন্য কোন সংগঠনের নেতা তেমন কোন ঘটনার অবতারণা করলে আমার মনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না এবং সেটা স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু একটা মৌলবাদী সংগঠনে দীর্ঘ দিন ধরে বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যমূলক জীবনবোধ বিকাশ ঘটানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালু থাকা অবস্থায় তার নেতার অধঃপতিত মানসিকতা দেখে আমার পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক। এটা তাকে খাটো করার জন্য নয়, এই বাস্তবতার নিরিখে তিনি স্বয়ং এবং আরও শত শত নেতা ও কর্মী দিক-নির্দেশনা পাবে। তা না হলে এসব দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখার অর্থ হবে আমি জেনে শুনে একটা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করলাম।

১০ সেল ডিভিশনে আমার সেলে আমার সাথে তিনি থাকতে শুরু করলেন। তফসীর ক্লাস পুনরায় চালু হল। আমার খুব ভাল লাগছিল একজন আলেমকে আমার সাথে পেয়ে। তিনি আমার সাথে ১০ সেল ডিভিশন থাকলেও তার অফিসিয়াল যোগসূত্র তৃতীয় শ্রেণীর সাথে রয়ে যায়। কয়েদী অবস্থায় তিনি বড় চৌকার ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষিত মানুষ বলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্ব অর্পন করেন। একদিন দেখলাম ১০ সেল ডিভিশনের ২০ জনের জন্য রান্না করার ২০টা মাছের মাথা নিয়ে একজন মেট হাজির। জিজ্ঞেস করলাম– 'কে পাঠিয়েছে?' জবাব পেলাম– 'ম্যানেজার সাহেব।' এতে আমার ডিভিশনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হল। আমার মোটেও ভাল লাগেনি। তৃতীয় শ্রেণীতে এমনিতেই খাদ্য সংকট, তরিতরকারী মাছ-মাংসের দারুণ অভাব। তাদের বঞ্চিত রেখে খালেক ভাই কোন্ মানবিক তাগাদায় ২০টি মাছের মাথা আমাদের সেল ডিভিশনে পাঠালেন বুঝলামনা। তাও যদি এখানে তেমন খাদ্য সংকট থাকত তাহলে সেটা মেনে নেয়া যেত। অনেকে আবার টিপ্পনি কাটলেন, 'এরা আবার ইনসাফ কায়েম করবে?' এরা মানে তো আমরা। আমিও তো জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কথাটা আমার অসহ্য মনে হল। লজ্জিত হলাম। ইকবালের সেই বাণী মনে হল– 'যদি মজদুরের হস্তগত হয় কর্মের কর্তৃত্ব তাহলে পাথর কাটার মধ্যে প্রকাশ পাবে আদিম স্বৈরাচার।' তাকে আমি সাধারণ শ্রেণীর মনে করতাম না বলে দুঃখ পেলাম বেশী। শুধু সস্তা বাহবা নেয়ার জন্য তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করেছেন।

রাত্রে ঘুমাতে এলেন। তার উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। চুপ করে

www.pathagar.com

অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমরা যে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করা উপহার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি এটা তিনি টের পেয়েছেন। প্রসঙ্গ আমি তুললাম। বললাম– 'আপনার বিবেক বলে তো একটা কিছু থাকা উচিত। থাকা উচিত আপনার দূরদর্শিতা এখানে প্রত্যেকটা মানুষ সংবেদনশীল। আপনার প্রতি এখানকার সকলের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এক নিমিষে সেটা ধ্বংস করে দিলেন। আপনার এ হাল্কা চেতনাবোধ আন্দোলনের ওপর কত বড় আঘাত করে, আপনার এটা বোঝা উচিত ছিল। অথচ সংগঠনের সব মানুষই এমন নয়। কত হাজার হাজার মানুষ দৃষ্টির আড়ালে কত বড় বড় কোরবানী দিচ্ছে। তাদের কৃতিত্ব আর কোরবানীগুলো হয়তো ভেসে উঠবেনা। কিন্তু আপনাদের এই ত্রুটিগুলো দুর্গন্ধ হয়ে ভেসে বেড়াবে।' আর বললাম, 'যা কিছু করবেন একটু ভেবে চিন্তে করবেন। আপনাদের উপদেশ দেয়া তো সাজেনা।'

পাবনা আটঘরিয়ার মওলানা বেলাল আমাদের সংগঠনেরই একজন। তিনি একাত্তরের তথাকথিত চেতনার শিকার। প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন তিনিও। ১০ সেল ডিভিশনের এক কোণে আমার সাক্ষাতে আবদুল খালেক মজুমদারের উদ্দেশে রাগতভাবে বললেন, 'আপনি সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় লোক হয়ে কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে কি করে টাকা নিলেন? ঐ টাকা কি আপনাকে তারা বকশিশ দিয়েছে? এতে কি সাধারণ কয়েদীদেরকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছেনা? আপনি বলুন, হলপ করে বলুন যে, কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে আপনি টাকা নেননি?' আবদুল খালেক মজুমদারকে নীরব থাকতে দেখেছি। দেখেছি রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতে। আবারও আমি খালেক ভাইকে সংগঠনের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সংযত হতে বললাম। প্রতিবাদী কণ্ঠে বেলাল ভাইকে বললাম, 'এ নিয়ে আর এগুবেন না।'

আমি জানিনা তার পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট তাকে এত নীচু হতে বাধ্য করেছিল কিনা। যে একটা ঝড়, যে একটা অর্থনৈতিক-সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছিল দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে তাতে এর চেয়ে নীচু স্তরেও যদি কোন মানুষ নেমে থাকে তাহলে কতটুকু সে দায়ী হবে? তবে এসব কর্মকাণ্ড যে সংগঠনের ওপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এটুকু বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সবচাইতে বেশী আমি ঘৃণা করতাম তার কাপুরুষোচিত অভিব্যক্তি। আমি মনে করি একজন মুসলমান জীবনের সংকটে অথবা কোন দুর্বল মুহূর্তে অনেক কিছু

www.pathagar.com

করতে পারে কিন্তু বুজদীল হতে পারে না। যখন কেউ মনে করবে পুরস্কার ও শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ এবং কিসমত যখন নির্ধারিত হয় উপরে, জিন্দেগীর ফায়সালা যখন আসে লওহে মাহফুজ থেকে তখন একজন ঈমানদার মুনাফেক ও কাফেরদের পদচারণায় ভীতসন্ত্রস্ত হবে কেন? অথচ তাকে দেখেছি কারাগারের নিভৃত কোণেও তটস্থ থাকতে। হতে পারে আগে যে অমানুষিক জুলুম আর অত্যাচার তার ওপর হয়েছে তা থেকেই তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই ভীতি।

কারাগারে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। তাদের সাথে আমার বিরোধ শুধুমাত্র আদর্শগত। আমি জেলখানায় দাওয়াতী ও তরবিয়াতী প্রোগ্রাম বলতে গেলে ভালমত চালু করেছি। খালেক ভাইয়ের উচিত ছিল আমার পাশে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো। অথচ আমি তাকে তেমনভাবে পাইনি। বরং আমার আবেগ আর অনুভূতিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন– কারাগারে আমার অবস্থান থেকে একটু পিছু হটে আসতে। একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে কারাগারে কিভাবে তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন। একদিন আমি তিন রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলছি। বলছিলাম– আওয়ামী লীগ আমাকে টার্গেট করে তাদের ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। ডিআইজি পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এতে শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় ডিআইজি হয়তো এখান থকে আমাকে অন্য কোন জেলে পাঠিয়ে দিবেন। যেটা আওয়ামী লীগ চায়। এমনটি হলে তারা সফল হবে। আমরা হব ব্যর্থ। আমাদের মিশনও হবে ব্যর্থ। আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। 'আপনি তো আমাদের নেতৃস্থানীয়। বাইরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় কিনা?' তিনি কি বলতেন জানিনা। দূর থেকে শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে দেখে আড়ালে সরে গেলেন। বুঝলাম ভীতি তাকে পেয়ে বসেছে। আমাদের সাথে তার কোন যোগাযোগ রয়েছে অথবা আমাদের জন্য কোন অনুভূতি রয়েছে এমনটি প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়ুক তিনি তা চাইতেন না।

রুহুল আমিন ভূঁইয়া চলে যাওয়ার পর তিনি আবার এলেন। আমি তাকে বললাম– 'প্রাচীরের আড়াল হয়ে কি পরিচয় লুকাতে পারবেন? আমাদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে তাদের সহানুভূতি পাবেন? সহানুভূতি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকলে মিথ্যে মামলায় আপনাকে ওরা জড়াতো না। নেতার এমন আচরণের প্রকাশ ঘটলে কর্মীরা তো দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্তত আপনার কাছে আমি এমনটা আশা করিনা। কাপুরুষতা আর বুজদিলীর নাম হিকমত নয়।' তিনি লা-জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে মেজর (অবঃ) জয়নাল আবেদীন সাহেব একটি বই লেখায় হাত দিয়েছেন। তিনি মনে করলেন আবদুল খালেক মজুমদার তার সহযোগী হলে তার কাজে সুবিধা হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমার কাছ থেকে খালেক সাহেবকে তার নিজের সান্নিধ্যে টেনে নিলেন। আলবদরের ডেরা থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে খালেক ভাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আবুবকর সিদ্দিকের জন্য আমার দুঃখ হত সবচেয়ে বেশী। পনের ষোল বছর বয়সের উঠতি তরুণ। কৈশোর পেরিয়ে কেবলি যৌবনে পদার্পণ করেছে। জীবন নিয়ে সূক্ষ্ম স্বপ্ন দেখারও সময় মেলেনি তার। সিদ্দিক ছিল বাগিচার এক প্রান্তে ফোটা যেন একটা ফুল। দল মেলার সাথে সাথে উত্তপ্ত বাতাস এসে পাঁপড়িগুলো ঝলসে দিল। সে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল এমন নয়। নেতৃত্বের ভিতকে মজবুত করার জন্যও তার সংগ্রাম ছিলনা। ঐশ্বর্যের প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য রক্ত-পিছল পথে পা বাড়িয়েছিল– এ কথাও বলা যাবেনা। তার সংগ্রামী ও সংঘাতময় জীবনের পশ্চাতে রয়েছে মহান জাতীয় প্রেরণা। পাকিস্তানের অস্তিত্বের ওপরই নির্ভর করছে উপমহাদেশের মুসলমানদের ইজ্জত ও আযাদী, এই ছিল তার বিশ্বাস। সিদ্দিক কিছুতেই হিন্দু মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত সমকালীন চেতনার প্রবহমান ধারায় অবগাহন করতে চায়নি হাজার বছরের বৈরিতা যাদের সাথে, মুসলমানদের রক্তে যাদের হাত রাঙা তাদের আশ্রয় শিবিরে যেতে চায়নি সিদ্দিক। বরং হিন্দুস্তানী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল হাতে। নেহায়েত দেশ-প্রেম ও জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য হারাতে হল তার মা ও বোনকে। বাংলাদেশ হওয়ার পর মুক্তিফৌজ তার ঘরে হানা দেয়। তাকে না পেয়ে তার মা ও বোনকে গুলী করে হত্যা করে। পরবর্তীতে কতিপয় মুক্তিফৌজের হাতে ধরা পড়ে সে। ছোট অল্প বয়সী সিদ্দিকের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

কারাগারে থাকাকালীন সবাই সিদ্দিককে আদর করত। সবারই ছোট ভাই যেন ও। তার আব্বা প্রথম দিকে কারাগারে তার সাথে দেখা করার জন্য নিয়মিত এলেও নতুন করে বিয়ে করার পর আর তেমন আসত না।

সিদ্দিকের সকরুণ চাহনি আমাকে দারুণভাবে বিব্রত করত। তার হাসির আড়ালে অন্তহীন বেদনা রয়েছে বোঝা যেত স্পষ্টই। দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় সিদ্দিকের

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। এই স্বল্প বয়সী তরুণ, স্বাভাবিকভাবেও যার এমন কারাভোগের কথা নয়, তাকে ৭টি বছর কারা প্রকোষ্ঠে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়। আটাত্তর সালে সিদ্দিক মুক্তি লাভ করে। এমনিভাবে কত শত দেশপ্রেমিক সিদ্দিক গুলীতে নিহত হয়েছে অথবা কারাপ্রকোষ্ঠে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছে তার হিসেব এখনো বের হয়নি।

তিন

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন খারাবী সংঘটিত হয়েছে। একই সময়ে ৭টি খুন। সেই হত্যা মামলার আসামী হয়ে আসলেন শফিউল আলম প্রধান। তিনি মুসলিম লীগ নেতা ডেপুটি স্পিকার গমির উদ্দিন প্রধানের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি খুন সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ তার সাথে হয়েছে। তা থেকে যতটুকু মনে হয়েছে, কোন এক নেপথ্য ইঙ্গিতে ছাত্রলীগে ভাঙনের ছোঁয়া লাগে। ক্রমে একের ভেতরে দুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটিতে প্রকাশ্য শেখ মণির মদদ। অন্যটির গাইডেন্স আসে অন্যতম আওয়ামী নেতা তোফায়েলের টেবিল থেকে। শেখ মণির মদদপুষ্টরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নয়, সমস্ত শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাদের হিংস্র নখর থেকে কোন ছাত্র এমন কি মেয়েরাও নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনা। কিন্তু তবু তাদের কর্মকাণ্ড নির্বিরোধ হতে পারছেনা। কারণ অন্য গ্রুপটির নেতৃত্বে রয়েছেন শফিউল আলম প্রধান। তার অবস্থান একেবারে হাওয়ার ওপর, তাও নয়। প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি তার গ্রুপ নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে শেখ মুজিব পর্যন্ত অভিযোগ পৌঁছে। কিন্তু শেখ মণির প্রভাব তখন এত তীব্র যে তা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব ও তার প্রশাসন সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মণি-সমর্থক ছাত্রলীগের মস্তানদের দুঃসাহস, ঔদ্ধত্য আরও ভয়ঙ্কর ও সীমাহীন হয়ে ওঠে। তারা প্রতিপক্ষ প্রধান গ্রুপের উপর মরণ-ছোবল দেবার নীলনক্সা তৈরী করে। কিন্তু কুদরতের ফায়সালা ভিন্ন রকম। মণি গ্রুপের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে ৭টা লাশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে লুটিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

কারাগারে আমার সাথে প্রধান ভাইয়ের সম্পর্ক অল্প কয়দিনের মধ্যে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। তার ভারত বিরোধী চেতনা আমাদের মতই মজবুত। মনের প্রসারতা ছিল ব্যাপক। পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও ছিল তার পদচারণা। তিনি ইসলামের উপর লেখাপড়া করেছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের লেখার দারুণ ভক্ত। কারাগারে তার অফুরন্ত অবসরে মওলানা মওদূদীর সাহিত্যের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত হন। প্রায় এক ডজন সহযোগী তারই মত মন-মানসিকতা সম্পন্ন। যদিও তখন পর্যন্ত তাদের মাথা থেকে অঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের প্রতিমা পুরোপুরি অপসারিত হয়নি। তবু বলব, এরা ভাগ্যাহত জাতির সম্পদ।

অলি আহাদ হিন্দুস্তান বিরোধী একটি বলিষ্ঠ বিবেক, একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি সোচ্চার কণ্ঠ। এক পর্যায়ে তাকেও পেলাম আমরা। সিনেমার পর্দার মত যেন একে একে অনেক নায়ক মহানায়ক আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। আমি যেন কালের সাক্ষী হয়ে সবকিছু অবলোকন করছি। দিল্লী হনুজ দূরাস্ত। চল্লিশ বছর অনেক দূর। এক বিবর্তনশীল ইতিহাসের দ্রষ্টা হিসেবে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেও আমার ভাল লাগছে।

এনএসএফ নেতা সৈয়দ নেসার নোমানীর সাথে অলি আহাদ ভাইয়ের আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নোমানী আমাকে নিয়ে গেলেন অলি আহাদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। আমার অতীত ইতিবৃত্ত টেনে আনার প্রসঙ্গে আহাদ ভাইকে অনেক কিছু বললেন। আরও বললেন, 'রুশ-ভারত বিরোধী আন্দোলন যদি সত্যি আপনারা করেন, যদি ভারতীয় আগ্রাসন রুখতে চান, তাহলে আমিন ভাইয়ের মত হাজার হাজার নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কর্মীর প্রয়োজন হবে। আর এরা হচ্ছে যাঁচাই করা নির্ভেজাল। ইতিহাসের গতিধারায় পরীক্ষিত। হিন্দুস্তানের নুন খাওয়া মানুষদের নিয়ে আন্দোলন করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু হিন্দুস্তানী আগ্রাসন প্রতিরোধ করার মত শক্তিশালী ব্যূহ রচনা করতে পারবেন না।' নোমানী অলি আহাদ ভাইকে গভীর সখ্যতার দাবি নিয়ে আরও বললেন– 'কারাগার থেকে বেরিয়ে যেসব শক্তি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মাথা কুটছে তাদেরকে বের করার দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতে হবে আপনাকে।'

অলি আহাদ ভাই মুখ খুললেন, তার ছোট্ট একটা জবাব– 'ভেতর বাইরের পার্থক্য খুব একটা বেশী নেই নোমানী। তবু তোমার কথা মনে থাকবে।'

অলি আহাদ ভাই এক পর্যায়ে আমাকে ন্যাপ নেতা জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়ার

www.pathagar.com

সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনিও ২৬ সেলে অবস্থান করছেন। শেখ মুজিব এবং হিন্দুস্তান বিরোধী ভূমিকা নেয়ার জন্য তাঁরও ঐ একই কারাবাস।

তখন যাদু মিয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল বারান্দায় বসে ছিলেন। পাশে এক বাটি চা, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছেন! হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি আমাকে সিগারেট দিয়ে আপ্যায়ন করতে চাইলেন। আমি ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কেননা আমি তাতে অভ্যস্ত নই। মনে মনে ভাবলাম জাতীয় নেতারা তাদের অবচেতনে এমনি করে নিজেরা বিষ খান এবং গোটা জাতিকে বিষ গিলিয়ে থাকেন।

মশিউর রহমান তার স্বভাবসুলভ আচরণে আমার প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বললেন– 'তোমাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। বাতাস উল্টো বইছে। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে নামব। ঐ জালেম মুজিবের তখতে তাউস ভেঙে আমরা খান খান করে দেব। এদেশের মাটিতে হিন্দুস্তানের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তোমরা দেখে নিও। কারাগার থেকে বেরিয়ে যে অরাজক রাজ্যে যাবে, সেটা কারাগার থেকেও ভয়ঙ্কর। নির্বিচার হত্যা, জুলুম, রাহাজানি দিয়ে দেশপ্রেমিক যুবশক্তিকে ধ্বংস করে দিল বদমায়েশটা। সংগ্রাম থেমে থাকবেনা, জুলুমের মধ্যেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। তোমরা বেরিয়ে আগ্রাসনমুক্ত এদেশের আলো বাতাসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে। মুজিব তার নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে গেছে।' তার আশা এবং আশ্বাসে জাতীয় জীবনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে যেন একটুখানি আলোর রশ্মি দেখলাম। মনে মনে দোয়া করলাম– 'আল্লাহ, তাঁর উক্তিগুলো সত্যে পরিণত হোক।'

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাসদের আসম রব ও মেজর জলিলকে দূর থেকে দেখতাম, কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন অবরোধের ঘটনায় তারা জেলে আসেন।

জাসদের ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারে নিস্পৃহ। যদিও সাংগঠনিকভাবে মুজিব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপক প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছিল তাদের কার্যকলাপে। কিন্তু তবু যেন সংগঠনটিকে রুশ-ভারত অক্ষশক্তির সেকেন্ড লাইন বলে আমার মনে হত। অনেক বুদ্ধিজীবীই জাসদ সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করতেন। অনেকেই মনে করতেন ভারত বিরোধী এবং মুজিব বিরোধী সংগ্রামী যুবশক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য জাসদের আন্দোলন ছিল ভারতের নেপথ্য প্রয়াস। এই ভারতীয় নীলনক্সার সুপরিকল্পিত ফাঁদে পা দিলেন মেজর জলিল সম্ভবত তার অজান্তে। একই ছিদ্রে দুই বার হাত রাখলেন তিনি। তার দেশপ্রেম ও সদিচ্ছার প্রতি আমার সন্দেহ নেই। ভারতীয় শোষণ ও বাংলাদেশী সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠনের

www.pathagar.com

ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও সক্রিয় প্রতিরোধকারী। এর জন্য আমার শ্রদ্ধাও তার প্রতি যথেষ্ট ছিল।

জাসদের কর্মধারায় একীভূত হওয়ার কারণে তার সদিচ্ছা এবং সংগ্রামী চেতনা অপশক্তির শিকারে পরিণত হয়। তাকে অনুসরণ করে দেশের অগণিত যুবকের শক্তি ও সামর্থ্য 'কনশাস ক্রিমিনাল' সিরাজুল আলম খানের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বেদীতে অসহায়ের মত বলি হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ এবং আদর্শ বিরোধী অভীষ্ট অর্জনের জন্য জাসদের নেপথ্য নায়কেরা এবং আসম আবদুর রব স্বয়ং দেশপ্রেমিক মেজর জলিলের ভারত বিরোধী ইমেজ চাতুরীর সাথে ব্যবহার করেছেন। এই সরলতা এবং দুর্বলতার জন্য মেজর জলিলের প্রতি সেদিনও আমার ছিল অনেক বেদনা মিশ্রিত চাপা ক্ষোভ। এ কারণে তার সাথে আলাপের ইচ্ছে হতো না।

সময়ের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে মেজর জলিল আজ একটি নতুন পথ পেয়েছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মেজর জলিলের আজকের এই নতুন পরিক্রমা সঠিক সন্দেহ নেই। কিন্তু বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে। প্রবহমান সময়ের গতিধারায় তার সেই শক্তি, সেই হিম্মত আজো কি তার মধ্যে রয়েছে? হয়তো বা নাই, তবু দুঃসাহসিক সিন্দাবাদ মেজর জলিলকে আমি কবি ফররুখের ভাষায় বলব ঃ

'আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।'

আসম আবদুর রবের সদম্ভ অভিব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করতাম একাত্তরের আগে থেকে। মালেক হত্যার নেপথ্যেও তিনি ছিলেন। আদিম স্বৈর মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ তার প্রতিটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন তিনি বলেন, 'আমি মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমিই আবার প্রত্যাহার করে নিলাম।' এ যেন ছেলের হাতের মোয়া।

এদেশের সচেতন যুব-শক্তি আগামী দিন জাতির জন্য কল্যাণ আনতে পারত। কিন্তু এই আসম আবদুর রব তাদেরকে বিপথগামী করে অপঘাতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ঘাড়ে পা রেখে নিরাপদ

www.pathagar.com

আখের গুছিয়ে নেয়। কর্মীরা পরিণত হয় হত্যাকারী আর লুটেরাতে। একই আন্দোলনের নেতা হয়ে মেজর জলিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপন্ন, আর আসম আবদুর রব একজন পুঁজিপতি। এ কারণেই তেলে-জলে মিশ খায়নি।

রবের ওপর আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল সেদিন, যেদিন কারাগারের শিক্ষক মতিউর রহমান একটা ছোট্ট ঘটনা বলতে কেঁদে ফেলেন।

কারাগারে আসম আবদুর রব আইন বিষয়ে পরীক্ষা দেন। টেবিলে প্রকাশ্যে বই রেখে পরীক্ষার খাতায় লিখছিলেন। মতিউর রহমান সাহেব ছিলেন ইনভিজিলেটর। তিনি বললেন, 'রব সাহেব একটু রয়ে-সয়ে আমাদের বাঁচিয়ে যা হয় করুন।' শিক্ষক মতিউর রহমান সাহেবের এই আবেদনটুকু রব সাহেব বরদাস্ত করতে পারেনি। বই ছুড়ে মতিউর রহমান সাহেবকে মেরেছিলেন এবং যা তা বলে ঘাড় ধরে রুম থেকে বের করে দেন। এই ঘটনার পর তার ওপর আমার কোন ভাল ধারণা আর অবশিষ্ট রইল না। তাছাড়া কারাগারেই সৈয়দ নেসার নোমানীর কাছে শুনেছিলাম এই রবেরাই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান এবং ইসলামের অন্যতম দিশারী মৌলবী ফরিদ আহমদকে নৃশংস এবং পৈশাচিকভাবে হত্যা করে।

১০ সেল ডিভিশনে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালাক্রমে ডিভিশন প্রিজনারদের পরিচালনা করতে হতো। এবারের পালা আমার। একদিন সুবাদার এসে সংবাদ দিলেন, চার জন নেতা এসেছেন। জানলাম খাজা খয়ের উদ্দিন, সবুর খান, এডভোকেট শফীকুর রহমান, এডভোকেট ইউসুফ চৌধুরী, মুজিবী দুঃশাসনে এদের দ্বিতীয় দফা কারাবাস। দেখলাম সুবাদার দারুণ খুশী। আনন্দের আতিশয্যে বলে চলেছে– 'বঙ্গবন্ধু দালালদের রেহাই দিলেও তারা কিন্তু চুপচাপ ছিলনা। ষড়যন্ত্র করছিল। ষড়যন্ত্র করবি, কর এবার। বোঝ, মজাটা। বঙ্গবন্ধুর চোখ কঠিন চোখ। ফাঁকি দেয়া এত সহজ? শালা, সময় মত হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।' আমি একটু রেগেই বললাম– 'আর কিছু বলার আছে?' প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বললেন– 'আমিন সাহেব, জেলার সাহেব বলে দিলেন– এখান থেকেই আপনার নেতাদের খাবার দিতে হবে।' বললাম– 'ঠিক আছে হবে।' রাজী হলাম আমি। খাবার তৈরী ছিল। একজন ফালতুকে ডেকে চার জনের প্রয়োজনীয় খাবার পাঠিয়ে দিলাম। একটু পরে আমিও হাজির হলাম। নেতাদের মুখ দেখে যদি বাতাসের ভাব বোঝা যায়, এই আশা নিয়ে তাদের সবার সাথে আলাপ হল। আমাকে আন্তরিকভাবে সানন্দে গ্রহণ করলেন তারা। একান্ত আপন জন মনে হল। সবুর খান তার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

www.pathagar.com

করে একটা বড়সড় কলা এনে দিলেন। প্রত্যেকেই মুরুব্বীর মত অনেক উপদেশ, অনেক সান্ত্বনা দিয়ে আমার মন-মানসতাজা রাখার চেষ্টা করলেন। তাদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আমার দারুণ ভাল লাগল। পিতা ও সন্তানের যেমন একটা আত্মার যোগ তেমনই অনুভব করলাম এদের পেয়ে। হাল্কা বালসুলভ কোন কথা নেই, অবকাশ নেই বাচালতার। কথা হচ্ছে, আলাপ আলোচনা ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বহীন কোনটিই নয়। তারা বললেন, "তথাকথিত দালাল আইনের আওতামুক্ত হয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে ভাগ্যহত এই জাতিকে দুর্বিপাক থেকে টেনে তোলার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। একাত্তরের পটভূমিতে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র আর প্রচারণার তোড়ে অবলুপ্ত জাতির বিবেক ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে এসেছে। এ সময় শুধু প্রয়োজন নির্ভীক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর সময়োচিত সঠিক পরিকল্পনা। আমরা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই আসতে হলো কারাগারে।'

খাজা খয়ের উদ্দিন বললেন– 'আমি এই দেশ, এই বাংলার মাটিতে আর নয়। আমাকে শূন্য হাতে যেতে হলেও কারামুক্তির পর এদেশ থেকে হিজরত করব। এদেশ আর সেই দেশ নেই। মুর্শিদাবাদ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের দেশপ্রেমিক সম্মানী ব্যক্তিত্বগুলো যেমন মুনাফেক গাদ্দারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনি দুশো বছর পর আজ আবার এদেশের হাওয়ায় মুর্শিদাবাদের গন্ধ।'

বললাম, 'আপনারা আমাদের নেতা। গোটা জাতিকে হিংস্র হায়েনার মুখে রেখে আপনি দেশ ছাড়বেন কি করে?'

খাজা সাহেব বললেন, 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নিম্নতম মর্যাদাকেও যেখানে স্বীকার করা হয় না, সেখানে কোন বিবেকবান মানুষ থাকতে পারেন না, আমিন। এই দেখনা, রক্ষীবাহিনী আমার বাড়ীতে চড়াও হলে আমি বেরিয়ে এলাম। গায়ে আমার গেঞ্জী। আমাকে একটা কথাও বলতে দেয়া হলনা। বেগম সাহেবা আমার জামা আনলেন, সেটি পর্যন্ত গায়ে দিতে দিলনা। এ ছাড়াও ওদের অশ্রাব্য অশালীন আচরণ আমাকে দারুণভাবে আহত করেছে।' তিনি আরও বললেন– 'এ জাতির সৌভাগ্য ফিরে আসবে কিনা জানিনা তবে এদেশের মানুষকে যুগ যুগ ধরে তাদের ভুলের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।' তিনি অবশ্যি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে, 'আমাকে এক সময় তোমার কেস নাম্বারটা দিয়ে দিও। আমি জেল থেকে বেরিয়ে তোমার এবং আমাদের আর যারা আছেন তাদের জন্য চেষ্টা করব।'

www.pathagar.com

এক সময় এডভোকেট শফিকুর রহমান বললেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জান? শেখ মুজিব আমাদের চেয়ে বেশী অসহায়। তার ইচ্ছা সদিচ্ছা যাই থাকনা কেন, তার করার কিছু নেই। হিন্দুস্তানী চক্রের কাছে তার হাত-পা বাঁধা। তার চারপাশে রুশ-ভারত চক্র এমন ব্যুহ রচনা করে রেখেছে যে তা থেকে তিনি বরিয়ে আসার চেষ্টা করলে তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সন্ত্রাস আর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে কোন শাসক না চায়? কিন্তু চাইলেই সেটা করা সম্ভব নয়। এটা করলে মুজিব যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা ধসে পড়বে। আর সেও নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সেনাবাহিনী ময়দানে নামিয়ে সে চেষ্টাও তো করেছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হয়। এর চেয়ে বড় কথা হিন্দুস্তান বাংলাদেশকে এক অরাজক পরিস্থিতির দিকে টেনে আনতে চাচ্ছে এবং সেটা সুপরিকল্পিতভাবে। হিন্দুস্তানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও বাংলাদেশকে দৈন্য, দুর্দুশা ও অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। রুশ-ভারত চক্র থেকে দেশটাকে মুক্ত করা মুজিবের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আস্ফালন, তর্জন গর্জন এবং গালভরা বক্তব্য যা কিছুই করুক না কেন ইন্দিরার চোখের দিকে চোখ রেখেই সেটা করতে হয়। বলতে গেলে মুজিব একটা রোবট, এর রিমোট কন্ট্রোল ইন্দিরার হাতে।'

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পরিক্রম করা এই চারজন নেতার সাথে আলাপ আলোচনার সময় আর একজন জনপ্রিয় নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর কথা মনে পড়ছিল বার বার। জাতির এমন ক্লান্তিলগ্নে তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। দুর্ভাগ্য আমার যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এমন সময় স্থানান্তরিত হলাম যখন তিনি পরপারে। তাকে দেখার এবং তার সাথে আলাপ আলোচনার সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল।

চট্টগ্রামের শার্দুল ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠে রেখেও হিন্দুস্তানের শিখণ্ডী মুজিব তার আসনকে নিরাপদ ভাবতে পারেনি। সম্মোহিত বাংলার মুসলমানদের চেতনা ফিরে আসাতে এবং হিন্দুস্তান বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করলে হিন্দুস্তান আর এক নীলনক্সা বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি ছিল ভারত বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসমূহকে দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া। আমার ধারণায় এ ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার হলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তার অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যা হিন্দুস্তানী নেতাদের স্মৃতিতে আঁকা

www.pathagar.com

ছিল। এ ছাড়াও গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর নথিপত্রের সমকালীন রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দুস্তান বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে ছিলেন তিনি শীর্ষে।

তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ফেডারেশনের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। বৃটিশ এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে বৃটিশ ভারতের মুসলিম তরুণদের সুসংগঠিত করতে সক্ষম হন। সে সময় সোহরাবর্দীর নির্দেশে চট্টগ্রামে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে মুসলমানদের একক একটি প্লাটফরমে টেনে আনতে সক্ষম হন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে চট্টগ্রামে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় তার সাংগঠনিক দক্ষতারই ফসল।

'৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। '৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি আদমজী জুট মিল শ্রমিক ও জাহাজ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেন। পূর্ব পশ্চিম বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। কিন্তু এর জন্য হিন্দুস্তানের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে হবে এমন ধারণার বিরুদ্ধেও ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

আমি কারাগারে এসে যতটুকু জেনেছি– ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠের শ্বাস-রুদ্ধকর পরিবেশে থেকেও তিনি এদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ব্যাপারে ছিলেন দারুণ আশাবাদী। তাজউদ্দিন গংরা কারা পরিদর্শনে এলে তিনি নাকি তাকে বলেছিলেন, 'সেলগুলোকে বড় কর তাজুদ্দিন। আমাদেরকে তোমরা ধরে রাখতে পারবেনা। আমাদের বেরুনোর সময় এসে গেছে। কারাগারের ভেতরে আসতে তোমাদেরও বেশী দেরী নেই। এখন থেকে কারাগারগুলো সংস্কার করে ফেল।' চৌধুরী সাহেব আরো নাকি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন– 'তোমাদের মুজিব তো এদেশকে সোনার বাংলা বানিয়ে ফেলছে। মুজিবকে বলো, আমার জন্য অন্তত সাড়ে ৩ হাত মাটি যেন মাটিই রাখে।'

প্রত্যেক দিন সকাল বেলা চৌধুরী সাহেব দরাজ গলায় কোরআনের তেলাওয়াত করতেন। বিভিন্নভাবে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখে তিনি ভারত বিরোধী কারাবাসী মজলুমদের বিপন্ন মানসিকতাকে চাঙা রাখতেন।

এই শার্দুল নেতার কণ্ঠরোধ করার জন্য সম্ভবত হিন্দুস্তানের কালো হাত কারা প্রাচীর আর লোহার গরাদ ভেদ করে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কারাগারের

www.pathagar.com

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি যতটুকু জেনেছি– এক কম্পাউন্ডার দ্বারা জনাব চৌধুরীর দেহে সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়ার ফলে ফজলুল কাদের চৌধুরী, মুসলিম বাংলার এক বিশাল ব্যক্তিত্ব শাহাদাতবরণ করেন। তার সমস্ত শরীর নাকি নীল হয়ে গিয়েছিল।

মুজিব প্রশাসন পরবর্তীতে সেই কম্পাউন্ডারকে সরকারী খরচে তার সচেতন গুনাহ মাফের জন্য হজ্জে প্রেরণ করে।

ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল এমন ধারণা বহুল প্রচারিত। মুজিব-পরবর্তী সরকারসমূহের উচিত ছিল, এর একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করা। কিন্তু 'বরবাদে গুলিস্তাঁ করনে কো একই উল্লুক কাফী হ্যায়, হার শাখ পর উল্লুক বাইঠা হ্যায়, আঞ্জামে গুলিস্তাঁ কেয়া হোগা।' সংবেদনশীল সচেতন বিবেক কি এখন একটিও অবশিষ্ট আছে? নেই। আছে কেবলমাত্র অন্ধ উন্মাদনা। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সবার যেন একই অবস্থা। এ কারণেই কোনদিন এসব রহস্যের জট খুলবে না।

কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কখনো কখনো নৈরাজ্য আমাদের ঘিরে ধরতো। বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কত বিচিত্র খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। মুজিবের ব্যাপারে রুশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে এবং হিন্দুস্তান বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আমরা সমগ্র জাতির সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাইনা। ভয়ঙ্কর হতাশা ও অন্তহীন নৈরাজ্য যখন পেয়ে বসে, তখন কারাগারের একটি মাত্র মানুষ আমাদের কানে কানে ভোরের পাখীর মত যে গান শোনাতেন সেটা সূর্য উঠার গান, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের আশ্বাস। তার পিতা বাঙ্গালী নন। কিন্তু তিনি এদেশে জন্মেছেন। বাংলার অস্থি-মজ্জার সাথে মিশে তিনি একাকার। এদেশের জলবায়ু আকাশ আর মাটিকে তার আত্মার সাথে একিভূত করে ফেলেছেন। তিনি ইশ্বরদীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জনাব আবদুল মজিদ খান। এ দেশের জন্য তার গভীর ভালবাসা, অন্তহীন মমত্ববোধ। ইচ্ছে করলেই তিনি পাকিস্তান যেতে পারতেন। কিন্তু সে চেষ্টা তিনি আদৌ করেননি। তাঁর ভাষায়, 'আমি এদেশ, এ মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে নারাজ। এ দেশের কোটি কোটি মানুষের তকদীরে যা লেখা আছে আমার নসীবে তাই ঘটবে, এখান থেকে পালিয়ে আমি বাঁচতে চাই না।'

www.pathagar.com

মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ইশ্বরদীর পাকসীতে আওয়ামী লীগ যে ভয়াবহ অবাঙালী হত্যাযজ্ঞের উৎসব করেছে এবং শত শত মানুষকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে, এর প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং অবাঙালীদের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এককভাবে এই মজিদ খান রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অগণিত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তবু তিনি এই অন্ধ প্রকোষ্ঠে। হিন্দুদের হীন মানসিকতার শিকার হয়ে তাদেরকে ইউপি থেকে বাংলায় আসতে হয় ঈমানকে নিরাপদ রাখার জন্য। অথচ এখানেও তাদের অর্জিত সম্পদ গ্রাস করার জন্য আওয়ামী লীগারদের চক্রান্তে এখন তার ঠিকানা কারাগার। তিনি আমাদের বলতেন একটা পরিবর্তন আসন্ন। নৈরাশ্যের কিছু নেই। বসন্ত আসার আগে যেমন মৌমাছিদের মধ্যে দেখা যায় উল্লাস। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তারা যেন আসন্ন বসন্তের গন্ধ পায়; শুনতে পায় দখিনা হাওয়ার পদধ্বনি; মজিদ ভাই তার অবচেতন মনে ঠিক তেমনি পালাবদলের সংকেত পেয়েছিলেন। তা না হলে তাঁকে কারাগারে এমন নিরুদ্বিগ্ন দেখতামনা। দুশ্চিন্তা ছিলনা মোটেও। যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত ছিলেন, রাজনৈতিক কার্যকারণে সামাজিক অবস্থানও ছিল তার পর্যুদস্ত।

খোদার ইচ্ছার সাথে কোন বিপন্ন আত্মার যোগ হলেই সম্ভবত মানুষ এমন নিরুদ্বিগ্ন হতে পারে। এত উল্লাস এত আনন্দ কারাগারে আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। বসন্তের পাখীর মত তিনি এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে গেছেন আর শুনিয়েছেন নতুন দিনের গান। অর্থাৎ কারাগারের সবখানে রাজনীতির প্রেক্ষিতে পর্যুদস্ত মানুষগুলোকে আশা আর আশ্বাসে প্রাণবন্ত করেছেন তিনি। সময়ের স্বল্প ব্যবধানে তার ভবিষ্যতবাণী আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট। জেল থেকে বেরিয়ে এসেও আমি তার নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছি। সুখ দুঃখের পসরা নিয়ে তিনি আমাতে একাকার হয়ে আছেন। সব রকম সহযোগিতা দেয়ার জন্য তার দুটো হাত আমার দিকে সম্প্রসারিত করে রেখেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আমার রাহবার বললেও অতিরঞ্জিত হবে না।

www.pathagar.com

চার

পনেরই আগস্ট। কারাগারে রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক দিন ভোর ৫টার সময় সূর্যোদয়ের পূর্বেই যথারীতি আমাদের সেলের ফটক খুলে যায়। অথচ আজ নিয়মের ব্যতিক্রম। সেলের মধ্যে অস্থিরতা ও আশঙ্কাজনিত আগ্রহ নিয় অপেক্ষা করছি। হলোটা কি! ৬টার ঘন্টা বাজল তবু কারো সাড়া নেই। বাজল ৭টা এখনও আমরা অন্ধ প্রকোষ্ঠে। সূর্য ওদিকে তাতিয়ে উঠছে। উত্তাপ বিকিরিত হচ্ছে। উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী। আমাদের ভাবনাও একই রকম উত্তপ্ত। বাইরের সংবাদ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আল্লাহ্ ভরসা।

৮টার ঘন্টা পড়ল। পদশব্দ শুনলাম। সেন্ট্রী সম্ভবত এগিয়ে আসছে। কারা প্রাচীরের ফটক খুলে দেয়া হল। আমরা এখনও যে যার সেলে আবদ্ধ। অবশেষে একে একে সবক'টা সেলের দরজা উন্মুক্ত হল। আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে বাইরের দিকে তাকালাম। কারাগারের অদূরে দালানগুলোর ছাদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অগণিত জনতার ভিড়। এমনটি দেখিনি আর কোন দিন। হাত নাড়িয়ে আমাদের ওরা কি যেন বলতে চাচ্ছে। অনেকের হাতে রেডিও, ট্রানজিস্টার অথবা টু-ইন-ওয়ান। আমাদের দিকে উঁচু করে ধরে আছে। ওরা আমাদের যেন কি বলতে চায়। ওদের অঙ্গভঙ্গির সাংকেতিক ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবে মনে হল বাইরে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে। দূর থেকে নজরুলের একটা গানের কলি ভেসে আসছে– মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লেআলা, তুমি বাদশাহর বাদশাহ কমলিওয়ালা।

স্রোত কি তাহলে উজানে বইতে শুরু করল! উল্টো হাওয়া দেখে কি ভাবতে পারি শ্রাবণ মেঘে ফাগুনের পূর্বাভাস। সূর্য পশ্চিম দিকে উদয়ের মত অস্বাভাবিক মনে হল সবকিছু। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় একি অশনি সংকেত। শাহজালালের পদধ্বনি কেন?

গানটা শোনার পর কারাবাসীদের সকলের আগ্রহ আরও তীব্র হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সকলেই এগুতে লাগল দালানগুলোর কাছাকাছি পাঁচিলের দিকে। কিন্তু পুলিশ এসে বাধা দেয়াতে সকলেই ফিরে এলেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশদের মাধ্যমে জানতে পারলাম– শেখ মুজিব নিহত। সেনাবাহিনী মুজিবকে হত্যা

www.pathagar.com

করেছে। আমার তক্ষুণি সিজদায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। মহান খোদার উদ্দেশ্যে বললাম, 'ইয়া মাবুদ! তুমি ছিলে, তুমি এখনও আছ। তুমি কোন ব্যাপারে গাফেল নও। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে! তুমি আধুনিক দুনিয়ার নব্য নমরুদ-শাদ্দাদের পতন ঘটিয়ে প্রমাণ করলে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই সমস্ত সার্বভৌমত্বের মালিক।'

কারাগারের ডাক্তার মঈনুদ্দিন সাহেব আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আমি বললাম– 'একটা জগদ্দল পাথর যেন জাতির বুক থেকে সরে গেল। দুর্নীতির ভাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাহাড় যেন ধসে পড়ল।' ধোঁকাবাজী, মিথ্যাচার আর সন্ত্রাসের ওপর গড়ে ওঠা রাজপ্রাসাদ তাসের ঘরের মত ভেঙে খান খান। আমার মনে হল– হিন্দুস্তান ও তার উচ্চাভিলাষী কতিপয় দালালদের হাতে বন্দী ১০ কোটি মানুষ আজ মুক্ত। সোনার বাংলার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার মানুষগুলো আজ প্রাণ ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিবে।

কারাগারের শিক্ষক মতিউর রহমান সাহেব স্কুলে আজ যথানিয়মে না এসে একটু দেরীতে এলেন। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণে আজ মুক্তির এই আনন্দ-ঘন দিনে তার প্রাণের আবেগ নিয়ে অনেক কিছু বললেন– 'আমি আসার পথে দেখলাম মোড়ে মোড়ে ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে অস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা টহল দিচ্ছে গোটা শহরে। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উল্লসিত জনতার উদ্দেশ্যে বলছে– 'আপনারা ধৈর্য ধরুন আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোয়া করুন, সময় ভাল নয়। আপনারা জটলা অথবা ভিড় করবেন না।' তার ভাষায়– 'সেনাবাহিনীর বিনম্র আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। মনে হয় তাদের এই ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ মহান উদ্দেশ্যে এবং জাতির কল্যাণের জন্য।'

জাতির এই ঘোর অমানিশায় এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে জানবাজী রেখে যারা এই বিপ্লব ঘটিয়েছে আমি তাদের জন্য দোয়া করলাম। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এই বলে– 'ইয়া মওলা! এই বীর সৈনিকদের হাতগুলো মজবুত করে দাও। হিম্মত দাও এদের বাহুতে।'

আবার বলতে হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র– 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমমুখি ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।' তার প্রমাণ এতদিন যারা দালালীর অভিযোগ এনে দেশপ্রেমিক মানুষগুলোকে অন্ধকারার বদ্ধ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখেছিল আজ তারাই বিদেশী এবং বিজাতীয় দালালীর তিলক পড়ে আসতে শুরু করল। আর আমাদের শুরু হল

www.pathagar.com

একে একে বিদায়। রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কলির মত– 'তোমার হল শুরু আমার হল সারা।'

লাল বাহিনী প্রধান শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান, যে একদিন কেন্দ্রীয় কারাগার ঘেরাও করেছিল, সাথে তার শত শত লাল বাহিনীর বরকন্দাজ। উদ্দেশ্য রাজাকার আর শান্তি কমিটির লোকজনকে হত্যার করবে। সেদিন পারেনি। কিন্তু আজ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস– তাকে আসতে হল কারগারে আলবদর আর রাজাকারদের মধ্যে। এদের করুণা নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এদের দয়ায় তার পিঠ বাঁচে। তবু কি শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছে? তার যন্ত্রণায় উত্যক্ত পুলিশেরাই তার সেলে পিঞ্জরায় আবদ্ধ জানোয়ারের উপর অত্যাচারের মত করে তার ওপর নিপীড়ন চালায়। তারই রক্তে লালে লাল হয়ে ওঠে সেল প্রকোষ্ঠের মেঝে।

একে একে আসে তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, জিল্লুর রহমান, তোফায়েল আহমদ, শামসুল হুদা, কোরবান আলী, এম এ রেজা, আবদুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী আরো অনেকে।

কয়েকদিন পর আসে কাজী বারী। যে আমাকে হত্যা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজেছে, তাদের তথাকথিত বিজয়ের দিন গুলোতে। এর পরে এলেন আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতারা এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক ডিসি আহমদ ফজলুর রহমান (ফরিদপুর), আলী রেজা (কুষ্টিয়া), কামাল সাহেব (নোয়াখালী), মাহবুবুল আহমদ চৌধুরী (হবিগঞ্জ)। এই ষড়যন্ত্রকারীদের পেলাম আমি অত্যন্ত কাছাকাছি। আমার ১০ সেল ডিভিশনে ছিল তাদের অবস্থান। সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাত ও কেরাম খেলার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা নিবিড়ের পর্যায়ে এসে পড়ে। মোমেনশাহী ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃস্থানীয় কর্মী, সুমসাম, কামাল সাহেবের শ্যালক হওয়ার কারণে কামাল সাহেবের সাথে আমার সম্পর্কটা আরও নিবিড় আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সুমসামের অনুপস্থিতিতে তার সাথে আমার সম্পর্ক সুমসামের অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। নিকটতম আত্মীয় সুমসামের চরিত্র ও চিন্তা চেতনার সাথে তার পরিচয় ছিল। আমার প্রতিও তার কোন রকম বিরূপ ধারণা জন্মেনি।

আহমদ ফজলুর রহমান ছিলেন স্বল্পভাষী কিন্তু একরোখা মানুষ। তার সাথে আমার আলোচনা প্রায়ই উত্তপ্তের পর্যায়ে এসে যেত। তার দাবী, আজকের বাংলাদেশের স্থপতি তারাই। তারাই এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। তার ভাষায়– 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরাই আগরতলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন

www.pathagar.com

করি। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলে ভারতের সাথে যোগসাজশ ছাড়া ভিন্ন কোন পথ ছিল না।' বললাম, 'এ ব্যাপারে আপনার সাথে একমত। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের সাহায্য নেয়া ছাড়া মীরজাফরের কোন বিকল্প ছিলনা। মীরজাফরের অসদুদ্দেশ্য ছিল এমনটি বলা যায়না। ইতিহাস যাই বলুক, সিরাজের বালসুলভ স্বৈরাচার ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন মীরজাফর।'

'আপনি আমাদের মীরজাফরের সাথে তুলনা করতে চান?' একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন রহমান সাহেব।

বললাম– 'ভুল বুঝবেন না। মীরজাফরের উদ্দেশ্য আপনাদের মতই হয়তো বা মহত ছিল। কিন্তু আপনাদের মত তিনিও পরিণতির গভীরে যেতে পারেননি। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে। স্বাধীন বাংলার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি ক্লাইভের সাথে যে ঔদ্ধত্য নিয়ে আগে কথা বলেছেন, বাংলার নবাব হয়ে তার সেই ঔদ্ধত্য আর আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে গেছে। নবাবীর মসনদে বসেও মীরজাফর ক্লাইভের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস করেননি। যেমন শেখ মুজিব দিল্লীর অনুমোদন ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস রাখতেন না। অথচ একদিন এই মুজিবের হুঙ্কারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পর্যন্ত তার ধানমন্ডির বাসভবনে ছুটে এসেছেন। ইতিহাসের করুণ পরিণতি তো এটাই। আমাদের দুঃখ তো ওখানেই।'

ফজলুর রহমান সাহেব আমার কথায় আরও একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চড়া গলায় বললেন– 'আপনি কি বলতে চান? এত হত্যা এত জ্বালাও পোড়াও, এত অত্যাচারের পরও কি বলতে চান স্বাধীনতা আন্দোলন ঠিক হয়নি? অথবা ভারতের সাহায্য নেয়া অন্যায় হয়েছে?'

বললাম– 'মাফ করবেন। আপনাকে আহত করার কোন ইচ্ছেই আমার মধ্যে নেই। ২৩ বছরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় একাত্তরে এই যে নজীরবিহীন জুলুম নেমে এসেছে, এটা কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে। সুপরিকল্পিতভাবে এটা আনা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আগে এই হত্যার সূচনা করল কারা? সান্তাহারের গণহত্যা কার ইঙ্গিতে? পাকসী হার্ডিঞ্জ সেতুর নিচে হাজার হাজার অবাঙালী মুসলমান হত্যা করল কারা? দিনাজপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ভৈরব– এদেশের প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের উদ্বোধন আওয়ামী লীগ করেনি কি? গণ-উত্তেজনা সৃষ্টি করে শত শত ইপিআর, সেনাবাহিনীর সদস্য ও

www.pathagar.com

তার পরিবারবর্গকে গরু ছাগলের মত হত্যা করা হয়েছে। এমনকি সদ্য ভূমিষ্ট শিশুকেও রেহাই দেয়া হয়নি। এর পরও বলতে চান সশস্ত্র বাহিনী তাদের হত্যাকারীকে চুমু খাবে? এমনটি হবে না জেনেই আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তারা চেয়েছিল– সেনাবাহিনী জনগণকে অত্যাচার করুক। তাহলে তারা হিন্দুস্তানে যেতে বাধ্য হবে। এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে অস্ত্র। এটা কিন্তু আমার বক্তব্য নয়; কোলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ' এর রূপদর্শীর প্রতিবেদন থেকে বলছি। এই পত্রিকায় মুজিব ভুট্টো উভয়কেই হিন্দুস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা RAD (পরবর্তীতে RAW)-এর এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উভয় নেতার বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ধ্বংসের পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হন।'

ফজলুর রহমান সাহেব মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে আমার কথা শুনলেন। যদিও তার মধ্যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা আমি লক্ষ্য করেছি। আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্য আর একজন কামাল সাহেব মুখ খুললেন। বললেন– 'আপনি কি বলতে চান বৈষম্য ছিলনা? বলতে চান বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা অন্যায় হয়েছে?'

বললাম– 'বৈষম্য ছিলনা এমনটি আমি বলিনি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অন্যায় অথবা অযৌক্তিক-ইবা বলব কেন? গণ আন্দোলন ও শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করা যেত এটাও আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এর জন্য আমাদের জাতীয় দুশমন হিন্দুস্তানের সাহায্য নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে রক্তাক্ত পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে হবে, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এটাকে মেনে নিবে কি করে?'

আমি আবার বললাম– 'ধরুন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল শিল্প কারখানা ও সমৃদ্ধির দিকে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, উত্তরাঞ্চলের অবস্থা তেমনই অপরিবর্তিত ও করুণ। এর সমাধান শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় না হয়ে যদি কেউ বিদেশী সাহায্য নিয়ে উত্তরবঙ্গকে পূর্বাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তাহলে এটাকে একটি সার্বভৌম সরকার কিভাবে নিবে? অথবা আপনি এটাকে কিভাবে নিতে পারেন? আপনি কি চাইবেন বাংলাদেশ দুটো ভাগ হয়ে যাক?'

কামাল সাহেব কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন– 'সামরিক চক্র শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হতে কোন দিনই দিতোনা।'

www.pathagar.com

বললাম– 'তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিকচক্র একটা বিরাজমান সমস্যা এটাকে স্বীকার করি। কিন্তু এ সমস্যা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের এমনটি নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও সমস্যা ছিল ঐ একই। যেমন ঊনসত্তুরের গণআন্দোলন। যার মাধ্যমে মুজিব কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন, এটাতো সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। যদিও এই গণআন্দোলন সৃষ্টির মূলে আওয়ামী লীগের কোন হাত ছিলনা। এমনি করে সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে তো আমরা সার্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।' রহমান সাহেব বললেন– 'আপনি পশ্চিমাদের মন মানসিকতা জানেন না। শুরু থেকে তারা আমাদের ওপর তাদের মন-মানসিকতা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তা না হলে জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেয়ার অর্থ কি?'

আমি বললাম– 'জিন্নাহর সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে কিন্তু অসদুদ্দেশ্য-প্রণীত নয়। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানের গণমানুষের মুখের ভাষা উর্দু নয়। উর্দুকে তিনি পূর্ব পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের সেতুবন্ধন তথা কমন ভাষা হিসাবে চিন্তা করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত হয়তো তার ভুল। এ ভুল সিদ্ধান্ত গণ-আন্দোলন অথবা শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পাল্টানো সম্ভব ছিল। পরবর্তীতে সেটা হয়েছেও। যে ভাষা আন্দোলনকে পুঁজি করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আপনারা নিয়ে এসেছেন সেই ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কিন্তু আপনাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অপকর্মের শরিকদার নয়। তাদের অধিকাংশ আপনাদের পরিভাষায় দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল– যেমন অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম এবং আরও অনেকে। আপনি কি বলতে চান তাদের দেশপ্রেমের অভাব রয়েছে?

প্রাসঙ্গিকভাবে আমি আরও বললাম– 'পাকিস্তান ছিল জনগণের রায়। এটা চাপানো কোন বস্তু ছিলনা। আপনারা এই রায়কে পাল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের অপরাধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে কি পর্যায়ের ভেবে দেখেছেন কি? অথচ যারা সেই রায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে তারাই দেশের শত্রু, আপনাদের পরিভাষায় দালাল। আচ্ছা বলতে পারেন, হিন্দুস্তানের ছত্রছায়ায় বন্ধুকের নলের মুখে বাংলাদেশ হওয়ার পর আজও কি এ ব্যাপারে কোন রেফারেণ্ডাম হয়েছে? হয়নি। অথচ যে কোন সচেতন ব্যক্তি এ কথাই বলবে রেফারেন্ডামকে একমাত্র রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পাল্টান সম্ভব। এমনকি হিন্দুদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত মুজিব প্রণীত ৪টি মূলনীতির ব্যাপারেও জনগণের রায় নেয়া হয়নি। সবকিছু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা জানে জনগণ এসব প্রত্যাখ্যান

www.pathagar.com

করবে। মুজিববাদ ও তথাকথিত প্রগতিশীলদের গণতন্ত্র একটি ভণিতা, একটি মুখোশ এবং রুশ-ভারত চক্রের নীলনক্সা বাস্তবায়নের হাতিয়ার।'

১৫ আগস্টের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে জনাব রহমান বলেন– 'রেডিও খুলে আমি হতবাক। ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান বলে বিশ্বাসই হচ্ছে না। গানগুলো পাকিস্তানী মার্কা ইসলামী গান। একের পর এক সম্প্রচারিত হচ্ছে। ভাবলাম এ আবার কি? ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে এ কোন অশনি সংকেত! রেডিওর নব ঘুরাচ্ছি। বার বার নেড়ে চেড়ে দেখছি ঢাকা কিনা। ঘোষণা শুনলাম– খুনী মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠল আমার সামনে। থরথর করে কাঁপছে আমার দুটো পা। পা বাড়াতে পারছিনা, বসে পড়লাম। মনে হল পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসছে। মুজিব ভাই, বঙ্গবন্ধু নিহত! না, এ হতে পারে না। অবিশ্বাস্য মনে হল আমার কাছে। সাহসে ভর করে উঠলাম। বন্ধুমহলে টেলিফোন করলাম। সবখানে একই বিস্ময়! কোন কোন টেলিফোনে রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ রিসিভ করছে না। সময় অস্বস্তি আর অস্থিরতার মধ্যে এগিয়ে চলছে। খন্দকার মোশতাক ভাষণ দিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিলেন। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর একটা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অঙ্কের হিসেবে কেমন যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। এক বিরাট রক্ষীবাহিনী, যাদেরকে মুজিবের কট্টর সমর্থক হিসাবে তৈরী করা হয়েছে। মুজিব সমর্থকদের হাতেও তখন প্রচুর হাতিয়ার। সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বিরূপ থাকলেও বিরাট অংশ রয়েছে সমর্থনে। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াহীনভাবেই সারাটা দিন কাটল। রাত পেরুল, আবার সকাল হল, দেশের কোথাও কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে শুনলাম না। এমনকি ভারতও এল না কোন সাহায্য নিয়ে। মনে হল গোটা জাতি মরে গেছে।'

জবাবে আমি বলেছিলাম– 'সম্মোহিত গোটা জাতির চেতনা তখন ফিরে এসছিল বলে কোন পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ আসেনি। গোটা জাতি মুজিব হত্যাকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছে। একাত্তরে যে সম্মোহিত জাতি পাকিস্তানের কারাগারে থাকার কারণে মুজিবের জন্য কেঁদেছিল পঁচাত্তরে এসে সেই জাগ্রত জাতি তার মৃত্যুর জন্য উল্লাস করেছে। এ থেকে আপনাদের বুঝা উচিত আপনারা জাতীয়তাবাদের যে উন্মাদনা ছড়িয়েছিলেন সেটা ছিল কৃত্রিম ও সুপরিকল্পিত। আপনারা নিজেদের ভাবেন সুচতুর ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু আল্লাহ বলছেন, 'আমিই সবচাইতে বড় কৌশলী।' আর এও জানা উচিত– কিছু মানুষকে কিছু দিনের জন্য সম্মোহিত করে

www.pathagar.com

রাখা সম্ভব হলেও চিরকাল সম্ভব হয় না। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিধারায় এগিয়ে চলে।'

আমার কথাগুলো তারা কিভাবে গ্রহণ করলেন জানিনা। তবে তিনি বললেন– 'সবচাইতে অবাক হলাম যখন আমাকে গ্রেফতার করা হল এবং ভারতের সাথে আমাদের যোগসাজসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। আমাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হল। পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে আমাদের ওপর। উল্টো করে টাঙ্গিয়ে চাবকালো তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত। সবচাইতে বড় কথা তারা যে ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেটা বাংলা নয় উর্দুতে। মনে হল আমি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী। ভাবলাম ইতিহাসের গতি কি তাহলে উল্টো দিকে?'

কামাল ভাই বললেন– 'আমার উপর নির্যাতনের কথা কোন দিনও ভুলব না। আজও সে নির্যাতনের কথা মনে হলে শিউরে উঠি। এ নির্মমতা পাকিস্তানীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের উপর তাদের যেন এক আদিম আক্রোশ জমে ছিল। পাকিস্তানী মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আজও সেনাবাহিনী দখল করে আছে। তিনি আরও বললেন, আমাদের ত্যাগের বিনিময়ে এই বাংলাদেশে পাকিস্তানী মানসিকতাকে লালিত হতে দেবনা। আমরা বাইরে বেরিয়ে আবার প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

অনুরূপ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম আলী রেজা। তার ভাষায়– 'বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশী সৈনিক দ্বারা আগরতলা ষড়যন্ত্রকারী বলে নির্যাতিত হব এমনটি ভাবতে পারিনি কোন দিনও।'

পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পরে আবদুল কুদ্দুস মাখন করাগারে অন্তরীণ হলে তিনি আমাদের পাশের সেলে থাকতে লাগলেন। তার সাথে ছিলেন তার চাচা ও তার ভাই হুমায়ুন। বাংলাদেশ আন্দোলনে চার যুব-নেতার তিনি অন্যতম হলেও আমার ইতিবৃত্ত জানার পর আমার প্রতি তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিনি বরং তার সাথে আমার সম্পর্ক সদ্ব্যবহার থেকে সখ্যতায় পরিণত হয়। তার সাথে আমি প্রায় প্রতিদিন ব্যাডমিন্টন খেলতাম। খেলার মাঠে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মযহারুল ইসলামের সাথে প্রায় দেখা হত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তসরুফের আসামী হিসাবে কারাগারে ছিলেন। তার রবীন্দ্র-প্রীতির আতিশয্য এত অধিক ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু-প্রীতিতে পরিণত হয়। তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ লোপ পেয়েছিল পুরোপুরি। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করার ব্যাপারে এতটুকু সংশয়

www.pathagar.com

ছিলনা। কোন জাতির মগজে পঁচন ধরলে সে জাতির অধঃপাত ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মযহারের প্রত্যক্ষ সাহচর্য না পেলে সম্ভবত সেই পঁচনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারতাম না। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তিনি কটাক্ষ করতেন। তিনি অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দুস্তানের সাথে বাংলাদেশ বিলীন হওয়ার মধ্যেই নাকি বাংলাদেশের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ নিয়ে তার সাথে বহুবার বহুভাবে আলাপ হয়েছে। তার সাথে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হতেন পাবনার সার্কেল অফিসার জনাব আবদুল কাদের খান। জনাব খান এক মিথ্যা মামলায় আটক ছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতির ওপর তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল।

আমাদের আলোচনা পর্যালোচনা বাইরের যুদ্ধংদেহী রাজনৈতিক প্লাটফর্মের মত ছিলনা। প্রত্যেকে তার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অবতারণা করতেন এবং ধৈর্য সহকারে শুনতেন। আওয়ামী লীগের অন্যান্যদের চাপ থাকা সত্ত্বেও মাখন ভাই আমাকে যথেষ্ট আদর করতেন। তার অন্তরে অনুশোচনার ঝড় বইছে এমনটি বাহির থেকে বেশ দেখা যেত। ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশালীন মন্তব্য করতে আমি কোন সময়ই তাকে দেখিনি। তিনি ছিলেন প্রশান্ত-চিত্ত ও সদালাপী। একই রকম অনুভূতি আমি লক্ষ্য করেছি জিল্লুর রহমান সাহেবের মধ্যেও।

ডক্টর মযহার ও জাসদের এম এ আওয়ালের মত দুর্নীতির পাঁক থেকে যারা উঠে এসেছেন ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ তাদের মধ্যেই বেশী ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল– 'বাহাত্তরে ভুল করেছি আলবদর রাজাকাদের ক্ষমা করে। আগামীতে সুযোগ এলে আর ক্ষমা করব না।'

আমি বলেছিলাম, 'আলবদর রাজাকার আর দালালেরা আকাশ থেকে নাযিল হয়নি, এই মাটি এই আবহাওয়ায় তারা জন্ম নিয়েছে। এখানের এই পরিবেশে তারা লালিত। এ কারণে শিকড়ও এ মাটির গভীরে বিস্তৃত। এক সময় এ জাতিকে সম্মোহিত করে হিন্দুস্তানী তলোয়ারের ছায়াতলে যা ইচ্ছে তাই করেছেন। যাকে হত্যা করা সম্ভব করেছেন তার বেশী আর অগ্রসর হলে পঁচাত্তরের অনেক আগেই উৎখাত হতে হত। ভবিষ্যতের কথা বলছেন, সে সুযোগ আর এ দেশের মানুষ আপনাদের দিবে না। কোটি কোটি মানুষের কাছে আজ আপনাদের দালালীর চেহারা স্পষ্ট। সাড়ে তিন বছরে জাতিকে আপনারা কি দিয়েছেন? খুন খারাবী লুটপাট ছাড়া কিছু দিতে পারেননি।'

তারা বললেন– 'এই আলবদর রাজাকারদের জন্য আমরা কিছু করতে পারিনি।'

www.pathagar.com

বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। এদের জন্য নাটকের শেষ পরিণতি টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের হাতে এ দেশটাকে তুলে দেবার শেষপর্ব আর আনতে পারলেন না। পরিণতির আগেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। আপনাদের দুঃশাসনের দিনগুলোতে কোথায় কোন আলবদর রাজাকার আপনাদের অগ্রগতি রোধ করেছিল? তারা হয়তো ছিল কারাগারে অথবা ছিল পালাতক। এমন নির্বিঘ্ন সময় আর কি আপনারা পাবেন? শেখ মুজিব যে বিষ পান করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় সোনার বাংলা উজাড় হয়ে গেছে সাড়ে তিন বছরে। মুজিব ৮ কোটি মুসলমানের ইজ্জত ও আযাদীকে বিক্রি করার ব্যাপারে যে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সবংশে নিপাত হয়ে তাকে তার কাফফরা আদায় করতে হয়েছে। মুজিবের এই জিল্লতিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য দায়ী মূলত আপনারাই। আপনারাই মুজিবের হাত পা বেঁধে রেখেছিলেন। চাটুকারিতার চক্রান্ত বিস্তার করে মুজিবকে পরিস্থিতি আঁচ করতে দেননি। তাকে বাস্তব গণচেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। মুজিবের সত্যিকার ভক্ত ও অনুরক্ত যদি এদেশে থেকে থাকে তাহলে তাদের উচিত হবে আপনাদের চিহ্নিত করা। আর মুজিবভক্তরা যদি আপনাদের ক্ষমা করে তাহলে ইসলামী জনতার আদালতে আপনাদের একদিন দাঁড়াতেই হবে। সেদিন পালানোর আর সুযোগ হবেনা। তথাকথিত জাতীয়তাবাদীর অধীশ্বর যেমন সে সুযোগ পায়নি।'

কথার প্রেক্ষিতে অনেক কথা এসে গেছে। ডক্টর মযহারকে অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা। সেদিন ডক্টর মযহার তেমন জোরালো প্রতিবাদ করেননি। তাকে নীরব আক্রোশে ফুঁসতে দেখেছি। তবে আমাকে ঘায়েল করার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আমার সাথে মতবিরোধের প্রেক্ষিতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে আওয়ামী লীগের কেউ যেন আমার সাহচর্যে না আসে, আওয়ামী লীগ নেতারা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এটা হয়েছিল ডক্টর মাযহার সাহেবের ইঙ্গিতে।

একদিন খেলার মাঠে আমি, মাখন ভাই ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। হাজী রফিক, মওলানা বেলাল, গোমেজ আরও অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে ছিল। এক পর্যায়ে আমাকে অপ্রস্তুত করার জন্য ডক্টর মযহার একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, 'আমিন যে স্বেচ্ছায় আলবদরে যোগ দিয়েছিল এটা আমরা মনে করিনা। প্রেসারে যেতে বাধ্য হয়েছিল।'

www.pathagar.com

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একথাই বলেছিলাম– 'আমি জেনে শুনে ঈমানের দাবীতে একাজ করেছি। আমি এ জন্য অনুতপ্তও নই ক্ষমাপ্রার্থীও নই।'

আওয়ামী লীগ ও জাসদের সাথে আমাদের একটা স্নায়ু-যুদ্ধ কারাগারের অভ্যন্তরে চলতে থাকে। যদিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত সৌহার্দ পূর্ণ সহ-অবস্থানের মনোভাব বিরাজ করছিল। ডক্টর মযহার, কাদের সিদ্দিকীর ভাই লতিফ সিদ্দিকী, পাবনার রফিকুল ইসলাম বকুল, এমপি এম এ আউয়াল প্রমুখ উগ্রবাদীদের প্ররোচনায় কারাবাসীদের মধ্যে পোলারাইজেশন শুরু হয়। স্পষ্টত দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে কারাবাসীরা।

ডিআইজি আওয়াল সাহেবের পদোন্নতি হলে তিনি সেক্রেটারিয়েটে চলে যান। তার এ শূন্যস্থানে মোমেনশাহীর জেল সুপার ডিআইজি হয়ে ঢাকায় এলেন। আমাদেরকে নতুন এক বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক ও উগ্রপন্থী মুক্তিযোদ্ধা। ডক্টর মযহার, আবদুল কুদ্দুস মাখন, রফিকুল ইসলাম বকুল ও শেখ মুজিবের তথাকথিত গভর্নর নূরুল হকের প্ররোচনায় জেল সুপার আমাদের সকলকে দেশের বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তরের আদেশ দিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেন। ১০ সেল ডিভিশন থেকে সরিয়ে ২০ সেল ডিভিশনের সেই কুঠুরীটি আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়, যে কুঠরীতে কিছুদিন আগে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

ডিআইজি, জেল সুপার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের ফলে কারাগারে যেসব বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তার একটি তুলে ধরছি– নারায়ণগঞ্জের মুসলিম লীগ নেতা হাজী রফিক ও তার অন্ধ পিতা দালাল আইনে দীর্ঘ দিন ধরে আটক ছিলেন কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে একই সেলে পিতার অন্ধের যষ্টি হয়েই ছিলেন হাজী রফিক। কারা কর্তৃপক্ষের নতুন নির্দেশের ফলে অন্ধ পিতাকে একাকী কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে রেখে তাকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে হল। যাবার মুহূর্তে আমরা দেখেছি তার অন্ধ পিতার বুক চাপড়ানো কান্না আর আহাজারি। তাকে দেখা শোনা এবং সেবা শুশ্রুষার জন্য কোন লোক আর তার পাশে রইলোনা। হাজী রফিকের পিতার দুরবস্থা দেখে কারাগারের প্রায় প্রতিটি মানুষই চোখের পানি ফেলেছে। কিন্তু ডক্টর মযহার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চোখে-মুখে আমরা দেখেছি বর্বরোচিত উল্লাস।

www.pathagar.com

অধিকাংশ জাসদ নেতা ও কর্মী আটক ছিলেন ২০ সেল ডিভিশনে। এখানে এসে প্রথম যে ক'জনের সাথে আমার পরিচয় হয় তারা হল আমার বন্ধু সৈয়দ নোমানীর ভাই বাহাউল হক সবুজ, কর্নেল তাহেরের ভাই বেলাল, অধ্যাপক আনোয়ার ও ইউসুফ ভাই। এদের সাথে সম্পর্ক দু'-একদিনের মধ্যে আন্তরিকতার পর্যায়ে পৌঁছে। এদের সূত্র ধরে জাসদের সব কটি দুঃসাহসিক তরুণের সাথে আমি পরিচিত হই। পরে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে। এদের নিয়ে প্রত্যেক দিন এক সাথে ব্যায়াম করতাম। রাজনৈতিক মত বিনিময় হত প্রায় সবসময়। আমাকে আমার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেল সুপার যে মানসিক নির্যাতন চালাতে চেয়েছিলেন সেটা আর হলনা বরং আমার চারিদিকে একটি নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম। জাসদের তরুণরা আমার ওপর দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

অল্প কিছু দিনের মধ্যে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বেশ কয়েকটা দিন আমাকে কারাগারের হাসপাতালে অবস্থান করতে হয়। সুস্থ হয়ে উঠলে ২০ সেল ডিভিশনে আর ফেরা হলনা। আমার জন্য ২৭ সেল ডিভিশনের একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হল। এটাও আমার নতুন পরিবেশ। আমাকে সার্বক্ষণিক বিব্রত রাখার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র এসব। এখানে আসার পর প্রথমত একাকী মনে হলেও পরবর্তীতে অনেকের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আমার পাশের সেলে থাকতেন আইনাল শাহ। তিনি একজন সাধক ছিলেন। খুনের আসামী হয়ে তিনি কারাগারে প্রবেশ করেন। সেই থেকে আজ অবধি তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন। ১৯৭১ সালে কারাগারের ফটক খুলে দেয়া হলে সমস্ত কয়েদী পালিয়ে গেলেও আইনাল শাহই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার অবস্থান থেকে এ পর্যন্ত নড়েননি। তাকে সব সময় দেখতাম তসবিহ তহলীল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। নামাজ পড়তে দেখিনি কখনও। কারাগারে থাকা অবস্থায় তার কাছে সাবেক রেডক্রস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার তার সাহচর্য লাভের জন্য তার কাছে প্রায়ই আসতেন। গাজী গোলাম মোস্তফার প্রতি আমার অত্যন্ত বিরূপ ধারণা ছিল বলে দু' একটি বাক্যালাপ ছাড়া সহজ ও স্বাভাবিক আলাপ হয়নি। আমার মনে হত কারাগারে গাজী গোলাম মোস্তাফা তার অতীত কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপরাধী ভাবতেন। আইনাল শাহের প্রতি গোলাম মোস্তফার এই দুর্বলতাকে তার পুঞ্জীভূত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রয়াস বলে আমার মনে হয়েছে।

www.pathagar.com

এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী কোরবান আলী সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। তাকে অনুতাপে দগ্ধ হতে দেখি। আমার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও ৫ বছরের কারাবাসের পরও আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আমার কাছ থেকে মওলানা মওদূদীর সাহিত্য চেয়ে নিতেন এবং মনোযোগ সহকারে পড়তেন। তিনি বলেন– 'ইসলাম সম্বন্ধে যে ধ্যান ধারণা, যে আলো আমি পাচ্ছি, এটা আমাদের সামনে এতকাল ছিল না।'

তার কথা শুনে নিজেদের অপরাধী বলে মনে হল। গোটা জাতির সামনে আমাদের চিন্তাধারা ও ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারার জন্য আজকে গোটা দেশ, গোটা জাতি অন্ধকারের আবর্তে খাবিখাচ্ছে। যদি সঠিক সময়ে ইসলামকে ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার ভাগ্যাহত জাতি ভাবাবেগে তাড়িত হতো না। ইতিহাসের চেহারা হত উল্টোটা।

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বলেন– 'আপনাদের নেতাদের বলুন– আমার কারামুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর করতে, আমি বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী করব।' একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন এমপি এবং শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচর জনাব শামসুজ্জোহার কণ্ঠেও। তার সাথে একই সেলে অনেক দিন অবস্থান করেছি। ইসলামী সাহিত্য ও মওলানা মওদূদীর রচনাবলীর সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমার সাহচর্যে থেকে। ওদিকে হাসপাতালে অবস্থানকালে মোমেনশাহী জেলা ন্যাপের সহ সভাপতি জনাব কাজী বারী আমার সাথে দেখা করেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমিন মাফ করো। অতীতের সমস্ত কিছুকে ভুলে যাও।' তার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের মমত্ববোধ লক্ষ্য করেছি। দেখেছি তার অনুতপ্ত মানসিকতা। আমি এক বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে নীরব থেকেছি। খোদাকে বলেছি– 'তুমি সবই পার মাবুদ।'

এই সেই কাজী আঃ বারী, আমাকে হত্যা করার জন্য কি এক অন্ধ আবেগে শানিত কৃপাণ নিয়ে হন্যে হয়ে পাগলের মত আমাকে খুঁজেছে। এই কাজী বারীর হাত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা। তার নেপথ্য ইঙ্গিতে তার সাগরেদরা অষ্টগ্রাম থানা জামায়াত নেতা মওলানা আবদুল গনি খানের পিতা, ভাই, ভাগনেসহ একই পরিবারের কয়েকজনকে হত্যা করে এবং শান্তি কমিটির কনভেনার জনাব মাহবুবুল হক কুতুব মিয়াকে জবাই করে হত্যা করা হয়। তার মাথাবিহীন লাশ নদীতে

www.pathagar.com

ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিন তার সন্তান ও স্বজনদের গগণবিদারী কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। এছাড়া আরো প্রায় ৩শ' নিরীহ রাজাকারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের লাশ মালা-গাঁথার মত দড়ি দিয়ে বেঁধে শাহপুরের নিকট নদীতে ভাসিয়ে দেয়। নদীর স্বচ্ছ পানি নিরপরাধ মানুষের রক্তে লালে লাল হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে ঐ সব রাজাকার তখনও অস্ত্র হাতে নেয়নি। কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নিয়ে নৌকাযোগে বাজিতপুর হয়ে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে এ নৃশংস হত্যা কাণ্ড ঘটানো হয়। পাকিস্তান আমলে খুন আর ডাকাতী মামলার ফেরারী আসামী বর্সা ও বেতের ও বদরসহ অধ্যাপক ইয়াকুব আলী এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিল। ইয়াকুব আলী বর্তমান বাজিতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান।

এই নৃশংসতা আমার সামনে ভেসে উঠল। অথচ আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের মূল নায়ক। তার খুন রাঙা হাত রয়েছে আমার হাতে। কাজী বারী আবেগে অনেক কিছু বলছে কিন্তু আমি যেন শুনতে পাচ্ছি সেই শাহাদাতপ্রাপ্ত রাজাকারদের দুঃস্থ পরিবার সমূহের পিতামাতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্রদের আর্তনাদ, বুক চাপড়ানো আহাজারি আর বেদনার্ত বিলাপ। আজও সেই কান্না, সেই আহাজারি মর্ম বিদারী মর্সিয়া হয়ে আমার প্রাণে বাজে।

আমি সেই দুঃস্থ রাজাকারদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের শোকে মুহ্যমান আত্মীয় পরিজনদেরকে আমার চোখের পানি ছাড়া সান্ত্বনা দেবার মত কোন কিছু দিয়ে আসতে পারিনি।

কাজী বারী আমার কাছে এসেছে অনুতাপ বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে। আমি ভাবছি তাকে আমি কোন ভাষায় কথা বলি।

বললাম– 'বারী ভাই, আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু যাঁর হাতে সেই পরাক্রমশালী আল্লাহই একমাত্র ক্ষমাকারী।' আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম– 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দা অপরাধ করবে আর আমার কাছে ফিরে আসবে; এ না হলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।'

দেখলাম বারী ভাইয়ের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন– 'তুমি যেখানে আছ কর্তৃপক্ষকে বলে সেখানে আমাকে টেনে নাও। কারাগারে যে কয়টা দিন আছি আমি তোমার সাহচর্যে থাকতে চাই।'

www.pathagar.com

বারী ভাইয়ের অনুরোধে আমি কারা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে ২৭ সেল ডিভিশনে নিয়ে এলাম। এখানে কাজী বারী আমার কুঠুরীতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। আমার কাছ থেকে বই নিতেন, পড়তেন, আলোচনা পর্যলোচনায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি আমার সামনে এলে অতীতকে রোমন্থন করে দুঃখ পেতাম। আবার তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন দেখে আমি খুশীও হতাম। আমি দোয়া করতাম এদের সবার জন্য। আহ! এ জীবনগুলো পাল্টে গেলে এ দেশটায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত। ইসলামী বিপ্লব তো একটা ব্যক্তির নাম নয়। এ বিপ্লব একটা গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের নাম নয়। ইসলামী বিপ্লব আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর আমূল পরিবর্তন। আর এ পরিবর্তন আনতে হলে তাতে দেশের কোটি কোটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অংশীদারীত্ব থাকতে হবে। বিপ্লবের প্রতিটি স্তরে থাকতে হবে গণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব। সংকীর্ণতার ভ্রান্তি বিস্তার করে যদি অনুতপ্ত কাজী বারীদের আমরা পাপী অশুচি বলে দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে বিপ্লবের বিস্ফোরণ হবেনা কোন দিন– কোন কালে। মানুষের অন্তরে অন্তরে বিপ্লব শুধুমাত্র গুমরেই মরবে।

ইসলামী সাহিত্যসমূহের সংস্পর্শে এসে কাজী বারীর চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন হতে শুরু করে। তার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হলাম। তিনি বললেন– 'দ্বীন থেকে রাজনীতকে বিচ্ছিন্ন করার অবকাশ অন্তত ইসলামে নেই।' ঠিক যেন ইকবালের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি– 'জুদা হো দ্বীন সেয়াসত সে তো রাহ যাতে হ্যায় চেঙ্গিজী।' দ্বীন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করলে সেখানে বিরাজ করে চেঙ্গিজের বর্বরতা। কাজী বারী আরও বললেন– 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিল না। ইসলামী রাজনীতিকে মনে করতাম ১৪শ' বছর আগের পরিবেশেরই উপযোগী কিন্তু এখন আমি এর মধ্যে দেখছি এক শাশ্বত চিরন্তন আবেদন। অনন্তকালের উপযোগিতা এর মধ্যে বিদ্যমান। ইসলামের স্থিতিস্থাপকতা এত বিস্তৃত, এত ব্যাপক যে এটা পৃথিবীর যে কোন আবহাওয়া, যে কোন মাটিতে শিকড় গাড়তে সক্ষম।' তিনি তার উদ্দাম যৌবন ইসলাম বিরোধিতা এবং জাহেলিয়াতের সপক্ষে ব্যয় করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন। কারামুক্তির সময় কাজী বারী আমার হাত ধরে বলেছিলেন– 'আমি তো মুক্ত হতে চলেছি। বাইরে গিয়ে তোমার মুক্তির জন্য কিছু করতে পারি কিনা দেখব। তোমার সাথে আমার যোগাযোগ থাকবে। এখান থেকে আমি যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে গেলাম এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটাও চিন্তা করছি।' কারাগার থেকে বিদায় নেয়ার বেশ কিছুদিন পর কাজী

www.pathagar.com

বারী আবার এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করতে।

মোশতাক ক্ষমতাসীন থাকাকালে কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে আবার ১০ সেল ডিভিশনে স্থানান্তর করলেন। এখানে থাকা অবস্থায় একদিন জানতে পারলাম আমাকে মোমেনশাহী যেতে হবে। আর এক মামলার শুনানী। ৪০ বছর কারাদণ্ড দেয়ার পরও প্রতিপক্ষের জিঘাংসা শেষ হলনা। তারা আরও কিছু চায়; চায় আরও আমার শাস্তি হোক। চায় আমার জীবনের প্রদীপ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই ধীরে ধীরে নির্বাপিত হোক। আমি যেন কোন দিনও বাইরের আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে না পারি। পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পরও জিঘাংসার শেষ হল না। মুজিবের তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা, দালাল আইনকে কালাকানুন হিসেবে মোশতাকের ঘোষণার পরও হিন্দুস্তানী দালালদের তূনের তীর ছুটে আসছে আমার দিকে। মুজিব চক্রের কর্মকর্তাদের সাথে কারাগারে সহ-অবস্থানের মধ্যে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে উপনীত হলেও তাদের চর অনুচরদের দ্বারা দাবার ঘুঁটি ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে।

পঁচাত্তরের শেষার্ধে সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আমার পায়ে আবার ডাণ্ডাবেড়ী পড়ানো হল। দীর্ঘ মেয়াদী দণ্ডপ্রাপ্তদের সফরের সময়ের অলঙ্কার ওটি। ট্রেনপথে মাত্র চার জন পুলিশ প্রহরায় বিকেল ৪টা নাগাদ আমি এসে পৌছলাম মোমেনশাহী স্টেশনে। তারপর রিক্সাযোগে কারাগারে। কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে বুঝে নিলে, আমার সফরসঙ্গী ৪ জন পুলিশ বিদায় নিয়ে চলে গেল। কারাগারে প্রবেশের পর যথানিয়মে আমাকে আনা হল কেস টেবিলে। কেস টেবিলে আসার পর জেল সুপার নির্মল রায় এলেন। জমাদার আবদুল আলিম তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ডাণ্ডাবেড়ী কি খুলে দেব স্যার?' জেল সুপার বললেন– 'তা কি করে হয়! তুমি জাননা তাকে? যার ৪০ বছর কারাদণ্ড, যার আরও বেশ কিছু মামলা ঝুলছে, এমন টেরর আলবদরের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়ার কথা ভাবছো কি করে?'

দূরে থাকার জন্য আমি সে কথা শুনিনি। জমাদার এসে বললেন। আমি বললাম– 'জেল সুপারকে জানিয়ে দিন আমার বেড়ী খুলতেই হবে। কারাগারের ভেতরে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে রাখার তো কোন অধিকার নেই। যদি তিনি আমার বেড়ী খোলার আদেশ না দেন তাহলে আমি তার ব্যবস্থা নেব।' জমাদার সাহেব জেল সুপারকে জানালে তিনি না খোলার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। জমাদার সাহেব এসে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন– 'বাবা মাত্র কয়েকদিনর জন্য তো এসেছেন, আবার তো ঢাকায় ফিরে যাবেন। এর মধ্যে সাহেবদের সাথে গোলমাল করে কি লাভ? বাবুরা নাখোশ হলে অসুবিধা হবে।' আমি বললাম– 'অসুবিধার বাকী আর কি

www.pathagar.com

আছে? আমি এর প্রতিবাদ করবই আপনাদের বাবুকে জানিয়ে দিন আমি তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী নই। আমার সাথে তৃতীয় শ্রেণীর মত আচরণ করার কোন অধিকার রাখেনা আপনার কর্তা। আমি অনশন করবই। আমরণ অনশন।'

জমাদার সাহেব সুপারের কাছে গেলেন। আর ফিরলেন না। এদিকে আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকলাম। ওদিকে মওলানা আতাহার আলী সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মুজাহিদ কমান্ডার আখতার আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে আর সব কারাবাসীদের নিয়ে অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে কারা কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে আমার ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেয়। আমি অনশন ভঙ্গ করি।

আমি বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জেনেছি মোমেনশাহীর জেল সুপার নির্মল রায় একাত্তরের সংকটে ভারতে পাড়ি না জমিয়ে হিন্দুস্তানের সপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য দুঃসাহসে ভর করে ঢাকায় থেকে যান। ঢাকার জেলার হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য তিনি কৌশলগত অবস্থান নেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা বলে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ও বাঙালী মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হন। সবার ধারণা হয় তিনি সত্যিই মুসলমান হয়েছেন। নিয়মিত নামাজ কালামও পড়তেন, কোরআন পাঠ করতেন। তৎকালীন প্রশাসনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখার মত অভিনয়-নৈপুণ্য তার জানা ছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঢাকা হিন্দুস্তানী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এলে শত শত বিহারী ও অবাঙালী মুসলমানদের জেল হাজতে নিয়ে আসা হয়। তাদের সমস্ত টাকা পয়সা ও গয়নাপত্র নির্মল বাবু হাতিয়ে নেন। জেল রেজিস্ট্রারে সবকিছু অনুল্লেখ থেকে যায়। পরবর্তীতে তিনি এর সবটাই আত্মসাৎ করেন। শুধু তাই নয়, হিন্দুস্তানের গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত এই ব্যক্তিটি ভারত বিরোধী চিন্তা চেতনা-সম্পন্ন মানুষদের পদে পদে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেন। এই নির্মল রায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার থাকা অবস্থায়ই জনপ্রিয় নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে তার সেলে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ১৯৭৩ সালে তার সময়েই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলী চলে। এতে বহু কয়েদী হতাহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন, আনিস ভাই। সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে দণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ইসলামপন্থীদের গুলী করা হয়। তিনি ভারতের গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন তার প্রমাণ হল তার ধর্মান্তরিত হওয়া এবং যুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানীদের সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কোন একটি ফুলের আঁচড়ও তার ওপর পড়েনি। সম্ভবত হিন্দুস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা RAW

www.pathagar.com

এর নির্দেশে তিনি এসব করেছেন।

মোমেনশাহী কারাগারে আমাকে ১৪ ওয়ার্ড ডিভিশনের দোতলায় স্থান দেয়া হল। সেখানে মুজাহিদ কমান্ডার আখতার ও ডাঃ মান্নানসহ দালাল আইনের লোকজন অবস্থান করতেন। এখানে আসার কয়েক দিন পর আর এক গোল বাধল। শুনলাম আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ ও অধ্যাপক আবিদুর রহমানকে মোমেনশাহী কারাগারে আনা হয়েছে। জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তারা আমাদের ১৪ ওয়ার্ড ডিভিশনে অবস্থান করবেন। তোফায়েল আহমদের কথা শুনে কয়েদীরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা কিছুতেই তোফায়েল আহমদকে বরদাস্ত করতে নারাজ। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে নির্মল রায় তাদেরকে যেভাবে হোক সেখানেই রাখবেন। তারা আমাদের শেষ পর্যন্ত আরও জানালেন যে প্রয়োজন হলে দালালদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে তোফায়েল আহমদকে রাখা হবে। আমাদের অনমনীয় মনোভাব এবং একাত্মতা দেখে অবশেষে নির্মল বাবু হার মানলেন। তা না হলে তার ঝুলির বিড়াল বেড়িয়ে যেতে পারে এমন এক আশঙ্কা করেছিলেন হয়তো বা। যাই হোক, আওয়ামী লীগের দু'জনকে অন্যত্র রাখা হল। ঘটনার কয়েকদিন পর তোফায়েল সাহেব আমাদের কাছে একটা চিঠি পাঠালেন। সেটা ছিল বিনম্রতার সাথে বিশেষ অনুরোধ। তিনি চান আমাদের ডিভিশনে আমাদের সাথে সহ-অবস্থান করতে। এবার আমরা বিবেচনা করলাম এই কারণে যে এটা চাপিয়ে দেয়া কোন সিদ্ধান্ত নয়। তোফায়েল ভাই অবশেষে আমাদের ডিভিশনে এলেন। এখানকার বাসিন্দাদের সকলেই তাকে বাঁকা চোখে দেখতেন। কিন্তু শুরু থেকেই তার সাথে আমার বেশ কথাবার্তা চলতে থাকে। এখানে তোফায়েল ভাইকে দেখতাম তিনি পুরোপুরি নামাজী। তসবীহ তাহলীল ও দোয়া কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। তার এই পরিবর্তিত মানসিকতার জন্য আমাদের ওয়ার্ডের বিরূপ কয়েদীরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। রুমে তোফায়েল ভাইয়ের সাথে সবারই সম্পর্কের উন্নতি হয়।

তার সাথে আমার প্রায়ই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হত। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন– 'আমিন, আমরা কি একাত্তরে ভুল করেছিলাম?'

বলেছিলাম– 'এখনও সেটা ভাবছেন, এত কিছুর পরও উপসংহারে পৌছাতে পারেন নি? একটা বৃহত্তর দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে আপনার মেধার ওপর আমার আস্থা ছিল।' এ প্রসঙ্গে একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললাম– 'যে আঞ্চলিকতার দিকে আহ্বান করে, যে আঞ্চলিকতার জন্য সংগ্রাম করে এবং

www.pathagar.com

আঞ্চলিকতার জন্য মৃত্যুবরণ করে সে আমার নয়।' এর পর আপনার কী বলার থাকতে পারে? আগামী দিনের বংশধরদের জন্য আপনার কী বলার আছে? যে জাতির সাথে আমাদের হাজার বছরের বিরোধ, যারা আজও মুসলমানদের আপন করে নিতে পারেনি, তাদের ইঙ্গিতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদেশের বেগুনাহ মানুষকে খুন করেছেন। পাক বাহিনীর নৃশংসতার জন্যও দায়ী আপনারা। সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের এবং আমাদের সংঘাতে যারা নিহত হয়েছে তারা কারা?– সবাই মুসলমান। আপনার ভাই, আমার ভাই, মুক্তিফৌজ, সেও মুসলমান, পাকিস্তানী সেনা সেও মুসলমান। আলবদর, রাজাকার, বাঙালী সৈনিক, ইপিআর– যারাই নিহত হয়েছে সবাই মুসলমান। আমরা পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছি আর হিন্দুস্তানের বাবুদের ঘরে ঘরে চলেছে উল্লাস। এর পরেও কি বলতে চান ভুল করেন নি?' তোফায়েল ভাই নীরব থাকলেন।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে তিনি বললেন– 'বঙ্গবন্ধুর বিরাট একটা সদিচ্ছা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বঙ্গবন্ধুকে কাজ করতে দেয়নি। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এক মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হল।' কথাগুলো আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলার সময় দেখলাম তার চোখ ছল ছল করে উঠেছে। মুজিবের প্রসঙ্গ এলেই তিনি কেঁদে ফেলতেন। বললাম– 'নজীরবিহীন সমর্থন যার পেছনে ছিল, তার কিছু করণীয় থাকলে তার প্রতিফলন দেখতে পেতাম। বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতে বিলীন করা যদি হয়ে থাকে তার স্বপ্ন, তাহলে সেটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে ভালই হয়েছে। একটা জীবনের বিনিময়ে গোটা জাতি আসন্ন বিপর্যয় থেকে নাজাত পেয়েছে। যদি ভেবে থাকেন মুজিব বেঁচে থাকলে দেশকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে দিতেন তাহলে ভুল করেছেন। মুজিব বলেছিলেন, 'তিন বছর কিছু দিতে পারুমনা।' আল্লাহ তাকে তার পরেও সাড়ে তিন বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কোনকালেই তিনি কিছু দিতে পারতেন না। খুনরাঙা হাত দিয়ে কোন কল্যাণ আসতে পারে না। বিদেশী ও বিজাতীয় গোলামদের দিয়ে ভাল পরিকল্পনা সম্ভব নয়।' আমার কথাগুলো তোফায়েল ভাই নীরবে শুনে যেতেন তেতো ঔষুধের বড়ি গেলার মত করে, তবে অধ্যাপক আবিদুর রহমান আমার সাথে প্রায়ই একমত হতেন। আওয়ামী লীগের অতীত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তোফায়েল ভাইয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়তো বা কিছু হয়েছিল, তার নামাজ কালাম ও তসবীহ তাহলীলের প্রতি আসক্তি দেখে সেটা স্পষ্ট বুঝা যেত। কিন্তু কখনও মুখ দিয়ে আবিদুর রহমানের মত সহজ স্বীকৃতি প্রকাশ করতে দেখিনি তাকে।

www.pathagar.com

ছাত্র সংঘের বিভিন্ন নেতা প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত ভাল ধারণা ব্যক্ত করতেন। কোন একদিন ছাত্রনেতা শহীদ আবদুল মালেক ভাই প্রসঙ্গ এলে আমি তোফায়েল ভাইকে বলেছিলাম, 'শহীদ মালেকের প্রত্যক্ষ হত্যাকারীদের মধ্যে ছিলেন আপনি নিজেও।' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

একদিন তোফায়েল ভাইয়ের স্ত্রী ও মা এলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাদের মুখ থেকে তিনি জানতে পারলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার ভাইকে তার এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করেছে। কথাটা শুনেই তিনি কেঁদে ফেললেন। সারাক্ষণ কাঁদতেন তিনি। তার চোখে আমি দেখেছি বাঁধভাঙা অশ্রু। আওয়ামী বর্বরতার মধ্যমণি হয়েও তার হৃদয়ের গভীরে ছিল একটি কোমল মানবিক সত্তা। তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার ছিল আকর্ষণীয়। বিজাতীয় প্রলোভনের দুর্বিপাকে হারানো তার মুসলিম সত্তা তিনি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছেন। খানিক হলেও পেয়েছেন বলে আমার ধারণা। তার এই প্রাপ্ত উপলব্ধি আর অনুভূতি বাইরের দুর্বৃত্তরা আবারও লুঠ করবে কিনা আমি তা জানিনা।

ঢাকা থেকে মোমেনশাহী জেলে যে কারণে আমাকে আনা হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক। আমার বিরুদ্ধে আর একটি হত্যা মামলা। অষ্টগ্রামের দেওঘর ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আহমদ আলী আমার বাদী। অভিযোগ– তার পিতাকে আমি হত্যা করেছি। আদালতে আমাকে হাজির করা হয়। আদালতের এলাকার মধ্যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে আমি রয়েছি। ভাগ্যচক্রে আহমদ আলীকে আমার চোখে পড়ল। ডাকলাম, আমার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলাম– 'আপনি নিজে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন না, আপনার পিতার হত্যাকারী কে?' 'জানি' জবাব দিল আহমদ আলী। জিজ্ঞাসা করলাম– 'জেনে শুনে কি করে আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন?' আহমদ আলী বললেন– 'আমি চাপের মুখে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বললাম, 'কে বা কারা আপনার পিতাকে হত্যা করেছিল আপনাদের সবার জানা। তাছাড়া আপনার পিতার অপরাধ কি যে আমার তাঁকে হত্যা করতে হবে? তার কাছে আমি আপনার চেয়ে কম প্রিয় ছিলাম না। তিনি আমার ছিলেন শ্রদ্ধেয়।'

ইতিমধ্যে মামলার সাক্ষীদের পেয়ে গেলাম। তারা কাজী বারীর সহযোগী মোজাফফর ন্যাপের কর্মী। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম– 'আপনারা সাক্ষী হতে

www.pathagar.com

এসেছেন? সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে আপনারা কি বলতে পারবেন, আহমদ আলীর পিতাকে আমি হত্যা করেছি? ৪ বছর পরও মিথ্যার বেসাতী শেষ হল না! এ হত্যার নায়ক আপনারা, আপনাদের দলীয় কর্মীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করে আপনারা এদেশের ভাল মানুষগুলোকে হত্যা করেছেন। মুক্তিফৌজ সেজে এসেও আপনারা ভাল মানুষগুলোকে হত্যা করেছিলেন। ভৈরবের মোমতাজ পাগলার ছেলে হাদী, গোলাম গউস ও তার ভাইয়েরা কি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী অথবা ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিল? সেনাবাহিনীকে তারা অপকর্মের ইন্ধন জুগিয়েছে। তারা হত্যা করেছে, লুট করেছে। এসব করেছে তারা পাকিস্তানের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য। মুক্তিফৌজরা গ্রামবাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে জাতীয় বিবেকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য। আবার মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে অবশিষ্ট বিবেকগুলোকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে পঁচন ধরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে আপনাদের অপকর্মে বাধা দেয়ার কেউ থাকবেনা। এ জাতিটাকে ৪ বছর লুট করেও আপনাদের আশা মিটেনি। পঁচাত্তরের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতেও কি আপনাদের বিবেকবোধের সঞ্চার হবেনা।'

আমার কথাগুলোয় দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। নমনীয়তা প্রকাশ করে তারা আমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এই আদালত প্রাঙ্গণে আমার এলাকার চেনামুখ আরও অনেক পেলাম। এখানেই প্রথম জানলাম, অষ্টগ্রাম উপজেলার আবদুল্লাপুরের শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী তোতা মিয়া মাস্টারকে অন্ধ জাহেলরা অপদস্থ করেছে। দুঃখ হল। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক ও এ অঞ্চলের নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের সাথে জড়িত। জানলাম মুজিববাদী সন্ত্রাসী মফিজ ও তার জাহেল অনুচরবর্গ তোতা মিয়া ও সাবেক এমএনএ মুসলিম লীগ নেতা সফিরুদ্দিন সাহেব, ওসমান গনি (টুক্কু চেয়ারম্যান, বড় বাড়ী) এবং অষ্টগ্রামের ফতু মেম্বারের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের কোন কিছু বাকী রাখেনি। তাদের মাথা মুড়িয়ে চুনকালি দিয়ে আবদুল্লাপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরান হয়। এইভাবে আল্লাহর হক-পরস্ত বান্দারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে জাহেল-জালেমদের হাতে কত যে অপদস্থ হয়েছে, কত যে নির্যাতিত হয়েছে– এর প্রকৃত তথ্য হয়তো কোন দিনই জনসমক্ষে আসবে না।

www.pathagar.com

এদেশের ইতিহাস একটি অপূর্ণ একপেশে ইতিহাস হিসেবে রয়ে যাবে শেষ অবধি।

আদালতের অঙ্গন থেকে শুনানীর সম্মুখীন না হয়েই আমাকে ফিরে আসতে হল কারাগারে। মরার ওপর খাড়ার ঘা যেমন প্রতিক্রিয়াহীন, ৪০ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর কাছেও নতুন মামলার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এসব তেমনি বোঝার ওপর শাকের আঁটি বলে মনে হত। কয়েকদিন পর মোমেনশাহী জেল থেকে বিদায় নিতে হল।

আবার কেন্দ্রীয় কারাগার। আবার সেই ১০ সেল ডিভিশন। এর মধ্যে ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলাম সাহেবের বদলীর আদেশ এল। নতুন এআইজি এলেন। ডিআইজির দায়িত্ব তিনিই পালন করছেন। জেলারও বদলী হয়েছে ইতিমধ্যে। নতুন জেলার রিয়াজুদ্দিন ভূঁইয়া এখন দায়িত্বে। প্রথম দর্শনে তার চেহারা সুরত ও চালচলন দেখে নেহায়েত আল্লাহওয়ালা বলে মনে হবে। কিন্তু ফুলের পাঁপড়ির নীচে বিষাক্ত বৃশ্চিকের মত একটা কিছু তার বাহ্যিক চেহারার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। তিনি ছিলেন উৎকোচ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত। তাকে ঘিরেই দুর্নীতি আবর্তিত হত। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি ছিলেন তোষামোদপ্রিয় একটি মানুষ। কারাগারে এ সুযোগটা নিয়েছিল কারাবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এর ফলে কারাগারের সবরকমের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশের দুয়ার আওয়ামী লীগের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং আমাদের প্রাপ্য কারাগারের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র সংকোচিত হতে থাকে। একদিন জেলার সাহেব আমাকে বললেন– '১০ সেল ডিভিশন আপনাকে ছাড়তে হবে।' বললাম– 'কেন? আমার জানার প্রয়োজন আছে। আমি এমন কোন অফেন্স করিনি যাতে করে আমার সেল পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। ৪০ বছর কারাদণ্ড একজন কয়েদীর জন্য মানসিক যন্ত্রণা। তারপরও এক সেল থেকে আর এক সেলে, এক পরিবেশ থেকে আর এক পরিবেশে চালান করে কষ্ট দেয়া কি সঙ্গত হচ্ছে?' আমি অনুরোধের সুরে বললাম– 'ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করবেন।'

পাথরের বুক থেকে প্রস্রবণের প্রবাহ বেরিয়ে আসে। নিরেট লোহা একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে বিগলিত হয়। কিন্তু জেলার সাহেব এমন একটা মানুষ যার বিবেকের সাথে আত্মা ও অনুভূতির যোগ নেই। আমার আবেদন, আমার আকুলতা তাকে বিগলিত

www.pathagar.com

করা তো দূরের কথা, তার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

একদিন সার্জেন্ট এসে হাজির। আমাকে অন্যত্র অর্থাৎ অন্য সেলে যেতে হবে। আমি বললাম– 'রাউন্ড পর্যন্ত আমাকে থাকতে দিন।' তিনি চলে গেলেন। আমাকে সরানোর ব্যাপারে আর তিনি আসেননি।

ডেপুটি জেলার ইকবাল সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল ছিল। তাকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তিনি আমার অনুভূতির সাথে একমত হয়ে বললেন– 'একটা বিশেষ গ্রুপের ইন্ধনে জেলার সাহেব এসব অন্যায়-অবিচার করছেন।' সেই বিশেষ গ্রুপটি কারা, আমার জানতে বাকী রইল না। সে কারণে এ ব্যাপারে প্রশ্ন না করে জেলার সাহেবকে বলে কয়ে কিছুদিন আমাকে ১০ সেলে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম।

মোফাখখারুল ইসলামের পর নতুন ডিআইজি শ্রদ্ধেয় আজিজুল হক ভূঁইয়ার আগমন আমার জন্য আশীর্বাদের মত মনে হল। কারা অফিসারদের মধ্যে যে দু'জন সৎ ও বিবেকবান অফিসার রয়েছেন তারা হলেন সাবেক ডিআইজি কাজী আবদুল আউয়াল, যাকে ঢাকা কারাবাসের প্রথম দিনগুলোতে পেয়েছিলাম। অন্যজন হলেন নবাগত ডিআইজি জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া। এক সময় আমি তাঁকে কাছে পেয়ে বললাম– 'জেলার সাহেব আমাকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমার মন-মানসিকতা এ ডিভিশনে এডজাস্ট হয়েছে। অন্যত্র সরালে আমার বেশ কষ্ট হবে।' তিনি বললেন– 'কোথাও কাউকে সরানো হবে না, যে যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন।' জেলার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কারাবাসী আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তাদের সেই পুরোনো ফ্যাসীবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনেরপর ক্ষমতা অপব্যবহারকারী রাজনৈতিক সামাজিক অপরাধ, জুলুম ও হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা কারাগারে দারুণভাবে মানসিক বিপর্যস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলামের নেপথ্য সহযোগিতায় এই হতাশাগ্রস্ত আওয়ামী লীগাররা দারুণভাবে চাঙা হয়ে ওঠে। জেলের ভেতরেই তারা সংগঠিত হয়। এছাড়াও জেল কর্মচারীদের সাথে একটা বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করে। কারাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা পদদলিত করে স্বৈরাচারী কায়কারবার চালাতে থাকে। তথাকথিত দালাল আইনে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ইসলামপন্থীদের ওপর চড়াও

www.pathagar.com

হবার চেষ্টা করে।

ডিআইজি মোফাখখারুল ইসলাম সাহেবের একপেশে প্রশাসনিক শিথিলতায় আওয়ামী লীগাররা যেসব বাড়াবাড়ির পথ ধরে এগুতে থাকে, সেটাকে বাগে আনতে ডিআইজি আজিজুল হক ভূঁইয়াকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়। তার সময়েই বাজিতপুর হত্যা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে কারাগারে আওয়ামী লীগাররা অবস্থান ধর্মঘট করে। কয়েদীদের যথারীতি সন্ধ্যার পূর্বেই সেলে অথবা ওয়ার্ডে তালাবদ্ধ করে দেয়ার নিয়ম। সেদিন যথানিয়মে আমাদেরকে তালাবদ্ধ করা হলেও কোন আওয়ামী লীগারকে তালাবদ্ধ করা হয়নি। তারা একযোগে কারাগারের মুক্ত অঙ্গনে অবস্থান নিয়ে বাজিতপুর হত্যা মামলায় আসামীদের ফাঁসী মওকুফের দাবীতে শ্লোগান দিতে থাকে। কারা কর্তৃপক্ষ দারুণ সংকটে পড়ে। ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছেনা। এভাবে রাত্রি ১টা বাজে। ডিআইজি সাহেব তার কৌশল, ধী-শক্তি, ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটিয়ে ঘটনাকে আয়ত্তে আনেন। আওয়ামী লীগের একতরফা বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বাইরের সাহায্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে একটি উত্তপ্ত ও মারমুখী পরিস্থিতির উপসংহার টানতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগাররা তাদের সেলে যেতে বাধ্য হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সেদিন একটি রক্তাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা পায়। কারাবাসী আওয়ামী লীগারদের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। জনৈক ডেপুটি জেলার ছাত্রাবস্থায় ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন বলে স্বভাবতই বন্দী আওয়ামী লীগারদের সাথে ছিল তার নাড়ীর যোগ। তার মাধ্যমে ওরা কারাগারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, আমরা তফসীরের মাধ্যমে রাজনীতি করছি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছি, সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটাচ্ছি। তফসীর বন্ধ করা না হলে জাতীয় স্বার্থে তারা সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করবে। এর ফলে কারাগারে অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আওয়ামী লীগের কেউ দায়ী হবে না।

আওয়ামী লীগের ফ্যাসীবাদী উদ্ধত আচরণের আর একটি কারণ হল, পঁচাত্তরে আওয়ামী প্রশাসনের পতনের পর থেকে ক্রমশ কারামুক্তির ফলে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে গ্রেফতার হয়ে আওয়ামী সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

www.pathagar.com

আমাদের স্নায়ুযুদ্ধ ও কারাগার পরিস্থিতির উত্তাপ নিরসনের জন্য ডিআইজি সাহেব আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী কিছু লোককে ডেকে পাঠান।

আমাদের পক্ষ থেকে আমি ও এডভোকেট এবিএম আনোয়ার হোসেন (চাটখিল), আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাখাল ভট্টাচার্য, হোসেন সাহেব ও গোমেজ উপস্থিত হলাম। ওরা অভিযোগ করে যে, আমরা পুরোনো কায়দায় ইসলাম ও কোরআনকে টেনে এনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করছি।

আমরা বললাম– 'কারাগারের অফুরন্ত অবসরে আমরা অন্যায় অপকর্মে অর্থহীনভাবে সময়ের অপচয় না করে কোরআন চর্চা করছি। আর কোরআন চর্চা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা হয় তাহলে কারাগারের মধ্যে এ ধ্বংসযজ্ঞ চলবে। কারাগার থেকে বেরিয়েও তাই করতে থাকব।'

ডিআইজি সাহেব আওয়ামী লীগারদের উদ্দেশে বললেন– 'কোরআন চর্চা তো অপরাধ নয়, আপনারা নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করেন, কেউ বাধা দিবেনা। কেউ রাজনীতি করলে সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের, আপনাদের নয়। আপনাদের সবাইকে বলছি কেউ বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করলে এখান থেকে অন্যত্র পাঠাতে বাধ্য হব। এরপরে এ ধরনের কোন অভিযোগ শুনতে আমি নারাজ।'

রাখাল ভট্টাচার্য, যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে কারাগারে কোরআন চর্চা বন্ধ করার প্রধান উদ্যোক্তা এবং মুসলমান কয়েদীদের মগজে ঘুন ধরানোর ব্যাপারে সক্রিয়, সেই রাখাল বাবু একটি মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার ছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে কোন হিন্দুর বাংলাদেশে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। কালামে পাকের অনেক সূরা অর্থসহ তার জানা। নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি ছিল তার নখদর্পণে। একাত্তরে তিনি বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়িয়েছেন। এমনকি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদে তিনি ইমামতি করেছেন বলেও তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার অনেক আগে থেকে তিনি হিন্দুস্তানের স্বপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে 'লরেন্স অব এরাবিয়ার' মত বাংলাদেশের মুসলমানদের মগজে ঘুন ধরিয়েছেন। ভাল মানুষগুলোকে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের শত্রু চিহ্নিত করে হত্যা করিয়েছেন। এ দেশের তথ্য হিন্দুস্তানে পাচার করেছেন। তার মুসলিম-বিদ্বেষী জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি কারাগারের অভ্যন্তরেও। এখানে মুসলমান অবুঝ তরুণদেরকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

আমি একদিন আমার সেলে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা উত্তেজিত কণ্ঠ আমার কানে এল। বলতে শুনলাম– 'আমরা একাত্তরের আলবদর, রাজাকার আর শান্তি কমিটির লোকদের ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। সামনের দিনগুলোতে আমরা আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। বঙ্গবন্ধু এদের জেলে পাঠিয়ে রক্ষা করেছেন। ওরা জেলখানাকে ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত করেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, কি দুঃসাহস। একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ওরা জেলখানায় বীজ বপন করছে। ওদের ক্ষমা করা আর ঠিক হবে না।'

আমি সেল প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, আমাকে দেখে রাখাল বাবু বিব্রত। বললাম– 'রাখাল বাবু, কি বললেন আবার বলুন। আপনাদের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিলেন আপনারাই। আপনাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী আপনাদের সংকীর্ণ হিন্দুবাদ। যা মুসলমানদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। গোটা জাতি আপনাদের সেই চক্রান্তের চেতনা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। আপনাদের পাশে এখন খুনী লুটেরা আর ক্রিমিনাল ছাড়া কেউ নেই। তারা চায় আপনাদের তথাকথিত চেতনাকে তাদের কৃত-কর্ম আর অপরাধগুলোর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে। মুসলমানদের কানে কানে বিষ ঢালার পুরোনো প্রবণতা এখনও আপনার মধ্যে রয়ে গেছে। অভ্যাস পরিবর্তন করুন। আমার কানে দ্বিতীয়বার যেন না আসে। শুধু এটুকু জানিয়ে দিতে চাই, এটা একাত্তর নয় ছিয়াত্তর। একাত্তরের অন্ধ তরুণ, যাদের দিয়ে জঘন্যতম কাজ করিয়েছেন তাদের বিরাট অংশ এখন আমার পাশে।' কাছে দাঁড়িয়েছিল জমাদার ও সিপাই। বললাম– 'এই ক্রিমিনালটাকে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বলুন। এই জঘন্য মনোবৃত্তির লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছিনা।' ডিউটি জমাদার কিছু বলার আগে রাখাল বাবু মাথা নীচু করে সরে গেলেন।

www.pathagar.com

পাঁচ

একদিন দেখলাম ঢাকা বেতার নিঃশব্দ। আশঙ্কা হল, একটা কিছু ঘটেছে। মনে হল পঁচাত্তরের ঐতিহাসিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। দোয়া করতে থাকলাম। আমাদের অন্যান্য ভাইদের দোয়া করতে বললাম। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন জাতীয় জীবনে একটা ঊষালগ্ন বলে মনে হয়েছিল। এই বিপ্লব একটা সূর্যোদয় ঘটাতে না পারলেও অমানিশার অন্ধকার বিদূরিত করে সুবেহ সাদিকের আবছা আলোর আভা আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই জাহেলিয়াত। আবার সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আবার সেই হিন্দুবাদের প্রাধান্য। খবর পেলাম খালেদ মোশাররফের মা, ভাই, মতিয়া চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করেছে। এতে আরও নিশ্চিত হলাম যে প্রতি-বিপ্লব শক্তভাবেই এগুচ্ছে। পঁচাত্তরের পরিবর্তিত চেতনাকে রুশ-ভারত অক্ষশক্তি বেশী দূর এগুতে দিবে না। আমার এ ধারণা ছিল অনেক আগে থেকে। মীর কাশিমের অনুতপ্ত অনুভূতির প্রতি যেমন ক্লাইভের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, হিন্দুস্তানের ক্ষুধার্ত আগ্রাসী জঠরে অবস্থান করে তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার আকুলতাকে দিল্লী যে কোন মূল্যের বিনিময়ে প্রতিহত করবে এটাই তো স্বাভাবিক। স্বাধীনচেতা মীর কাশিমকে ক্লাইভ বাংলার মসনদে বসে কাজ করার সুযোগ দিবে না। এই নির্মম বাস্তবতা ও ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে থাকা সত্ত্বেও, প্রতি বিপ্লবের পদধ্বনি শুনে ভাগ্যহত জাতির জন্য দারুণ ব্যথা অনুভব করি। রাত্রে ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম নেই। এক ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণা ও অনাহুত অস্থিরতা অনুভব করি। শেষরাত্রে বেশ কিছু গুলীর শব্দ কানে এলো, লক্ষ্য করলাম সেন্ট্রিদের অস্থির পদচারণা। ভাবলাম বাইরে কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছাকাছি প্রতিবিপ্লবের ঢেউ এসে আছাড় খেল। কোন মুসলমান কোনদিন কোন অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হতে পারে না। এমন একটা হাদীসের কথা মনে হতেই দোয়া করলাম। প্রাণ ভরে দোয়া করলাম আল্লাহর কাছে। অসহায় এই জাতির জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করলাম। আমার চিন্তা-চেতনা দুলছে। পেণ্ডুলামের মত দুলছে আশা নৈরাশ্যের মাঝখানে। আমি এই ভেবে আশ্বস্ত যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক আমরা নই। পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই। যখন ছিল তখন

www.pathagar.com

আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু কাজে লাগিয়েছিলাম। এখন আমরা দৃশ্যপটের বাইরে। আমরা বাইরের পর্যবেক্ষক মাত্র। তাছাড়া আমাদের সংগ্রাম, আমাদের কোরবানী যদি আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করবেন সবকিছু।

সকাল হল, সেলের দরজা বন্ধ তখনও। সকাল ৮টা নাগাদ প্রতিদিন সেল প্রকোষ্ঠে নাস্তা পৌঁছে যায় যথানিয়মে। আজ ব্যতিক্রম। ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে গেল। ১১টা নাগাদ দরজা খোলা হল। ক্ষুধা, ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় অস্থির আমরা সকলে। সেল থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে শুনলাম বাইরে থেকে সেনাবাহিনীর লোকজন এসে আওয়ামী লীগের ৪ জন নেতাকে হত্যা করেছে। বুঝলাম গতরাতে গুলীর শব্দ বাইরের নয় ভেতরের। ঐ গুলীগুলোতেই কারা প্রকোষ্ঠে চারজন আওয়ামী লীগ নেতার বুক বিদীর্ণ হয়েছে। দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে কারাগারের অসহায় মানুষকে বিনা বিচারে হত্যার প্রবণতা কোনদিনই শুভ হয় না। এটা অমানবিক বর্বরতা। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে আমরা ঠেকাব কি দিয়ে। একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বালির বাঁধকে ভেঙ্গে দিতে পারে। আশ্চর্য হলাম দুশ' বছর পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখে। মোহম্মদী বেগরা অপঘাতে মরবে এটাইতো স্বাভাবিক।

দুপুরের খাবার পেলাম। সকালের খাবার থেকে সবাই মাহরুম হয়েছে। কারাগারে সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এসেছিল। খাবার আয়োজন হয়নি, খাবার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম সকলে। সবার চোখে মুখে আতঙ্ক। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের বন্দীরা তাদের চার নেতার মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছে। তাছাড়া বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বুঝতে পারছেনা কেউ। কারো মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক চাওনি সবার। সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতির গভীরতাকে নিরূপণের চেষ্টা করছে। বিকেল নাগাদ দেখলাম আওয়ামী লীগারদের চোখ-চাওনিতে আগের মত আর আতঙ্কের ছাপ নেই। মুখমণ্ডলের বিমর্ষতা দূর হয়ে অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওরা আমাদের জন্য পরিস্থিতির ব্যারোমিটার। ঠিক তেমনি ওদের জন্যও ছিলাম আমরা। তবে আমাদের চাইতে ওদের বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশী। বুঝলাম সময়ের স্রোত তাদের সপক্ষে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা আমাদের মধ্যে ফিস ফিস করে আলাপ করছি। সামগ্রিক বিচারে পরিস্থিতিকে কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দেখলাম প্রতিপক্ষের উল্লাস ক্রমশঃ বাড়তে আছে। বিক্ষিপ্ত আর কেউ নেই, দলে দলে পদচারণ আর বৈঠক, এদিক সেদিক ইতস্ততভাবে চলছে।

www.pathagar.com

আমার মন মানসিকতায় এই নিম্নচাপ যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হল। ইচ্ছে হল পঁচাত্তরের পরিবর্তিত অবস্থা ধরে রাখার জন্য আমি সচেতন সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবিপ্লবকে প্রতিহত করি। কিন্তু আমার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষা লোহার গরাদে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এল। বুঝলাম আমি নিরুপায়। আমি একজন বন্দী।

এ রাতও অস্থিরতার মধ্যে কাটল। সকালে সেলের দরজা খোলার পর জানান হল, আমাকে এ সেল ডিভিশন ছাড়তে হবে। ওদের ভাষার মধ্যে শালীনতা ও সাবলীলতা নেই। সার্জেন্ট নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আওয়ামী লীগের ভেতর-বাহির সব চ্যানেলের সাথে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। দিনের শুরুটা ভাল লাগল না মোটেও। এই ঘটনা অশুভ সংকেত বলে মনে হল। বাদ প্রতিবাদ না করে আমি তৈরী হলাম। এবার আমি ফাঁসীর সেলে। ফাঁসী হোক আর নাই হোক সার্জেন্টের এই কাজ, আমাদের প্রতি তার ভয়ঙ্কর জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ। ফাঁসীর সেলে আটক রেখে আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে এক বর্বরোচিত আনন্দ চেখে চেখে উপভোগ করতে চান তিনি। তার ভাবখানা যেন এই– এবার তোমাকে ফাঁসীর সেল থেকে বাঁচাবে কে? তার মুখেই জানতে পারি– খালেদ মোশাররফ এখন ক্ষমতায়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা পলাতক। ভাবলাম ভাগ্যহত জাতিটা আবার অসহায় হয়ে পড়ল। ফাঁসীর সেলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বিচলিত হইনি মোটেও। কেননা আমি জানি জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। এমনি ফাঁসীর সেলে বসেই বিপ্লবী নেতা মওলানা মওদূদী ফাঁসীর রায় শুনেও ছিলেন নির্বিকার। দ্বিধাহীন চিত্তে বই লিখে গেছেন সেল প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র পরিসরে। ক্ষমা চাননি কারো কাছে। বলেছেন– 'উপরের ফায়সালা না হলে কেউ আমাকে ফাঁসী দিতে সক্ষম হবে না।'

এক দিন কাটল ফাঁসীর সেলে। আমি একা। মানসিক ভীতি অথবা অজানা আশঙ্কায় মনে কোন দুর্বলতার সঞ্চার হয়নি তবে একাকীত্ব আমার দারুণ খারাপ লাগছিল। আমাদের ভাইদের থেকে দূরে অবস্থান করে অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। একটা দিন কোন মতে কাটল। পরদিনও একইভাবে পার হল। নামাজ কালাম তসবীহ তাহলীল করে অধিকাংশ সময় আমার কাটছে। রাত্রে ঘুম, নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন। দুটো দিন অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার আকস্মিক গুলীর শব্দ। গুলী চলছে। অবিরাম গুলীর শব্দ। 'মিয়া সাহেব মিয়া সাহেব' বলে ডাকলাম সেন্ট্রীকে। জেলের পরিভাষায় সেন্ট্রীদের মিয়া সাহেব বলা হয়ে থাকে। তিনি আসলেন। দেখলাম– বেশী বয়সী একজন বিহারী পুলিশ। তার সাথে আমার

www.pathagar.com

কথাবার্তা আগে থেকে হত। জিজ্ঞেস করলাম– 'কি হয়েছে?' তিনি বললেন– 'দোয়া করেন সাহেব। বাইরে গণ্ডগোল চলছে।' তবে এর বেশী তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

রাত্রি ভোর হল। সকাল হল স্বাভাবিক নিয়মে। সেন্ট্রীদের মাধ্যমে বিকেল নাগাদ খবর পেলাম– খালেদ মোশররফের পতন হয়েছে। সিপাহী জনতা জেনারেল জিয়াকে আটকাবস্থা থেকে বের করে এনেছে। মোশতাক এখন আর প্রেসিডেন্ট নন, তিনি বিবৃতি দিয়ে সরে গেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করেছেন। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণকারী তরুণ সেনানায়করা দেশের মাটিতে আর নেই। দারুণভাবে দুঃখ পেলাম। মনে হল সেই জানবাজদের কাছে জাতির অনেক পাবার ছিল। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ ছিল বলেই তারা চূড়ান্ত কোরবানীর প্রস্তুতি নিয়ে মুজিবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের তত্ত্বাবধানে তিন মাসের বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের বাংলাদেশ। তাদের সদিচ্ছা তাদের প্রাণের স্পর্শের সাথে কারো তুলনা করা যাবে না। জিয়ার ক্ষমতারোহণ, এতে খুশী হওয়ার কিছু নেই। কেননা দেশের পট পরিবর্তনে তার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পরিস্থিতির সুফলটা তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমার মনে হয়েছিল পঁচাত্তরের চেতনা তার মধ্যে নেই বলে ক্ষমতায় আট ঘাট হয়ে বসবার চিন্তা-চেতনা দ্বারাই তিনি চালিত হবেন। অর্থাৎ আদর্শ নয়, ঐতিহ্য নয়, জাতি নয়, দেশ নয় তার কর্মের কেন্দ্রবিন্দু মসনদ। ফাঁসীর সেলে বসে জিয়া সম্বন্ধে আমার যে ধারণার উন্মেষ হয় জিয়া তার শাসন কালের প্রতিটি কর্মে অনুরূপ স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমতঃ পঁচাত্তরের নায়কদের বাংলাদেশে আসতে দেননি। আসলেও তাদেরকে জুলুম নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে তিনি নিজেই মসনদে সমাসীন হয়েছেন। তৃতীয়তঃ বিমান বাহিনী প্রধান এমজি তোয়াবকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন। কেননা এ দেশটাকে ইসলামী দেশে পরিণত করার আকাঙ্খা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তার সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছেন। ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন বিমান বাহিনী অফিসারদের হত্যা করিয়েছেন। শত শত তরুণ সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। শত শত সৈনিককে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছেন। রাজনীতিকদেরকে তেজারতের মালে পরিণত করেছেন। তার শাসনামলে রাজনীতিকদের কেনা-বেচা

www.pathagar.com

শুরু হয়। তিনিই সেনাবাহিনীকে রাজনীতির মোহে আবিষ্ট করেছেন। তার ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে ভাঙনের দিকে নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহর ছত্রছায়ায় তিনি ইসলামী চেতনাকে নস্যাৎ করার সুযোগ করে দেন। কর্ণেল নাসেরের মত একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার লক্ষ্যে তার সমস্ত কাজ আবর্তিত হতে থাকে। সরকারী ব্যয়ে তরুণদেরকে তার রাজনীতির মুখাপেক্ষী করে তোলেন। সবচেয়ে বড় কথা এ দেশটার স্বকীয় সত্তার বিকাশ না ঘটিয়ে আমেরিকা ও রুশ-ভারত অক্ষশক্তির চারণভূমিতে পরিণত করেন।

দুঃসাহসিক নওজোয়ানেরা যুগের মীরজাফরকে হত্যা করে মীর কাশিমকে মসনদে বসায়। অর্থাৎ মুজিবের পর প্রেসিডেন্ট হন খন্দকার মোশতাক। মীরজাফরের সহযোগী হিসেবে তার অতীত গুনাহের কাফফারা আদায়ের জন্য তার উচিত ছিল গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া। তা না করে তিনি কেবল পুরোনো পাঁকে পুরোনো চক্রের আবর্তে খাবি খেয়েছেন। গোটা জাতিকে একটা ইস্যুর ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থই বা বলি কেন? জাতিকে তার সত্তার মূল স্রোতধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করেননি। হালকা কিছু সংস্কারের প্রলেপ দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু এতে গোটা জাতির রোগ নিরাময় হল না। একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত রোগভোগের পর জাতির জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা না হওয়াতে রোগ জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। এর ফল– মাত্র তিন মাসের মধ্যেই মোশতাক সরকারের পতন।

বিপ্লবোত্তর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক রাজনীতিকদের দ্বিতীয় ঠিকানা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সেল প্রকোষ্ঠে ঠাঁই পেলেন। এই কারাগার তখন আওয়ামী বাকশালী ও বামপন্থীতে পরিপূর্ণ। ইসলামপন্থীদের সংখ্যা ক্রমশ কমতির দিকে। আওয়ামী বাকশালী ও বামপন্থীদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকা সন্ত্রাসী প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে আমি, শফিউল আলম প্রধান এবং আরও অনেকে মিলে আওয়ামী বাকশাল বিরোধী একটি মোর্চা গঠন করি। এই অবস্থার মধ্যে খন্দকার মোশতাক সাহেব কারাগারে প্রবেশ করলেন।

২৬. সেল ডিভিশনে তার প্রবেশকে বলা যায়– রোস্ট হবার জন্য একটা মোরগ যেন রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাত্র তিন মাস আগে এই আওয়ামী বাকশালীদের উৎখাত করে এদের নেতাদের লাশের ওপর খন্দকার মোশতাক

www.pathagar.com

সাধের সোনার বাংলার মসনদে আসীন হন। তাছাড়া মাত্র কয়দিন আগে তাদের ৪ নেতাকে হত্যা করা হয়। এর জন্যও তারা মনে করে মোশতাক স্বয়ং এটা করিয়েছেন। আজকে সেই মোশতাক তাদের হাতের মুঠোয়। দুশ্চিন্তার দুঃসহ গুরুভার নিয়ে মোশতাক কারা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। সার্বক্ষণিক ভীতি ও আশঙ্কা নিয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকলেন। তাছাড়া বাকশালীদের ভয়ঙ্কর উক্তি ও প্রতিশোধস্পৃহা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। আমরা মোশতাক সাহেবের অবস্থা আঁচ করতে পারলাম। ওদিকে মোশতাক সাহেবের ভাগ্নে কাজী বারী ভাই তার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের জানালেন যে, তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে কি করা যায় আপাতত ভাবতে লাগলাম। শফিউল আলম প্রধান তার গ্রুপ থেকে শক্তিশালী দু'জনকে সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ঘোষণা দিলাম– মোশতাক সাহেবের ওপর কেউ আঘাত হানার চেষ্টা করলে কারাগার কারবালায় পরিণত হবে।

মোশতাক সাহেব প্রায়ই কাজী বারীর সেলে তার সাথে দেখা করতে আসতেন। একদিন কাজী বারী আমার সেলে থাকায় তিনি আমার সেলে এসে উপস্থিত হলেন। আমার সাথে বারী ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন– 'আমিনকে ছোট থেকেই জানি। প্রথম দিকে আমাদের সাথে কাজ করলেও '৬৯ সাল নাগাদ ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগ দেন। তারপর একাত্তরে আমরা ছিলাম দুই বিপরীত মেরুতে। এখন আবার বাস করছি এক জায়গায়।'

আমি বললাম– 'মুজিবের আইনের ফাঁদে আটকে আমাকে ৪০ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।'

মোশতাক সাহেব বললেন– 'আমি কালাকানুন ঘোষণা দিয়ে ওই সবগুলো বাতিল করে দিয়েছি।' বললাম– 'কিন্তু আমাদের কারাদণ্ড বাতিল হয়নি। আপনি কালাকানুন ঘোষণা দিয়েই খালাস। কিন্তু আওয়ামী চক্র তো প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে আছে। তারা আমাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করবে কেন?'

খন্দকার মোশতাক স্বল্পভাষী, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। মাত্র কয়টা দিন আগে জাতির সর্বোচ্চ আসনে থেকে কত অজস্র সম্মান কুড়িয়েছেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আজকে কয়েদীদের সাথে কারাবাস করছেন। তার ইঙ্গিতে কত

www.pathagar.com

অজস্র মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আজকে তিনি সেই কারাগারে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। তাকালাম তার দিকে। তার চোখ আর চাওনিতে নৈরাজ্যের অন্ধকার। মনে পড়ল নজরুলের সেই মরমী সঙ্গীত–

নদীর এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে
এই তো নদীর খেলা
সকাল বেলা আমীর রে ভাই
ফকীর সন্ধ্যা বেলা।

অবশ্য তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম– 'আমরা রয়েছি আপনার পাশে। আমাদের লাশের ওপর দিয়ে ওরা আপনার ওপর চড়াও হতে পারবে তার আগে নয়। আমরা আপনার ব্যাপারে সতর্ক। শাদ্দাদের স্বপ্ন আপনি ভেঙে চূরমার করেছেন। জাতিকে এর চেয়ে বড় উপহার দেয়ার কি ছিল? কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আমরা দোয়া করেছি আপনার জন্য, যারা আপনার পাশে ছিল তাদের জন্য। আল্লাহ নিশ্চয় তার রাস্তায় চলা মজলুমের দোয়া ফিরিয়ে দেন না।'

ঈদ সমাগত। আত্মীয় পরিজন দূরে রেখে কারাগারে ঈদের আবেদন খুব একটা আমাদের কাছে নেই। এই ঈদ আমাদের কাছে যত মলিন বিবর্ণ হোক, যত মহররমের মত বেদনা বিধৃত হোক, তবু ঈদ তো। বছরের এই একটি দিন, বছরান্তে এই দিন জীবনে আর ঘুরে নাও আসতে পারে। কবি রবীন্দ্রের ভাষায়– 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?' যে দিন যায় তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই এই কারা প্রকোষ্ঠে ঈদ উদযাপনের আয়োজন চলল। আয়োজন চলল আওয়ামী বাকশালী শিবিরে, সে আয়োজন ঈদ উদযাপনের নয়, খন্দকার মোশতাককে ঈদের জামায়াতে হত্যার আয়োজন। খবর আমাদের কানেও এল। কারা কর্তৃপক্ষের কানেও গেল। খন্দকার মোশতাকের জানতে বাকী রইল না। আমি মনে করলাম, এ সময় খন্দকার মোশতাককে সাহস যোগান দরকার। আমি একাই তার সাথে দেখা করতে চললাম। সামনে দিয়ে গেলে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙাতে হবে। আমি সেসব এড়িয়ে, পেছন দিক দিয়ে তার জানালার সামনে দাঁড়াতেই তিনি জানালার কাছে এগিয়ে এলেন। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। সে কান্না শিশুদের কান্নার মত। বুঝলাম, ঘাবড়ে গেছেন তিনি। আমাকে বললেন– ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।' বললাম– 'অসম্ভব। হকের দীপশিখাকে বাতিলেরা সম্মিলিতভাবে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ এ

www.pathagar.com

দীপশিখাকে আরও প্রজ্জ্বলিত আরও উদ্দীপ্ত করে তোলেন। আপনি নির্ভয়ে থাকুন। ওরা আপনার কিছু করতে পারবে না। এছাড়া আপনার ব্যাপারে আমরা সতর্ক। আমরা প্রত্যেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

কারা কর্তৃপক্ষ পর দিন ঈদের জামায়াতে শামিল হতে তাকে নিষেধ করেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে। কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত সঠিকই বলতে হয়। যদি মোশতাক সাহেব জামায়াতে যেতেন, আর তার উপর যদি হামলা পরিচালিত হত, তাহলে সম্ভবতঃ ঈদের মাঠ রণাঙ্গনে পরিণত হত। কারাগারে প্রাণহানি ও রক্তপাতের খবর ব্যানার হেডিং হয়ে পৃথিবীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হত। আল্লাহ সে অবস্থা থেকে কারাগারকে সেদিন বাঁচিয়েছেন। যাই হোক, যতদিন খন্দকার মোশতাক সাহেব কারাগারে ছিলেন আমরা তার নিরাপত্তার জন্য চোখে চোখে রেখেছি।

ছয়

খবর পেলাম কয়েক জন ভদ্রলোক আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। আমি তড়িঘড়ি ভিজিটিং রুমে এলাম। এসে দেখলাম কেউ নেই। গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম প্যান্ট-শার্ট পড়া নাদুসনুদুস ভদ্রলোক তার পারিষদবর্গ নিয়ে লোহার গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। সালাম দিলাম। জবাবও পেলাম। তার সাথে অতিরিক্ত পেলাম মিষ্টি হাসির তোহফা। অর্ধযুগ পর অতি পরিচিত, অতি চেনা, অতি পুরানো স্নেহ আর মমতা মিশ্রিত এ হাসি আমার অন্তরের গভীরে নাড়া দিল। আমার রাহবার, আমার পথ প্রদর্শক, আমার নেতা যেন দিগ্বীজয় করে ফিরে এসেছেন। ঊনসত্তরের প্রথমার্ধে ভৈরব রেলওয়ে কলোনীতে ইসলামী ছাত্রসংঘের একটি ঘরোয়া বৈঠকে আমি আমন্ত্রিত। যদিও আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। সেখানে আশরাফ ভাই বক্তৃতা করলেন। অনেক জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। নতুনত্বের সন্ধান পেলাম আমি। গড্ডালিকা প্রবাহে আর নয়, স্রোতের বিপরীতে চলবার শপথ নিলাম। আমার তারুণ্য তওহীদের পথে এগিয়ে চলার আগ্রহে তীব্র হয়ে উঠল।

কৈশোরের তারুণ্য আর অবুঝ অন্ধতায় ছিলাম ছাত্রলীগে, দুর্নিবার আঠারোতে ছাত্র

www.pathagar.com

ইউনিয়নে। তারপর নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা নিয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে একাকার হলাম। আশরাফ ভায়ের সাথে মাসে মাসে দেখা হত। দ্রুত সাংগঠনিক পথ পরিক্রমায় আমি এগিয়ে চলছি। নিত্য নতুন দায়িত্ব এসে পড়ছে। অবশেষে একাত্তরে আলবদর। তখন আশরাফ ভাইয়ের সাথে দেখা হতো না কিন্তু তিনি গাইড করতেন টেলিফোনে। তার পর বিপর্যয়। ঝড়ের পাখির মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সকলে। পল থেকে প্রহর, প্রহর থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছর থেকে যুগের অর্ধেক পেরিয়ে আজ আমার নেতা আবার আমার সম্মুখে।

আশরাফ ভাই কথা পাড়লেন। একাত্তরের পতনের পর কিভাবে কোলকাতায় গেলেন ও ভারতের মুসলমানদের তখন কি দুঃসহ মানসিক অবস্থা– তিনি একে একে বলতে থাকলেন। তিনি বললেন– আমাদেরকে যখন বাংলাদেশে বিশ্বাসঘাতক আর দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে ঘরে ঘরে তল্লাসী করে খুঁজছে, যখন এদেশে আমাদের ভাইয়ের হাতে আমাদের বুক বিদীর্ণ হচ্ছে, তখন হিন্দুস্তানের হিন্দুদের গৃহে জ্বলছে দেয়ালী আর মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলছে মাতম আর মর্সিয়া। আমি নিজের দেশ নিজের ভূখণ্ড ছেড়ে যখন কোলকাতায় উপস্থিত হলাম, মুসলমানরা তখন আমাকে সাগ্রহে আগলে রাখল। দেখলাম কি অপরিসীম তাদের দরদ।

পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দুস্তানী সৈনিকদের পদচারণায় তারা কি নিদারুণ আহত। শেষ পর্যন্ত কোলকাতায় আমার দ্বীনি ভায়েরা অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাখতে পারলেন না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন পিছু লেগেছে। ওখানে প্রত্যেকটি মুসলমানের পেছনে গোয়েন্দা। যেন রুশ-ভারতের নীলনক্সা মত আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের দ্বারা নির্যাতিত মজলুম মুসলমানদেরকে আশ্রয় না দিতে পারে। কোলকাতার মুসলিম ভায়েরা আমাদেরকে তাদের আশ্রয়ে রাখতে পারলেন না। আমার নিরাপত্তার জন্য আমাকে দিল্লী যেতে হল। সেসব আয়োজন উদ্যোগ কোলকাতার মুসলমান ভায়েরা করলেন। দিল্লীর মুসলমান ভায়েরাও আমাকে সাদরে আগলে রাখলেন। এখানেও একই রকম গোয়েন্দা তৎপরতা। এবার বোম্বে এলাম। দিল্লীর ভায়েরা বোম্বে পর্যন্ত আসার এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এখানেও থাকলাম অনেক দিন। গোয়েন্দারা তৎপর এখানেও। তারপর চোরা পথে দুবাই গেলাম, সেখান থেকে পাকিস্তান। সেখানে আলবদর দেখার জন্য শত শত মানুষের ভিড় জমে গেল। প্রত্যেকদিন আমি মওলানা মওদূদীর বৈকালিক অধিবেশনে তার সাহচর্য থেকে কিছু সংগ্রহ করার জন্য বসতাম। আমাকে পেয়ে

www.pathagar.com

মওলানা দারুণ খুশী। বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থা আমার কাছ থেকে শুনলেন আর দোয়া করলেন আমাদের অগণিত নির্যাতিত মানুষদের জন্য।'

আশরাফ ভাই বলে চলেছেন– 'নিজের দেশ, নিজের মাটি, আমাদের জন্য বেগানা হলেও দুনিয়ার মুসলমানরা আমাদের এই ত্যাগ এই কোরবানীকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছেন। গ্রহণ করেছেন ইসলামের সাম্প্রতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে। দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের ত্যাগ বিফলে যাবে না কোনদিন। আমি আপনাদের সবার খবর রাখার চেষ্টা করেছি। আপনি কারাগারের নিভৃত সেলে থেকেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কী করেছেন তা আমার অজানা ছিল না। এদেশে আসার আগে আমি নিয়ত করেছিলাম দেশের মাটিতে পা দিয়েই আমি আপনার সাথে দেখা করব। আমি কোথাও না গিয়ে সরাসরি আপনার সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছি।'

তার কথা শুনে মনে হল যদিও আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিসঙ্গ, কিন্তু একা নই। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমার আপনজন। যাদের কল্যাণ কামনা, যাদের আশীর্বাদ আমাকে বেষ্টন করে রয়েছে। তাদের দোয়ায় সম্ভবতঃ আমি বেঁচে আছি।

আমি বেশী কথা বললাম না। আমি যা বলব সবই আমার নেতার জানা। আমি স্রেফ একজন ধৈর্যশীল শ্রোতা হিসেবে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। সংগঠনের জন্য তার ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিসীম। বৃহত্তর মোমেনশাহীতে বিপ্লবের মশাল নিয়ে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-শহরতলীতে ছুটে বেড়িয়েছেন। তার সাহায্য না পেলে হয়তো আজও অন্ধকারের আবর্তে খাবি খেতাম। তিনিই আমাকে টেনে এনেছেন জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে। তাকে ভুলব না। ভোলা উচিতও না।

প্রাণের আবেগ দিয়ে আমার নেতা আশরাফ ভাই অনেক কিছু বললেন। বললেন সিন্দাবাদের মত তার দুঃসাহসিক সফরের ইতিবৃত্ত। তারপর বিদায় নিলেন। মন চাইল না ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি কারাগারের একজন বন্দী বই তো কিছু নই। আমার সম্মানিত মেহমানকে রাখার স্থান তো কারাগার নয়। তিনি চলে গেলেন। বিবর্ণ হাসি দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

তারপর একদিন শুনলাম আশরাফ ভাই আবার এসেছেন। আমি তার জন্য ভিজিটিং রুমের দিকে এগুতেই একজন আমাকে বললেন– 'আরে না ওদিকে নয়। ৪নং ওয়ার্ডের দিকে যান।' বুঝলাম আমার নেতা কারাবাসে। ৪নং ওয়ার্ডে গিয়ে

www.pathagar.com

দেখলাম আশরাফ ভাই বসে আছেন দুশ্চিন্তার দুঃসহ গুরুভার নিয়ে। আমাকে দেখেই একটু ম্লান হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি হেসে বললাম, 'আশরাফ ভাই, আমার প্রতি আপনার প্রাণের টান হয়তো বা আমার কাছে আপনাকে টেনে এনেছে। সবই আল্লাহর মেহেরবানী। আল্লাহর কোন ফায়সালার ওপর নারাজ হওয়া উচিত নয়।' জিজ্ঞাসা করলাম– 'আপনি এখানে এলেন কিভাবে?' তার মুখ থেকে জানলাম কোন এক রেস্টুরেন্টে চা খাওয়ার সময় একাত্তরে তার এলাকার কর্মরত একজন পুলিশ অফিসার তার প্রতি এই মেহেরবানী করেছে। তারই সৌজন্যে তিনি এখন কারাগারে। সাতাত্তরে এসেও একাত্তরের রেশ শেষ হয়নি। আশরাফ ভাই যাতে ভেঙে না পড়েন এ জন্য তার সঙ্গ দিতে থাকলাম। তাছাড়া কারাগারে আশরাফ ভাই থেকে আমি সিনিয়র এ জন্য দায়িত্বটা অনুভূত হল বেশী করে। তৃতীয় শ্রেণীর ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে তাকে হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা করলাম। সেখানেও তিনি বিব্রত বোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে এলাম আমার সেলে। এখানে তার জন্য আমার বিছানা ছেড়ে দিয়ে আমি নিচে থাকতাম। আমার নেতাকে সাথে পেয়ে আমার নিঃসঙ্গ সময়গুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। জেল থেকেই তিনি দুবাইয়ে ব্যারিস্টার কোরবান আলী সাহেব ও তার স্ত্রীকে চিঠি লেখেন। তার মুখেই শুনেছি, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রতিক্রিয়াশীল মহানুভবতায় পাকিস্তানে তার এবং কোরবান সাহেব-এর সংকটের কথা। তারপর দুবাইয়ে পাড়ি জমান। সেখানে কিভাবে সংকট উত্তরণের প্রয়াস নিয়েছেন, একে একে সবকিছু তিনি খুলে বললেন।

তারপর একদিন তিনি মুক্তি পেলেন। খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্তির দিগন্তে ডানা মেললেন। আমি রয়ে গেলাম সেই অন্ধ তমসায়। সেই নিবিড় তিমিরে। দিল্লী হনুজ দূরাস্ত। চল্লিশ বছর অনেক দূর।

দিনের বেলাটা কারাবাসী দ্বীনি ভাই ও অন্যান্য সংগঠন বহির্ভূত ভাইদের সাথে আলাপ আলোচনা তালিম তরবিয়ত ও খেলাধুলার মধ্যে সময় অতিবাহিত হলেও রাত্রির একান্ত একাকীত্ব মাঝেমাঝে আমাকে বিচলিত করে তোলে। অন্তহীন হাহাকার ঘিরে ধরে আমাকে। একটা কোমল অনুভূতি পাওয়ার আকুতি আমাকে কাতর করে তোলে। অন্তহীন প্রত্যাশা নিয়ে অধীর আগ্রহে যে মহিয়সী অপেক্ষা করেছেন তার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠি। মনে হয় কারাগারের গরাদ ভেঙে আমি ছুটে যাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে গেল। দেখতে দেখতে ৮টি বছর আমার জীবন থেকে খসে পড়ল। ৪০ বছরের দণ্ড প্রাপ্ত তাও চুরি ডাকাতি

www.pathagar.com

অন্যায় অপকর্মে নয়, ভাগ্যহত জাতির ইজ্জত ও আজাদী কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য আমাদেরই এই বুজদীল জাতির কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ধুঁকে মরছি। কাছে থেকেও আমার প্রিয়জন, একান্ত প্রিয়জন থেকে আমি কোটি যোজন দূরে। কতরাত আমি বিনিদ্র তার জন্য। মোমেনশাহী কারাগারে তাকে আমি দেখেছি, দেখেছি তার অশ্রুসজল চোখ। সেই ছবি সাজিয়ে রেখেছি হৃদয়ের একান্ত গভীরে। আমার অনুভূতি দিয়ে তাকে দেখি। রোজ দেখি। দেখি তার অশ্রুভেজা চোখ। তার স্নিগ্ধ মমতার চাওনি। তার কোমল হাতের স্পর্শ, তার আবেগ-জড়িত বাণী, আমাকে আজও বিহ্বল করে রেখেছে। তবু ইচ্ছে হয় আর একবার দেখি। আবার দেখি তাকে। মমতার মূর্ত প্রতীক সেই মহিয়সী কি আসবেনা এখানে এই কারাগারে, আমার একান্ত কাছাকাছি।

ঊনআশির প্রথম দিক, দিন তারিখ মনে নেই। খবর পেলাম ভিজিটিং রুমে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কিছু লোক অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা হল আমার সংগঠনের কেউ হবে হয়তো। জমাদারের কাছে নিয়ম মত একটা স্লিপ জমা দিয়ে ভিজিটিং রুমের দিকে রওয়ানা হলাম। ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। এক বিশীর্ণ মহিলা কাতর চোখ মেলে অধীর আগ্রহে চাতকের মত অপেক্ষা করছেন।

এই সেই মহিলা যার জন্য আমার উৎকর্ণ প্রতীক্ষা। এই মহিয়ষী মহিলাই আমার মা। মায়ের কাছে এগিয়ে গেলাম। সালাম দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। মাতার বিশীর্ণ হাত দিয়ে আমাকে নেড়ে চেড়ে দেখছে। মায়ের আগের সেই লাবণ্য নেই, রোগে শোকে চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে। চোখ দুটো কোঠরাগত। মা বললেন, 'বাবা এই বোধ হয় শেষ দেখা। আর দেখা হবে না।'

মার শরীর উত্তপ্ত। কথা বলতে পারছেন না, কাঁপছেন। মাকে বললাম– 'মাগো, তুমি আমার জন্য দোয়া করো। একমাত্র তোমার দোয়া আমাকে জুলুম-মুক্ত করতে পারবে। মা, দুনিয়ার যে যাই বলুক তোমাকে আবার জানাচ্ছি, আমি অন্যায় করিনি। কোন অপকর্মে জড়িত ছিলাম না, তুমি অন্তত বিশ্বাস করো। দোয়া করো ভবিষ্যতেও যেন আল্লাহর পথে থাকতে পারি।' মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। মাকে আমি বিরক্ত করতে চাইলাম না। যত দেরী হবে কষ্ট বাড়বে তার। আমার দেখার বড় সাধ ছিল। প্রাণ ভরে দেখে নিলাম। মার সাথে ছিল আমার খালাত ভাই আবদুল লতিফ, খন্দকার বজলুর রহমান, মামাত ভাই আবদুর রহমান দুটো বোন, ও ভাগ্নেরা। সবার সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ করে মার চিকিৎসা ভালভাবে করার জন্য উপদেশ দিলাম আর বললাম একটা ছবি তুলে নেয়ার জন্য। আমার

www.pathagar.com

মনে হল এ দেখাই শেষ দেখা। মাকে আর আমি পাব না।

মাকে পেয়ে যেমন আমি আনন্দিত হয়েছি। তার জীর্ণ শীর্ণ শারীরিক অবস্থা দেখে ততোধিক পেয়েছি কষ্ট। তবে কুদরতের ফায়সালা যা হবার তাই হবে; সেখানে আমাদের কোন হাত নেই, করণীয়ও কিছু নেই। ভাবনা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম।

তারপর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। ঊনআশির ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শেষ রাত্রে আমি দেখলাম দুঃস্বপ্ন। মা যেন মারা যাচ্ছেন। শ্বাসকষ্ট আর মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির, কোন কথা বলতে পারছেন না। আমি দেখছি ভয়ঙ্কর কষ্ট আমারও। কান্নায় ভেঙে পড়ছি নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু অস্থিরতা কমল না। উঠে পায়চারী করলাম। অযু করে নামাজ পড়লাম আর দোয়া করলাম মায়ের জন্য।

এরপর কয়েক দিন পর চাচা খন্দকার ইসমাঈল এলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। অনেক কিছু আলাপ করলেন। চাচা তার আলাপ আলোচনায় ভিন্ন কিছু হয়তো বা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি বুঝিনি অথবা বুঝার চেষ্টা করিনি।

আরও কয়েকদিন পর সংগঠনের কয়েকজন এলেন। এর মধ্যে ছিলেন জামায়াতের আবদুল খালেক মজুমদার, কামরুজ্জামান ভাই, শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহের, এনামুল হক, মোঃ ফারুক ও মালেক ভাইসহ ১০ জনের মত। এতজন এক সাথে তারা কোন দিনও সাক্ষাতের জন্য আসেননি। সকলকে এক সাথে দেখে সালাম বিনিময়ের পর আমি বললাম– 'আপনারা কেন এসেছেন আমি জানি। আমার মা মারা গেছেন তাই না? দিনটা ছিল শুক্রবার, যেদিন শেষ রাতে স্বপ্ন দেখি।' তারা অবাক হলেন, আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

মায়ের সাথে সাক্ষাতের পরই বুঝেছিলাম মা আর বাঁচবেন না। সেদিন থেকে মাকে হারানোর মত বিরাট একটা আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

মা নেই। এ বিরাট পৃথিবীতে আমার শেষ আশ্রয়টুকুও ব্যথার প্লাবনে ভেসে গেল। এখন আমি একা। নিতান্ত একা আমি। এই বেশ হল। পিছুটান আর রইল না। বিপ্লবীদের পিছুটান না থাকা ভাল।

প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজের পর নিয়মিত ব্যায়াম করার সময় দেখতাম লুঙ্গী আর

www.pathagar.com

পাঞ্জাবী পড়া একটা লোক মন্থর গতিতে একাকী ইতস্তত হাঁটছেন। সকালের হাওয়া গায়ে লাগানো হয়তো তার অভ্যাস। পরিচয় জেনেছিলাম– তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাঁদরেল নেতা কমরেড ফরহাদ। তার সাথে আলাপ আলোচনার ইচ্ছে আমার কম ছিল এমনটি নয়। তবে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা বিপরীত বলয়ে অবস্থান করছি সে কারণে কিভাবে তার সাথে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করব এ নিয়ে কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম!

সেদিন যখন ব্যায়াম সেরে শরীরটা ম্যাসেজ করছি তখন পাঞ্জাবী ও একটা দামী লুঙ্গীপড়া সেই ভদ্রলোক আমার কাছে এসে নিজেই প্রথমে কথা পাড়লেন। বললেন– 'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবেন।' আমি তক্ষুণি ফালতুকে বললাম এক গ্লাস পানি দিতে। পানি খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি কি বাইরেও ব্যায়াম করতেন?' বললাম– 'জ্বি করতাম। তাছাড়া আমি স্পোর্টসের সাথে জড়িত ছিলাম। এখানে একটু বেশী করার কারণ, অন্য কোন কাজও নেই। অতিরিক্ত ব্যায়াম করে শরীরের চাহিদা পুষিয়ে নিচ্ছি। তা না হলে ৪০ বছরের কারাবাসে এমনিতেই শরীর নেতিয়ে পড়বে।'

এর পর থেকে তার সাথে আমার সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা– দুটো বিপরীতমুখী অবস্থানে থেকেও কারাগারের নিঃসঙ্গতায় আমাকে তিনি কথাবার্তা বলার ও আলাপ আলোচনার সাথী হিসাবে পাবার ফলে তিনি আমার সাথে কথা বলতে ভালোবাসতেন। অথবা এও হতে পারে তার চিন্তা-চেতনা আমাতে প্রবাহিত করার জন্য আমাকে টার্গেট করেছেন।

তার সাথে আমার সব রকম আলাপ আলোচনার দ্বার খুলে গেল। প্রত্যেক দিন তার সাথে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আলাপ হত। তার সাথে মতান্তর, মত-বিরোধ হয়েছে। কিন্তু সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি কখনও। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি দুঃখ করে বলেন– 'আমরা এ জাতিটার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে গেলাম। আমরা ইসলাম বিরোধী, আমরা ধর্মদ্রোহী এমন একটা ধারণা মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। সে বিভ্রান্তি উপড়ে ফেলা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমরা শোষণ বঞ্চনার অবসানের জন্য সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা বলে থাকি, যা ইসলামেরও লক্ষ্য।'

www.pathagar.com

আমি বললাম– 'আপনাদের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গটাকে বাদ দিয়ে যদি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক না করে নিজেরাই বিশ্লেষণ করেন তাহলে এটাকি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেনা যে, আপনারা আপনাদের কর্মীদের ভেতরে ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিলোপ ঘটাতে চেয়েছেন? যাদের চিন্তাধারা আপনাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি সেই মার্ক্স, সেই লেনিন, যারা ধর্মকে আফিম বলেছেন, খোদার অস্তিত্ব মুছে ফেলার কথা বলেছেন। এ ছাড়াও যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মদদ নিয়ে ময়দানে নেমেছেন, তাদের হাত কোটি কোটি মুসলমানদের রক্তাক্ত করেছে। তাদের আগ্রাসী ভূমিকা মধ্য এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র দখলে রেখেছে এমন নয়, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করে দিয়েছে। এর ফলে যাদের মধ্যে একটুখানি ইসলামী চেতনা রয়েছে তারা কি করে আপনাদের সেই পুরানো ফাঁদে পা রাখবে?'

'তিনি একটু চুপ থেকে বললেন– 'এদেশের ইসলামপন্থীরা যেভাবে সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করে, যেভাবে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সমালোচনা করে, সেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও পুঁজিবাদের সমালোচনায় মুখর নয়। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা কি, ইসলামপন্থীরা শোষণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে?'

বললাম– 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সমালোচনা করেনা এমনটি নয়। তবে হাঁ, দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করলে আপনাদের দিকটা বেশী হবে। পুঁজিবাদ যে দেউলিয়া এটা অনেক আগে প্রমাণ হয়ে গেছে। অর্বাচীনের মত একটা মৃত লাশকে টানা-হেঁচড়া করে সময়ের অপচয় হয়তো তারা করতে চান না। তাছাড়া ধরুন, আপনার বাড়ীতে আগুন লেগে বেড়ার আগুনে মশারীও জ্বলছে, আপনি দেখছেন স্পষ্ট। আগুন আপনার কি ক্ষতি করতে পারে এটুকু বলার কি প্রয়োজন আছে? পুঁজিবাদের আঁচ প্রত্যেকের গায়ে লেগেছে আমরা সবাই জ্বলছি। কিন্তু আগুন নেভাতে সমাজতন্ত্র যে ভয়াবহ তুষারপাত ঘটাতে চাচ্ছে, সেখানেই বেঁধেছে গোল। পুঁজিবাদের আগুনে জ্বলে পুরে চিৎকার আহাজারি করার সুযোগ থাকলেও সমাজতন্ত্রের তুষারপাতে গোটা জাতি হিম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেশী। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, পুঁজিবাদের আলোচনা সমালোচনা করা এমনকি পুঁজিবাদকে উৎখাত করার পথ খোলা আছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অক্টোপাশে কোন জাতি আবদ্ধ হলে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন পথ নেই। সমাজতন্ত্রের সস্তা শ্লোগানে

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী রয়েছে বলে সমাজতন্ত্রের ভয়ঙ্কর দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরাকে ইসলামপন্থীরা তাদের দ্বীনী দায়িত্ব বলে মনে করেন।'

ফরহাদ সাহেব তখন বলেন– 'আমাদের কর্মীরা যেভাবে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার, যেভাবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সাথে একাকার হয়ে কাজ করছে, আপনি বলুন ইসলামপন্থীদের কাউকে কি আপনি তেমনভাবে দেখছেন?'

আমি বললাম– 'সব দলের কার্যক্রম ও স্ট্রাটেজী এক রকম হয় না। ইসলামপন্থীরা নৈতিক দিকটার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয় আপনাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইসলামপন্থীরা মনে করে কোন বৃহত্তর পরিবর্তন আনতে হলে, নৈতিক চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তারা তাদের বিশাল কর্মী বাহিনীকে নৈতিক দিক দিয়ে বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তারা যখন গণমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ময়দানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখনই তাদের ওপর এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। রুশ-ভারত এমনকি আমেরিকা এদেরকে সম্মিলিতভাবে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া ১৪শ' বছরের বংশ পরম্পরায় পেয়ে আসা পুঞ্জীভূত ধ্যান-ধারণা আর বস্তুবাদের সৃষ্ট সন্দেহবাদ ব্যক্তি-চেতনা থেকে নির্মূল করা চাট্টিখানি কথা নয়। এটা করতে ইসলামপন্থীদের দিনের পর দিন নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। ষাটের দশক থেকে আমরা দেখে আসছি মত ও পথের বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও যে একটি ব্যাপারে আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন তা হল– ইসলামপন্থীদের উৎখাত করতে হবে।'

ফরহাদ সাহেব বললেন– 'আপনি তো এ ব্যাপারে একমত যে, প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম জনকল্যাণের চাইতে গণ-বিরোধী অবদান রেখেছে বেশী।'

বললাম– 'জ্বি হাঁ, সম্পূর্ণ একমত। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনার বিরোধিতা আমি করছি না। এই ভাগ্যহত বিপর্যস্ত জাতির জন্য আপনাদের যে অনুভূতি ও বেদনাবোধ রয়েছে আমাদেরও একই অনুভূতি বিদ্যমান। পার্থক্য– আমরা সমস্যার গভীরে আঘাত হানতে চাই, আর আপনারা সেখানে মলমের প্রলেপ দিতে চান।'

ফরহাদ ভাই হেসে ফেললেন। বললেন– 'আপনি ধরেছেন ঠিক কিন্তু বললেন

www.pathagar.com

উল্টোটা। আসলে আমাদেরটা রেভ্যুলিউশন আপনাদেরটা এভ্যুলিউশন।'

বললাম– 'না মোটেও উল্টো বলিনি। ধরুন একটা রিক্সাওয়ালা আপনাদের ভাষায় বঞ্চিত শ্রেণী অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। তার ব্যক্তিমানসে বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনা কি নেই? আছে। আর আছে বলেই ৫ টাকার ভাড়া বাগে পেলে ১০ টাকা আদায় করে। কর্মের কর্তৃত্ব যদি তার হাতে আসে তাহলে শোষণ থেকে সমাজকে কি বাঁচাতে পারবেন? স্বার্থপরতা সহজাত, জন্ম থেকে মানুষ সেটা অর্জন করেছে। এই ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থকে নির্মূল করতে হলে তার জন্য আর এক স্বার্থের জোগান দিতে হবে। শুধু পরার্থপরতা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থের মূলে আঘাত হানা সম্ভব নয় কিছুতেই। একটা ব্যক্তি আবেগতাড়িত হয়ে দেশ, জাতি অথবা সামগ্রিক স্বার্থে জীবন দিতে পারে। কিন্তু সে লোক সামগ্রিক স্বার্থের লোক চক্ষুর আড়ালে কৃচ্ছ-সাধনায় নিমগ্ন হতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখতে পেরেছে। ধরুন, একটি লোক নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবু দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখেছে অবজ্ঞার চোখে। স্বার্থবাদী জৌলুসের সামনে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলছেন– 'আমি নিজ হাতে তার পুরস্কার দেব।' এই আশ্বাসই তার প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে রাখতে পারে। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখুন। বিরাট হস্তীবাহিনী এবং লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে আবরাহা বাহিনীর সৈনিকদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করার জন্য পরস্পরকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছিল, যাতে কেউ পালাতে না পারে। অপর পক্ষে ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য, যারা নিয়মিত সৈনিক নয়, যাদের রণ-সম্ভার, খাদ্য সম্ভারের প্রাচুর্যও ছিল না, তাদের শিবিরে কে আগে শহীদ হবে তার প্রতিযোগিতা চলছে। এটা সম্ভব হয়েছিল ব্যক্তি মানসে বৈপ্লবিক চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়ে। আর ও বিপ্লব এসেছিল তওহীদবাদ থেকে।'

আমি আরও বললাম– 'আপনার প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির মোকাবেলায় আমি অতি তুচ্ছ। থিউরি আর থিসিসের পাঁকে ফেলে আমাকে পরাজিত করার যথেষ্ট যোগ্যতা আপনার আছে। আমার শ্রদ্ধেয় ভাই হিসেবে আপনার প্রতি অনুরোধ মানুষের কাছে ধার করার আগে আপনার বাক্স হাতিয়ে দেখুন যে কি পরিমাণ সম্পদ আপনার রয়েছে।'

ফরহাদ ভায়ের সাথে আমার আলোচনা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে হতো। তিনি কান

www.pathagar.com

পেতে আমার কথাগুলো শুনতেন। আমি আলবদরের দায়িত্বশীল ছিলাম জেনেও, তথাকথিত স্বাধীনতা বিরোধী এবং ৪০ বছর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী জেনেও আমার প্রতি তার স্নেহ-মমতার কোন ঘাটতি দেখিনি। তার সাহচর্য আমার যেমন ভাল লাগত আমার সাহচর্য তিনিও তেমনি কামনা করতেন। তাকে আমি মওলানা মওদূদীর তফসীর দিয়েছি। তিনি পড়েছেন। দিয়েছি আরও অন্যান্য ইসলামী বই। তিনি ফিরিয়ে দেননি, পড়েছেন। তার মন-মানসিকতায় একটা ঝড় বইছে সেটা স্পষ্ট বুঝা যেত।

একদিন ফরহাদ ভাই দুপুর বেলা এলেন। হঠাৎ তার আগমনে বিস্মিত হলাম। তিনি নিজেই বললেন– 'আপনাকে একটা সুখবর দিতে এসেছি। খবরটা একটু আগে পেলাম। আপনার ভাবী জানিয়ে গেলেন আমার মুক্তির আয়োজন হয়ে গেছে, আজকেই সম্ভবতঃ কাগজ এসে পৌঁছে যাবে। এখন পর্যন্ত কাউকে এমনকি আমার সংগঠনেরও কাউকে আমি জানাইনি, খবরটা আপনাকেই প্রথম দিলাম।' বিকেলে আমাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন।

আমার কারাগারের সঙ্গী ও সহযোগী সাবেক এনএসএফ নেতা সৈয়দ নেসার নোমানী বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের স্পর্শ পেয়েও আমার কথা ভুলেননি। আমার মুক্তির জন্য এই একটি মাত্র ব্যক্তি যার চোখে ঘুম ছিল না। এমপি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আমার জন্য আবেদন রেখেছেন। নোমানী ভাই প্রায়ই কারাগারে এসে আমার সাথে দেখা করতেন। আমার ব্যাপারে কতটুকু এগিয়েছেন জানিয়ে যেতেন। অগ্রগতি তেমন করতে না পারলেও তিনি আশাবাদী। তার প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি প্রায় বলতেন– 'আমি আপনাকে মুক্ত করবই।'

সেদিন নোমানী ভাইকে আমি বললাম– 'মন্ত্রীদের সাথে আপনার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

নোমানী ভাই বললেন– 'যে কোন কাজ, তা যদি আপনার হয়, সাধ্যে কুলোলে আমি অবশ্য সেটা করব।'

বললাম– 'ডিআইজি, ভূইয়া সাহেবকে তো আপনি জানেন। আমাদের জন্য কিনা করেছেন। সম্ভব হলে তার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত। বেচারা ভারী সংকটে আছেন। আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনসমূহের কর্মীরা কারাগারে তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে। কারাগারে এখন বস্ত্রের দারুণ সংকট। ডিআইজি সাহেব অনেক চেষ্টা করেও ম্যানেজ করতে পারছেন না। আপনি বস্ত্রমন্ত্রী আলীম সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।'

নোমানী ভাই আমাকে বললেন– 'আমিতো সরাসরি এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে সুপার সাহেবের সাথে মন্ত্রীর সরাসরি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব।'

নোমানী ভাই তার কথা রেখেছিলেন। ডিআইজি সাহেবের সাথে আলীম সাহেবের সাক্ষাৎ হয় এবং সমস্যার আংশিক সমাধানও হয়েছিল। সাক্ষাতের পর ডিআইজি সাহেব আমাকে এসে বলেছিলেন– 'আলীম সাহেব আপনার কথা বলেছিলেন। কোন রকম নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন।' আলীম সাহেবের উক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করে বলেন– 'আমরা আমিনদের ভুলিনি। তাদের বের করে আনা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মন্ত্রীত্ব আমরা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু ক্ষমতা এখনও নাগালের বাইরে। এখনও অনেক কিছু আমরা করতে পারছি না। যাই হোক, এক দিন আমরা আমিনদের কারাগার থেকে বের করে আনবই।'

পঁচাত্তরের আগস্ট বিপ্লবের পর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক একাত্তরের দালাল আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনসমূহকে কালাকানুন বলে ঘোষণা দিলেও একটা বছর পেরিয়ে গেল অথচ তখনও সেসব আইনের আওতায় কারাগারে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ। বাইরেও এ নিয়ে কোন আন্দোলন গড়ে উঠছে না। এ ব্যাপারটা সংগঠনকে জানিয়েছি বহুবার। ছবরের নসিহত ছাড়া অন্য কোন জবাব তাদের কাছ থেকে পাইনি। কারাগারে আমিসহ হাজার হাজার মানুষের দুঃসহ দুর্দশা বাইরের মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আঁচ করতে পারবে না। আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। আমরা মরিয়া হয়ে উঠছি। নাড়া দিতে চেয়েছি মানবতাবাদী সংবেদনশীল মানুষগুলোর অন্তর। অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারা কর্তৃপক্ষকে পনের দিন আগে জানিয়ে দিয়েছি আমাদের দাবী, আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের এ সিদ্ধান্তের কথা সংগঠনকেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংগঠন এ ব্যাপারে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল না।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবীর জবাব না দিয়ে অনশন থেকে বিরত

www.pathagar.com

রাখার চেষ্টা করলেন যথেষ্ট। কিন্তু আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড়। নির্দিষ্ট দিনে আমার পরিকল্পনা মত কালাকানুনের আওতাভুক্ত শত শত মানুষ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন শুরু করল।

আগের দিন রাত্রে লোক মারফত জামায়াতে ইসলামীর সদর দফতরে এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনশন শুরু হলেও তাদের কোন প্রতিক্রিয়া অথবা অন্য কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। একদিন গেল, দু'দিন গেল, তা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় কোন খবর প্রকাশিত হল না। সমমনা রাজনৈতিক সংগঠন অথবা মানবাধিকার সংস্থাকে উচ্চকিত হতে দেখলাম না। বুঝলাম, আমাদের সংগঠন একটা কমপ্লেক্সে ভুগছে। তারা কারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেনি এমনকি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমসমূহের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়নি। দুঃখ হল তাদের সংবেদনশীলতা ও সমমর্মিতার অভাব দেখে, তাদের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষমার অযোগ্য মনে হল। রাজনীতিকদের তথাকথিত অনশনের ভনিতা নয়, দুদিনের সত্যিকার অনশনে আমাদের সবাই নেতিয়ে পড়ল। নেতিয়ে পড়লাম আমি নিজেও। অনশন তবু চলছে। একে একে আমিসহ নেতিয়ে পড়া ধর্মঘটীদের নেয়া হল হাসপাতালে। সেখানে স্যালাইন দিয়ে তাজা করার জন্য ডাক্তার তার প্রয়াস অব্যাহত রাখলেন। কারা কর্তৃপক্ষ আমার সাথে যোগাযোগ করে অনশন থেকে বিরত হওয়ার কথা বললেন। এবং ওয়াদা করলেন এ ব্যাপারে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যার সুরাহা করার উদ্যোগ নিবেন। আরও একদিন পেরিয়ে গেল। বারবার কারা কর্তৃপক্ষের সমবেদনামূলক আবেদন ও ওয়াদার প্রেক্ষিতে তাদেরকে একমাস আরও সময় দিয়ে অনশন ভঙ্গ করলাম।

এর পর সংগঠনের প্রতি আমার বিরূপ ধারণা জন্মে। আমার ভয়ঙ্কর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সংগঠনের প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে চিঠি লিখি। তাকে আমি এতকাল মনে করতাম– আত্মার আত্মীয়। আমাদের এই সংকটে তার এবং সংগঠনের স্থবির দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে মর্মাহত করে। আমার চিঠির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি তার জবাব ও তার সাথে একটি ফতোয়া কারাগারে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। নিচে তার অনুলিপি উদ্ধৃত হল।

www.pathagar.com

২৭ সফর, ১৪০০ হিঃ
১৭ জানুয়ারী, ১৯৮০

স্নেহের আমিন,

ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কারাগার থেকে তোমার ১৯ মোহররম তারিখে লেখা চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি।

দীর্ঘদিন বদ্ধ আবহাওয়ায় জীবন কাটানোর যন্ত্রণা যে কত বেশী তা সহজে অনুমেয়। যুগে যুগে হকপন্থীরা বাতিলের হাতে এমনি করে নির্যাতিত হয়েছেন। বাতিল তার সকল শক্তি দিয়ে হককে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। পরিশেষে বাতিল পরাভূত হয়েছে, হক বিজয়ী হয়েছে। তোমরা যে মহান দ্বীনের খাতিরে দীর্ঘ দিন যাবৎ কারা ভোগ করছো তা বৃথা যাবে না ইনশাআল্লাহ।

তোমরা অনশন পালনের ব্যাপারে যে পরামর্শ চেয়েছ সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি– যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই এ বিষয়ে শরীয়তী ফায়সালা জানার প্রয়োজন বোধ করে আমাদের দ্বীনি সাথীদের কতিপয় হক্কানী আলেমের সাথে পরামর্শ করেছি। তাদের মতামত এই চিঠির সাথে সংযুক্ত হল। আশা করি এটিকে দ্বীনি ফায়সালা মনে করে তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে।

আইনগত পথে চেষ্টা এখনও যেহেতু শেষ হয়নি– তাই এখনি কোন চরম পন্থার কথা চিন্তা করা ঠিক হবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে ছবর অবলম্বন করো। দেখা যাক আইনগত পন্থায় চেষ্টা করে কিছু করা যায় কিনা। আমি আশা করছি আল্লাহ অবশ্যই একটা ভাল ফায়সালা করবেন। আমার ব্যাপারে সরকারী মনোভাব পূর্ববৎ রয়েছে বলে তোমাদের জন্য জোড়ালো কোন বক্তব্য রাখা বা চেষ্টা করার পথে অসুবিধা যথেষ্ট। বিভিন্নভাবে যে চেষ্টা চলছে আশা করি তা ফলপ্রসূ হবে। এবং আল্লাহ মুক্তভাবে তার দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ তোমাদের দেবেন।

তোমার সাথীদের নিকট আমার সালাম।

তোমাদের হিতাকাঙ্খী
গোলাম আযম

www.pathagar.com

"যে কোন বিপদ আপদ বা সংকটে পড়ে মৃত্যু কামনা করা কিংবা এমন কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে তেমন কাজ করা শরীয়তে হারাম। তাই দালাল আইনে সাজা প্রাপ্তির প্রতিবাদে উর্ধতন আদালতে আপীল করার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। এখন যদি আপীলের সুযোগ না থাকে তবে দালাল আইন বাতিল করার প্রেক্ষিতে উক্ত আইনে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের বিনাশর্তে মুক্তি দানের জন্য এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা বাতিল করার দাবীতে গণআন্দোলন করাই উত্তম পন্থা। এজন্য আমরণ অনশন শুরু করা জায়েয হবে না।"

কিন্তু প্রশ্ন হল, অনশন শুরু করার পনের দিন আগে জানানো সত্ত্বেও সংগঠনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনশন শুরু হবার আগে কেন আমার কাছে পৌছল না? কোথায় কিভাবে এটা ফাইলবন্দি হয়ে থাকল?

ক্ষমতাসীন হলে জাতীয় সমস্যাগুলো কি এমনিভাবে ফাইলবন্দি হয়ে বিলাপ করবে? জামায়াতের আনুষ্ঠানিকতা জামায়াতকে প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে স্থবিরতার আবর্তে নিক্ষেপ করছে। একাত্তরের বিপর্যয়ের পরেও সংগঠনের এমন জড়তা বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে বিব্রত করছে। সংগঠনের হাত পা কোথায় যেন শিকল দিয়ে বাঁধা।

কোন ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া ভাল। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে সেটা নেভানোর ব্যবস্থা না করে মজলিশে শুরার অপেক্ষা করতে হবে। কোন্‌দিক থেকে কিভাবে আগুন এল? কারা আগুন লাগাল? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? এ আগুন নেভানোর ফজিলত কি? এসব নিয়ে গবেষণা করে সময়ের অপচয় করা একটা গতিশীল সংগঠনের জন্য কতখানি সঙ্গত আমার জানা নেই। অথচ জামায়াত বিধিবদ্ধ নিয়মে এমনটি করে থাকে। ওদিকে আগুনে জ্বলে পুড়ে সব শেষ।

www.pathagar.com

সাত

আমার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই বিরাজ করছিল অনুসন্ধিৎসা। আর এ কারণেই স্বাভাবিক নিয়মে আমার মধ্যে উত্তম পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। আমি মনে করতাম স্কুল কলেজে ছকবাঁধা নিয়মের পাঠ থেকে মানুষ ডিগ্রীধারী হতে পারে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে না। নিয়মনীতির বাইরে থেকে বিশেষ পাঠাভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে এবং জ্ঞানী মহাজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার সমাহার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এ বিশ্বাসের প্রাধান্য আমার মধ্যে অত্যন্ত বেশী থাকার জন্য ডিগ্রী নেয়ার ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে বই পড়তাম প্রচুর। বই পড়ার ব্যাপারে আমার তেমন বাছ বিচার ছিল না। ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর ভাল লেখকের কোন বই পেলে অবশ্যই সেটা পড়তাম। কারাগারের লাইব্রেরিতে সময় কাটাতে আমার ভাল লাগত।

কারাগার থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না। জীবনের প্রয়োজনে ডিগ্রীর গুরুত্ব থাকলেও কোনদিন সেটা আমার কোন কাজে লাগবে বলে মনে করতাম না। চল্লিশ বছর কারাগারে কাটিয়ে মুক্তাঙ্গনে এসে ডিগ্রী আমার কোন প্রয়োজনে আসবে না সেটা আমি ভাল করেই জানতাম। এর চেয়ে ভাল নিত্য নতুন বই পুঁথির পাতায় পাতায় চোখ বুলিয়ে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা নিবারণ করা।

ডিগ্রী পরীক্ষার ৬ মাস বাকী। পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা দারুণভাবে চাপ দিলেন। আমি এ ব্যাপারে উৎসাহী না হলেও তাদের চাপের মুখে রাজী হলাম। এ ব্যাপারে কারাসঙ্গীদের মধ্যে সবচাইতে বেশী সহযোগিতা দিয়েছেন হাফিজ ভাই (চাঁদপুর), শামসুল আলম, আনিসুজ্জামান (রায়পুরা)। বাইরে থেকে সবচাইতে বেশী সহযোগিতা দিয়েছেন আজিমপুরের মুহম্মদ ফারুক এবং মালেক ভাই। এই দুজনই আমার অন্তহীন অন্ধকারে আলোর দুটো বিন্দু। এই দুটো বিন্দুর প্রত্যাশায় প্রতিটি মুহূর্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে কাটাতাম। এরাই ছিলেন বাইরের জগত এবং সংগঠনের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগের সূত্র। এরা বয়সে আমার ছোট হলেও আমার ওপর সদিচ্ছায় চাপিয়ে দিয়েছেন অনেক ঋণের বোঝা যা কোনদিন কোনভাবে আমি পরিশোধ করতে পারব না। আমার এবং আমার মত

www.pathagar.com

অনেকের ভাবনা মাথায় নিয়ে তারা দু'জন ডিগ্রী নিতে পারেননি। লেখাপড়ায় তাদের সফল অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। সুকান্তর ভাষায়, তারা যেন সেই বাতিওয়ালা, প্রতিদিন পথে পথে যে দীপ জ্বেলে ফেরে। অথচ তার ঘরে জমাট বেঁধে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।

যথাসময় পরীক্ষা দিলাম। আমার অনীহার কারণে প্রস্তুতি তেমন হয়নি। শুধু কিছু মানুষের কথা রাখার জন্য পরীক্ষা দিলাম। কারাগার থেকে আমরা প্রায় ৭০/৮০ জন পরীক্ষা দিলাম। যথানিয়মে পরীক্ষার রেজাল্টও বেরুল। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বমোট পাশ করল ৫ জন। সৌভাগ্যক্রমে এই পাঁচজনের একজন আমিও। যা চাইনি, সেটা সীমাহীন অবহেলার মধ্যেও আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল। অথচ যেজন্য আমার সাধনা, আমার অব্যাহত সংগ্রাম, আমার অন্তহীন কোরবানী, সেটা আজও রয়ে গেল আমার নাগালের বাইরে। এসব দেখে নজরুলের সেই গানের কলি বার বার মনে পড়ে : 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।' সবই যেন তার ইচ্ছা। সংগ্রামে সাফল্য আর ব্যর্থতার মালিক আল্লাহ। আমাদের কাজ শুধুমাত্র তার নির্দেশের আনুগত্য করা।

একান্ত আপনজন আমার মা-এর ইন্তেকাল আমাকে দারুণভাবে আহত করে। যদিও জানি সবই আল্লাহর ইচ্ছা তবু অসহায়ত্বের অন্ধকার আমাকে গ্রাস করছিল। এতদিন মনে হত আমার সব আছে। আমার জন্য মা ভিটে-মাটি সহায়-সম্বল সবকিছু আগলে অপেক্ষা করছেন। আমার একাকীত্বের চাপ শরীরের ওপরও পড়তে থাকে। এ ছাড়াও একে একে কারাগারের সাথীরা বিদায়ের ফলে সবকিছু ভুলে থাকার বিকল্প পথগুলো রুদ্ধ হতে থাকে। ওদিকে কারাগারে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা সংঘবদ্ধ হয়ে আমার ওপর ও আমার কিছু সহযোগীর ওপর তাদের পুরানো মারমুখো ফ্যাসিস্ট কায়দার মহড়া আমাকে ভয়ঙ্কর বিব্রত করে তোলে। সব মিলিয়ে আমার ধৈর্যে ফাটল ধরে, দুঃসাহস শিথিল হয়ে আসে; কারণ আমিও মানুষ। মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধে তো নই। একটা মানুষ একের পর এক কত ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করতে পারে? আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রথমত কারাগারের ডাক্তার আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় আমাকে মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। এখানে মেডিসিনের অধ্যাপক ওয়ালিউল্লাহর দায়িত্বে আমার চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতালে ১২নং কেবিনে আমাকে রাখা হয়। ১২ জন পুলিশ আমার জন্য নিয়োজিত হয়। পালাক্রমে ৪ জন পুলিশের সার্বক্ষণিক প্রহরায় আমাকে কেবিনে অবস্থান করতে হতো। প্রথম

www.pathagar.com

দিকে পুলিশের আচরণকে ঘিরে সমালোচনার মত কিছু ঘটেনি। তারা সম্ভবত আমার কাছে থেকে উৎকোচের চলতি পরিভাষা বকশিস প্রত্যাশা করছিল। কয়েকদিন তারা নির্ভেজাল ব্যবহার দেখিয়ে যখন আমার কাছ থেকে সাড়া পায়নি। তখন তারা বিভিন্ন কলা-কৌশলে আমার ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়। আমার সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে পুলিশেরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এ নিয়ে তাদের সাথে উত্তপ্ত বচসা হয়। আমি বললাম– 'আপনারা জানেন আমি ক্লাসিফাইড প্রিজনার। আমার হাতে বেড়ী কোন মতে পরাতে পারবেন না। এটা পরিয়ে রাখার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অনর্থক মাঝখানে অসুবিধায় পড়বেন। তাছাড়া আপনাদের অফিসার আমাকে ভালভাবেই জানেন। উপর থেকে কোন নির্দেশ থাকলে তাও বলেন। আর যদি আপনাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত হয় তাহলে অফিসারদের পরামর্শ নিন।' আমার কথাগুলো তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল বলে মনে হল না। পুলিশদের একজন ছিল নামটা ঠিক মনে নেই, সে লোকই তার অন্যান্য সহযোগী পুলিশদের প্ররোচিত করেছে। এখানে তার মধ্যে যে জিনিস কাজ করেছে তা হল, তাদের সেই একাত্তরের উন্মাদনা। সেই আদিম আক্রোশ তাদের মধ্যে জমে থাকার কারণে আমার বক্তব্যগুলো তার মনে আছর করেনি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে কে. এম. মঞ্জুর এলাহী এবং এ. কে. এম. সফিউল্লাহ ভাই– পরে কারাগারে যারা লিয়াজোঁ রাখতেন সেই মালেক ও ফারুক ভাই কেবিনে আমার অবস্থা দেখে যাবার পর বিভিন্ন মহলে যোগাযোগ শুরু করেন। তখন মাস্টার শফিকুল্লাহ এমপি (চৌমুহনী), মওলানা আবদুর রহীম সাহেব এমপি। তিনি মন্ত্রীপর্যায়ে বিশেষ করে আলীম সাহেব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও উপ-স্বরাষ্টমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন। মোনায়েম খানের জামাতা, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল সাহেব, নাজমুল হুদা এমপি (মোমেনশাহী) তৎপর হয়ে উঠেন তাৎক্ষণিকভাবে। তিনি থানায় টেলিফোন করে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। তিনি টেলিফোন করেন ডিআইজি সাহেবের কাছেও।

ইতিমধ্যে বস্ত্রমন্ত্রী আলীম সাহেব এবং উপ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অধ্যাপক সালাম সাহেবের টেলিফোন এসে পড়ায় ডিআইজি সাহেব দারুণভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাৎক্ষণিকভাবে ডেপুটি জেলার ও সার্জেন্টকে প্রেরণ করলেন ব্যাপারটা সুরাহা করার জন্য। তারা পুলিশদের আমার হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু পুলিশেরা বেঁকে বসে। তারা বলে– 'আমরা আপনাদের নির্দেশে খুলে দিতে

www.pathagar.com

পারি। কিন্তু আসামী পলাতক হলে সে ব্যাপারে দায়দায়িত্ব আমাদের থাকবে না। এবং একথা লিখিতভাবে দিতে হবে।' ডেপুটি জেলার জহির সাহেব ফিরে গেলেন।

ওদিকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার, নার্সরা দলে দলে এসে পুলিশদের সামনে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। পুরো হাসপাতালটার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ডিআইজি সাহেব আর এক সার্জেন্টকে পাঠিয়ে উল্লিখিত পুলিশের রিলিজ অর্ডার তার হাতে দিয়ে অপর আর একজনকে তার কর্মস্থলে নিয়োগ করেন। সাথে উক্ত পুলিশকে ডিআইজির সামনে হাজির করা হয়। ডিআইজি এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু জেলার, সাব জেলারদের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ফরিদপুর বদলী করা হয়।

ইতিমধ্যে আমার হাতের বেড়ী খুলে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ পর কোতোয়ালী থানার কর্মকর্তা এলেন, এই অনাহুত পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে যদি আপনি আর বেশী নাড়াচাড়া করেন তাহলে ঐ পুলিশ বেচারাদের চাকুরি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আমি কি আশা করতে পারিনা যে, আপনি তাদেরকে ঐ বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা করে দিবেন?'

হেসে বললাম– 'আমি যা চেয়েছিলাম তাতো পেয়ে গেছি। এরপর কারো ওপর আমার কোন ক্ষোভ থাকার কথা নয়।'

পরবর্তীতে আদেল সাহেব স্বয়ং আমার কাছে এলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আমার আর কোন সমস্যা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন– 'কখনো কোন অসুবিধা হলে খবর দিবেন। আপনার তদবির চলছে, নিরাশ হবার কিছু নেই। হাসপাতাল কেবিনে থাকার সময় চৌমুহনীর এমপি মাস্টার শফিকুল্লাহ, মওলানা নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, ইসলামী ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর ইউনুস ভাই, কামরুজ্জামান ভাই, ডাক্তার আবিদুর রহমান, ডাক্তার আলমগীর, ডাক্তার দীলবাহার, সাইমুমের পরিচালক মতিউর রহমান মল্লিক এবং ছাত্রনেতা ফাত্তাহ ভাইসহ অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু-বান্ধব এসেছিলেন।

মুসলিম লীগ নেতা কামরুজ্জামান খান (খসরু ভাই) এসে আমার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কাটান এবং এ পর্যন্ত আমার জন্য যা কিছু করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন– 'আপনার মুক্তির জন্য যেভাবে বিভিন্ন

www.pathagar.com

পর্যায়ে তৎপরতা চালানো হচ্ছে তাতে আশা করি আপনাকে খুব শীঘ্রি মুক্ত করতে পারব। এতটা দিন যে ধৈর্য নিয়ে, যে হিম্মত নিয়ে কারাগারে অবস্থান করছিলেন আমি আশা করব শেষ পর্যায়ে এসে আপনি হিম্মতহারা হবেন না।' এর পরে দেলোয়ার মাস্টার, হুমাইপুরের চেয়ারম্যান ফজলুল করিম খান ও তাঁর জামাতা এলেন আমার সাথে দেখা করে মুক্তির ব্যাপারে আশ্বস্ত করার জন্য।

আমার কাছে সবচাইতে আনন্দের বিষয় হল– ইসলাম বিরোধী মোর্চার লক্ষ্যবস্তু আমার প্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। আমার দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতনের ইতিবৃত্ত তার জানা। তবু তিনি আমার মুখ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন। ইতিহাস থেকে অনেক দৃষ্টান্ত টেনে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার এবং আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। আল কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমার হিম্মতকে আরও চাঙ্গা আরও উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করলেন। দীর্ঘ কারাবাস আর নির্যাতনে পরিশ্রান্ত এই মনটা আবার তাজা হয়ে উঠল। মনে হল আমি আর একা নই। আমার পেছনে রয়েছে এক শক্তিমান মহাপুরুষ। আমি আমার নেতাকে আমার ইমামকে জানালাম– আমি কোন সময় আন্দোলনের প্রাণশক্তি থেকে দূরে থাকিনি। কোন অবস্থাতে কোন নৈরাশ্য আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। এতকাল কারাগারগুলো ছিল বামপন্থীদের আখড়া এবং কমিউনিস্ট তৈরির কারখানা। হাজার হাজার কমিউনিস্ট তৈরি হয়েছে এই কারাগারে। আমার উদ্যোগে ইনশাআল্লাহ সে অবস্থা আর নেই। আমরা নিষ্ঠার সাথে কারাগারে সেই তৎপরতা চালিয়েছি। এর ফল হয়েছে আমাদের অনুকূলে। মুসলমানী জজবাত সম্পন্ন বহু বন্দী এখন ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকে পরিণত হয়েছে। একাত্তরের বহু মুক্তিযোদ্ধা এখানে আমাদের সাথে, ইসলামী আন্দোলনের সাথে কাজ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। আমাদের বহু নেতার কারাগারে পদচারণা বহুদিন থেকে অথচ কর্মের এত বড় ক্ষেত্রকে অবহেলা করেছেন অথবা এ ব্যাপারে কোন কিছু ভাবেননি। আমি ডিআইজি সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনুস ভাই-এর সহযোগিতায় কারাগারের লাইব্রেরিতে প্রচুর ইসলামী বই-এর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হই।

আলাপ আলোচনার মধ্যে মাগরিবের নামাজের সময় হল। আমার কেবিনে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ইমামতিতে নামাজ আদায় করলাম। গোলাম আযম সাহেব দোয়া করলেন আমাদের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহীদের জন্য। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের আবর্ত থেকে, জিল্লতি আর অবমাননার গ্রাস থেকে গোটা

www.pathagar.com

জাতির মুক্তির জন্য সর্বশক্তিমানের দরবারে রাখলেন বিনীত নিবেদন। কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের অন্যায় অনাচারজনিত কারণে সমগ্র জাতির উপর সম্ভাব্য কুদরতি আযাব থেকে তিনি পানাহ চান। তার প্রাণের গভীর থেকে উৎসারিত দোয়ার আবেদন থেকে আমার মনে হল– তিনি যেন গোটা জাতির নেতৃত্বে সমাসীন। সমগ্র জাতির ভাল-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে তিনি একাকার। প্রায় ২ ঘণ্টা হক, ইনসাফ আর শরাফতীর মূর্ত প্রতীক অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমাকে সাহচর্য দিলেন। তিনি জানালেন বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব আসন্ন। মনে হল ইরান থেকে উদ্ভুত ইসলামের বিশাল তরঙ্গ ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের কিনারে এসে আছড়ে পড়বে। আর এই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহাকল্যাণের জোয়ারে আমরা ভাসব। এই নতুন জীবন প্রবাহ আর মুক্তির কলোচ্ছ্বাসে একাকার হবে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার ১০ কোটি মানুষ। আহ, সেই দিনটি কবে, কখন আমার ঠিকানা কারার কপাটে আঘাত করবে। বিদায় নিলেন মহাপুরুষ আর রেখে গেলেন রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

একদিন আমাদের আর এক নেতা ও তৎকালীন এমপি মওলানা আবদুর রহীম সাহেবকে হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করলাম। কথা শুরু হতে না হতেই আমাকে এলার্ম দিলেন, বললেন– "কথা শর্ট কর। আমার অনেক কাজ।" এতে আমার আবেগ আহত হল। বললাম– 'এ কারণেই আমি টেলিফোন করলাম, আমার জন্য আপনারা যে তদবির করেছেন তাতে আমার কাছ থেকে কোন কিছু জানার প্রয়োজন আছে নাকি?' জবাবে তিনি কি বললেন, 'তা আমার মনে নেই।' তবে দুপুরে তার বাড়ীতে খাবার দাওয়াত দিলেন।

সেদিনের আহত অনুভূতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম– ইসলামী নেতৃত্ব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ কোথায়? আমাকে কেন্দ্র করে এমপি থেকে মন্ত্রী, সাংবাদিক থেকে সম্পাদক, ছাত্র থেকে জনতার এই যে তৎপরতা, তা আমার প্রাণের গভীরে আনন্দের স্পন্দন জাগালেও এর ফল শুভ হয়নি। আমার সাময়িক বিজয় হয়েছে হয়তো বা কিন্তু যে চিকিৎসার জন্য আমি এই হাসপাতাল কেবিনে সেটা আর হল না। আমার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার টেলিফোনকে তারা বাড়তি ঝামেলা আর উটকো নিপীড়ন ভাবলেন। আশঙ্কা করলেন, তারা আবার কোন সংকটের বেড়াজালে আটকে পড়েন। অতএব রুগীকে বিদায় দেয়া উত্তম। আমাকে দশ বার দিনের মধ্যে রিলিজ করে দেয়া হল। আমি আবার কারাগারে ফিলে এলাম। শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হতে লাগল।

www.pathagar.com

আবার কারাগারের ডাক্তারদের শরণাপন্ন হলাম। ডাক্তাররা কারাগারে আমার সুচিকিৎসার ব্যাপারে অপারগতা ব্যক্ত করলেন। তারা আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল কেবিনে থাকার যাবতীয় খরচ বহন করতে হয় রুগীকে। আমার যাবতীয় খরচ আমাদের সংগঠন বহন করতে থাকল। মেডিসিনের হেড, অধ্যাপক ইউসুফ আলীর তত্বাবধানে আমার চিকিৎসা শুরু হল। এখানে যথানিয়মে পালাক্রমে ২ জন করে মোট ৬ জন পুলিশ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখত। আগের মত এখানে আর পুলিশী নির্যাতন নেই কিন্তু ভিন্নধর্মী নির্যাতনের আয়োজন উদ্যোগ চলতে লাগল। নির্যাতনের তেলেসমাতি যা একাত্তরের শুরু হয়েছে তার যেন শেষ নেই। একাত্তরে আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের পটভূমিতে ভুল শুদ্ধ যা কিছু করে থাকিনা কেন সেই ফেলে আসা দিনগুলোকে ওরা আমাদের কিছুতেই ভুলতে দিবে না। ১০ বছরের ব্যবধানেও নতুন প্রত্যাশা নতুন চেতনার আলোকে নতুন মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে চলার উদ্যোগ নিলেও বিশেষ বিশেষ মহল একাত্তরের খুঁটিতে আমাদের পা-গুলো বেঁধে রাখতে চায়। 'লেকিন কম্বল নেহি ছোড়তা' আমরা যেন এমন এক অবস্থায় রয়েছি। বামপন্থী নেতা ও আওয়ামী লীগ নেতার টেলিফোন আসতে লাগল ডাঃ ইউসুফ আলীর কাছে। তাদের সবার একই প্রশ্ন– আলবদরের কমাণ্ডারকে হাসপাতালে পোষা হচ্ছে কেন? কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যার ঠিকানা তাকে মেডিক্যাল কলেজের কেবিনে কেন এমন যত্ন-আত্তির মধ্যে রাখা হয়েছে, এটাই তাদের প্রশ্ন। বার বার বলা হচ্ছে– তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ সাহেব শুধুমাত্র বলেছেন– 'আমি ডাক্তার, আমিন সাহেব আমার রুগী। কে আলবদর, কে রাজাকার, কে মুক্তিফৌজ, কে সন্ত্রাসবাদী সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। সেটা দেখবে আদালত অথবা প্রশাসন। আমি দেখব রুগী। কোন হুমকি অথবা কোন প্রভাব আমার দায়িত্ব থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।'

আমার পাশের কেবিনগুলোতে ছিলেন কাদের সিদ্দিকীর ভাই লতিফ সিদ্দিকী, ফণীভূষণ মজুমদার, শ্রমিক লীগের বজলুর রহমান (পাবনা), কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড ফরহাদ এবং এমপি ইব্রাহীম খলিল। এদের মধ্যে লতিফ সিদ্দিকী ও ফণীভূষণ মজুমদার বাইরের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আমার যেন হাসপাতালে ঠিকমত চিকিৎসা না হয় সেজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ, হুমকি প্রদানের ব্যাপারে ঐ দু'জনের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু ফরহাদ ভাই ও শ্রমিক নেতা বজলুর রহমানের ভূমিকা ছিল নির্লিপ্ত। ডাঃ গোফরান, ডাঃ

www.pathagar.com

শওকত, ডাঃ খোরশেদ আলম, ডাঃ নজরুল, ডাঃ সাইফুল ও ডাঃ নূরুল ইসলাম সর্দার সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কোন মানসিক ভীতি আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। কেননা হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার নার্স, এমনকি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রনেতা ইদ্রিস আলী , ডাঃ ইলিয়াস ফারুকী, ডাঃ হাফিজ ভাই ও অন্যান্য ছাত্ররা বিশেষ সহানুভূতি নিয়ে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতেন। এ কারণে বাইরের কোন হামলার ভয় আমি অতটা করতাম না।

তবে যেদিন জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় সে দিনটা উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। দু'জন মাত্র প্রহরী। প্রশাসনে শিথিল অবস্থা বিরাজ করছিল সর্বত্র। এ ছাড়া সংগঠনের তরফ থেকেও কেউ সেদিন যোগাযোগ রক্ষা করেনি। এতে একটু বিচলিত হয়ে উঠি। প্রতিপক্ষের কোন গ্রুপ আমাকে আঘাত হানতে চাইলে সেদিনটি ছিল তাদের জন্য উত্তম সময়।

যা হোক, যুব মুসলিম লীগ নেতা ইব্রাহিম খলিল (এমপি) ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার্থে ফেব্রুয়ারী '৮১-র গোড়ার দিকে হাসপাতালের কেবিনে ভর্তি হন। আমার প্রিজন কেবিন থেকে একটু দূরে লতিফ সিদ্দিকীর প্রিজন কেবিনের উত্তর পাশে ছিল তার কেবিন। তার সাথে পরিচিত হতে এবং তার অসুস্থতার খোঁজখবর নিতে তার কাছে ছুটে গিয়েছি। তাছাড়া সমমনা হওয়ায় এবং অন্তরের টানে সাক্ষাৎ জরুরী মনে করেছিলাম। আমার পরিচয় বললে তিনি অতি আন্তরিকতার সাথে আমার সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখান। তার অসুস্থতা এবং রোগজনিত কষ্টের কথা চিন্তা করে আমার বিষয়ে সংক্ষেপে তাকে জানালাম। সেই থেকে নিয়মিত তার কেবিনে যাওয়া আসা, কথা-বার্তা চলতে থাকে। এসময় তার পরিবারের সদস্যবর্গ এবং ভাবী সহ মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে দেখা হতো এবং তাদের সাথে আলাপ পরিচয় ঘটতো। ইতিমধ্যে ইব্রাহিম খলিল ভাইয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকার ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে লন্ডনে প্রেরণ করে। যাওয়ার সময় আমার প্রিজন কেবিনে ভাবী বিদায় ও দোয়া নিতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেদিনের সে কান্নার দৃশ্য আজও আমার অন্তরে দেদীপ্যমান। একদিন পত্রিকায় দেখলাম ইব্রাহিম খলিল সাহেব আর বেঁচে নেই। লন্ডনের হাসপাতালে তিনি ২০শে জুন মারা যান। অনঙ্কুরেই এক সম্ভাবনাময় নেতার জীবনাবসানে আমি দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম।

তখনও আমি প্রিজন কেবিনেই রয়েছি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবো– এরকম একটি প্রত্যাশায় প্রহর গুনছি। অতঃপর সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পর সময়

www.pathagar.com

করে ইব্রাহিম ভাইয়ের পরিবারের সদস্যবর্গের সাথে দেখা করি। ভাবী ও সন্তানদের সালামত কামনা করে চলে আসি।

একে একে ৭টা মাস আমি হাসপাতালে কাটালাম। এ ক'টা মাস ডাঃ ইউসুফের স্নেহ আর মমত্ববোধের বেড়া যেন আমার চারিদিকে নিরাপত্তার বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছিল। মনে হয়েছিল এই হাসপাতলটা আমার জন্য সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয়। অধ্যাপক ইউসুফ আমাকে বলতেন– 'তোমাদের সংগঠনকে তৎপর হতে বলো। তাড়াতাড়ি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করুক।' তিনি চাইতেন না আমি আবার কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফিরে যাই। তিনি অন্যান্য সহযোগী ডাক্তারদের বলতেন– 'আমিনকে আমার এ জন্য ভাল লাগে যে তার মধ্যে রাখ ঢাকের কোন প্রয়াসই নেই।'

অধ্যাপক ইউসুফ হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে এসেছেন। হিন্দু মানসিকতা সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও অনেক বেশী তিনি সচেতন। একাত্তরে আমাদের প্রতি হিন্দুস্তানের উচ্ছ্বসিত দরদের অন্তরালে কী গভীর ষড়যন্ত্র ছিল সেটা তার মত বিজ্ঞলোকের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়।

একাত্তরে আমাদের ভূমিকায় কি গভীর দেশপ্রেম, কি নিবিড় জাতীয় অনুভূতি লুকিয়ে ছিল সেটা কিছু সংখ্যক ষড়যন্ত্রকারী ও পরিস্থিতির দুর্বল পর্যবেক্ষকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম না হলেও সচেতন মানুষগুলো ঠিকই অনুভব করত। ডাক্তার ইউসুফ তেমনি সতর্ক মানুষ ছিলেন। এ কারণে আমার প্রতি তার দরদ ছিল অপরিসীম।

আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকা অবস্থায় জানতে পারলাম আমার মুক্তির দিন আসন্ন। কেননা প্রেসিডেন্ট সাত্তার ঈদ উপলক্ষে যে ৬ জন রাজবন্দী মুক্তির ঘোষণা দেন তার মধ্যে রয়েছি আমিও। আমার সাথে আর যারা ছিলেন তারা সবাই মুক্ত হলেও আমি মুক্ত হতে পারলাম না। কেননা তখনও আমার আরো কিছু মামলা রয়ে গেছে ঝুলন্ত অবস্থায়।

শেষ দিকে এসে আমার দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। এতদিন কেবিনে থাকার ব্যাপারে সংগঠন উদারভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে এসেছে। মুক্তির কিছু দিন আগে দলের সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্বশীল, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের ডাইরেক্টর মোঃ ইউনুস ভাই আমাকে খবর পাঠালেন যে অতি সত্বর মুক্তির ব্যাপারে আমি কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে সংগঠনের

www.pathagar.com

বিশেষ কিছু করার থাকবে না অর্থাৎ আমাকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফিরে যেতে হবে। দুঃখ পেলাম এই ভেবে যে, সংগঠন এখনও সংকীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এতদিনে আমার ভুলটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ইরানের বিপ্লবের ব্যাপারে আমার যে উপলব্ধি সেটা আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসা দলীয় কর্মী ও নেতৃবৃন্দের কাছে অকপটে বলতাম। ইরানের বিপ্লবের সপক্ষে আমার বক্তব্যগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসল আমার দিকে। সংগঠনের সহানুভূতি ও মদদ দুটোই আমি হারাতে বসলাম। এতে আমি মর্মাহত হইনি মোটেও কেননা ৪০ বছর কারাবাসের মানসিক প্রস্তুতি আমার এর আগেই নেয়া ছিল। তাদের এই সংকীর্ণতা আর হীনমন্যতা দেখে মহান আল্লাহ সম্ভবতঃ আড়াল থেকে হেসেছিলেন। তা না হলে প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে দিয়ে আমার মালিক আমার মুক্তির জন্য শেষ ঘুঁটি চালালেন কেন? যাই হোক, আমার ঝুলন্ত মামলাগুলোর ব্যাপারে হাসপাতালের কেবিন থেকে আমি নিজেই তদবির করলাম। অবশেষে একাশির ২৬ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেলাম।

মুক্তি পাবার দিন হাসপাতালের ডাঃ গোফরান, ডাঃ খোরশেদ ও ডাঃ আলতাফসহ অন্যান্য ডাক্তাররা আমার একটা বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সেই সভায় জামায়াত নেতা কামরুজ্জামান সাহেব, ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহের ভাই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রনেতা মোঃ ইদ্রিস আলী, মেডিকেল কলেজের জিএস জনাব সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও অন্যান্য ছাত্র মিলে আমাকে একটা পারকার কলম উপহার দেন।

এখন আমার বিদায়ের পালা। মুক্ত পৃথিবীর অবারিত আলোর মধ্যেও আমি অন্ধকার দেখছি। কোথায় যাবো? আমার লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলাম না। অধীর আগ্রহে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা করছিলাম। পরবর্তীতে মনে হল, এ প্রত্যাশা ভুল। কেননা আমি কোন বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী নই যে আমার নেতা মানসিকভাবে চাঙা করার জন্য তার কর্মীর নিকট ছুটে আসবে। আমাদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আব্বাসীয় আভিজাত্যের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা গাড়ী এলো, কিন্তু সেটা সংগঠনের নয়। উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আবদুস সালাম পাঠিয়েছেন। দুঃখ-সুখের মিশ্র অনুভূতি আমাকে গ্রাস করলো। দুঃখ– যে সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আমার উদ্দাম যৌবনের সোনালী দিনগুলোতে নিরলস পরিশ্রম করেছি, যাদের নির্দেশে বন্দুকের নলের মুখে দাঁড়িয়েছি, যাদের

www.pathagar.com

লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১০ বছর কাটালাম কারাগারে, আমার মুক্তির দিনটিতে তাদের প্রত্যাশা করেও পাইনি। আর সুখ– যাদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, যার সাথে কারাগারে ক্ষণিকের আলাপ-পরিচয়, সেই তৎকালীন উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক সালাম সাহেব আমার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন। কি বিচিত্র মনে হয়েছিল সেদিন। ফারুকসহ সালাম সাহেবের বাসায় গেলাম। তার নিজস্ব লোকজন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তবু উঠে এলেন, এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। কি আনন্দ লেগেছিল সেদিন। তার অভ্যর্থনা আর আপ্যায়ন আমাকে লজ্জা দিয়েছিল। হয়তো পরিবেশগত সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে আমি তার জন্য অতটুকু করতে পারতাম না। হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তিনি আমাকে গাইডলাইন দিলেন। গ্রামের বাড়ীতে না যাওয়ার, কিছুদিন রাজনীতি থেকে বিরত থাকার এবং ঢাকায় অবস্থান করার উপদেশ দিলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম আমি আজিমপুরে শিবির নেতা এনাম ভাই-এর মেসে। আমার সাথে ছিলেন ফারুক ও মালেক ভাই। এখানে আমি মাস খানেক অবস্থান করলাম। এনাম ভাই সেখান থেকে চলে যাওয়াতে একটুখানি সমস্যার মুখোমুখি হতে হল। কিন্তু আমার মালিক আমার জন্য আরো সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন।

ডাক্তার ইউসুফের সহযোগী ডাক্তার এ কে এম খোরশেদ আলম ভাই তার কোয়ার্টার ছেড়ে দিলেন আমার জন্য। এখানে থাকা অবস্থায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের অনুগ্রহে বিআইসিতে আমাকে একটা চাকুরী দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নাজির সাহেব। এখানে খুব বেশী দিন এ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারলাম না। জেলে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন মত ও পথের বিভিন্ন নেতার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের অনেকেই আমার কাছে টেলিফোন করতেন। যা কর্তৃপক্ষ পছন্দ করতেন না। আমার অবর্তমানে টেলিফোনকারীরা সাধারণ সদ্ব্যবহারটুকুও পেতেন না। প্রায় সবাই আমাকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। কর্তৃপক্ষের আচার আচরণ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে আমি একজন চাকুরীজীবী ছাড়া কিছুই নই। এখানে আমার সাংগঠনিক দাবীও কিছু নেই। এ অবস্থায় বেশি দিন থাকা সংগত মনে করলাম না। আল্লাহর পৃথিবী অনেক বড়। আমি স্বাধীনভাবে রুটি রুজীর অন্বেষণ করা অধিকতর উত্তম মনে করলাম। সামান্য পয়সার বিনিময়ে কতিপয় দাম্ভিক মানুষের কাছে আমার স্বাধীন সত্তা ও সংযত বিবেক বন্ধক রাখা কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। আমি আর এক কারাগার থেকে উন্মুক্ত দিগন্তে ডানা মেললাম। এতে আমার কষ্ট হয়েছে, তাতেও

www.pathagar.com

সুখ। পিঞ্জিরায় আবদ্ধ তোতা পাখীর মত ছক-বাঁধা মুখস্থ বুলি আবৃত্তি করে কাটানোর সুখকে আমি ঘৃণা করি। আমি চাই উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় দুরন্ত ডানা মেলতে। অন্তরের আবেগ উজার করে মুক্তির গান গাইতে।

আল্লাহর বিরাট পৃথিবীর আমি একজন। আর এ সমগ্র পৃথিবীটা যেন আমার। হক আর ইনসাফের দীপশিখা নিয়ে এগিয়ে চলার দুঃসাহস যার বুকে পুঞ্জীভূত সেতো বিধি-নিষেধ আর জ্যাঠামীর বেড়াজালে নিজেকে আটকে রাখতে পারে না। আমিও পারিনি।

কারামুক্তির পর বাইরের উন্মুক্ত আলো-বাতাসে এসে জীবন ও জীবিকার দিকটা যখন চিন্তা করতাম তখন আমার সামনে একরাশ নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই দেখতাম না। জীবন থেকে আমার দশ বছর খসে গেছে। প্রগতি থেকে আমি দশ বছর পিছিয়ে গেছি। বিবর্তিত রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানেও আমি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যেন আমি ভিন্ন গ্রহ থেকে এসে পা রেখেছি এই গতিশীল পৃথিবীতে। জীবনের আঁকাবাঁকা পথগুলো আমার সব অচেনা। এমন সংকটের দিনগুলোতে যে লোকটি আমার হাত ধরে এই অচেনা পথে একপা একপা করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি হলেন, সাবেক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান সাহেবের পুত্র খসরু ভাই। বরাবরই তিনি আমাকে স্বাধীন জীবন ও জীবিকার কথা বলতেন। খসরু ভাই তার দরাজ দীল নিয়ে আমার পাশে আসেন। তিনি বলেন– 'আপনি তো আমার ভাই। আমি আপনার পাশে রয়েছি।'

সংকট উত্তরণে আমার একক প্রচেষ্টার পাশাপাশি অন্যান্যদের সাথে তিনি নিজে চেষ্টা তদবীর ও সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও একটা স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর আমাকে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। তিনি বলতেন– 'আপনার যে কোন প্রয়োজনে আমি রয়েছি।' এমন কি তার পরিবারের সদস্য হয়ে তার গৃহে অবস্থান করার জন্যও আমাকে বলেন।

আমি কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালে খসরু ভাই, এ্যাডভোকেট হুমায়ুন ভাই ও তার পরিবারের সকলের নেপথ্য সহযোগিতা আমাকে ও আমার পরিবারকে বেষ্টন করে ছিল। কত যুগ আগে তার পরিবারের সাথে আমাদের আত্মিক যোগ হয়েছিল ঠিক বলা মুশকিল। তবে সেই সূত্র ধরে ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানে থেকেও খসরু ভাই আমার মন-মানসিকতায় অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন।

আমার স্বাধীন জীবন যাপনের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

করেছেন ইশ্বরদীর মজিদ ভাই, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া ইকবাল খান, ইঞ্জিনিয়ার জমশেদ (বর্তমানে রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থানরত), ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার দিদারুল ইসলাম, সোলাইমান, আনোয়ার, কামাল, এডভোকেট আমিনুল ইসলাম, এডভোকেট তারিকুল ইসলাম (মোহন), নাসের ভাইয়ের সহযোগিতা কম পেয়েছি এমনটি বলা যাবে না। প্রফেসর ডাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন ভাই, বিশেষজ্ঞ ডাঃ আফসার সিদ্দিকী ভাই-এর সহমর্মিতাও আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমি ঋণী। জীবনভর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তাদের সেই ঋণ পরিশোধ করতে থাকব।

আট

আটাত্তরের শুরু থেকে ইরানে কিছু কিছু আলোর ঝিলিক পরিলক্ষিত হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট কার্টারের তেহরান সফরের পর শাহের ইঙ্গিতে ইরানের পত্র-পত্রিকায় ইমাম খোমেনীর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এটা করা হয় খোমেনীর ওপর জনগণকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য। কিন্তু এটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে ইরানের শাহের দরবারে। ঝড় উঠে, সে ঝড় কোম থেকে তেহরান, তেহরান থেকে মাশাদ, মাশাদ থেকে শিরাজ এভাবে ছড়িয়ে পরে সর্বত্র। একটা বিরাট ঝাঁকুনির প্রয়োজন ছিল ইরানে। ভাবলাম সে সময় সম্ভবতঃ সমাগত।

ষাটের দশকে পাকিস্তানের সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোর সূত্রে ইরানের যেসব প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তাতে আমরা দেখেছিলাম ইরানী শাহানশাহীর দু'হাজার বছরের ইতিবৃত্ত। এতে জাহেলী যুগকেও ইরানের গৌরবোজ্জ্বল দিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেইসব চিত্র দেখেই আমরা বুঝেছিলাম ইরানের রাজতন্ত্রের পতনের দিন আসন্ন। শাহের খোশ খেয়াল ও জাহেলী চিন্তা চেতনা সূক্ষ্মভাবে জনজীবনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমেরিকার নীলনক্সা অনুযায়ী তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের মাধ্যমে গণচেতনায় বিভ্রান্তি করা হচ্ছিল ব্যাপকভাবে।

www.pathagar.com

ওদিকে ইরানের গণমনে যে তূষের আগুনের মত এক বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ধিকিধিকি জ্বলছে তেমন কিছু আমরা জানতাম না। কেননা বিশ্বের সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলো এ সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতো না।

আটাত্তরের শুরু থেকে বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলোতে এবং আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে ইরানের বিপ্লব সংক্রান্ত খবর স্থান পেতে থাকে। অক্টোবর থেকে আন্দোলন আরও ব্যাপক আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ, মিছিলের পর মিছিল, ধর্মঘটের পর ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে তখন। সারা ইরানে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। শাহের চোখে ঘুম নেই। তবুও শাহ নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ছেন না। কেননা তাকে মদদ দেয়ার জন্য রয়েছে ২ লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈনিক, তার নিজস্ব তৈরী সাভাক বাহিনী, সিআইএ-র উর্বর মস্তিষ্ক আর রয়েছে আমেরিকা, ইসরাইল এবং মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন দোসররা। এর পরেও স্ট্রাটেজিক্যালি রাশিয়ার সহানুভূতিও তার পাওয়ার কথা। কেননা রাশিয়ার আওতাধীন এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রের পাশে ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মৌলবাদী শক্তির বিকাশ হলে রাশিয়ার মুসলমানদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা জানে ভাল করেই। এ কারণে রাশিয়া তার নিজস্ব যন্ত্রণায় ইরানের শাহকে ইরানী জনগণের ওপর বিজয়ী দেখতে চাইবে।

বলতে গেলে ইরানী জনগণ শুধুমাত্র শাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তা নয়। দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ছিল ইরানী জনতার লড়াই। কোনক্রমেই পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সামরিক আইন জারী করা হল। তবু বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অবিরাম চলছে। প্যারিস থেকে আয়াতুল্লাহ খোমেনী সামরিক সরকারকে প্রত্যাখান করার আহ্বান জানালেন। জনতা আরও মরিয়া হয়ে উঠল। শিরাজে সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের সংঘর্ষ হল। শত শত লাশ নিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল। মহররম সমাগত। সামরিক আইন মহররমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। শাহ জনগণকে শান্ত করার জন্য প্রশাসনের কিছু রদবদল করলেন। কিছু দায়িত্বশীল অফিসারকে গ্রেফতার করলেন। এতেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলনা জনতার মিছিলে। তেলক্ষেত্র অকেজো হয়ে পড়ল। দুই লক্ষ ব্যবসায়ী তাদের দোকান-পাট বন্ধ করে দিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হল অফিস আদালত। সামরিক প্রধানমন্ত্রী গোলাম রেজা পদত্যাগ করলেন। শাপুর বকতিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন। খোমেনী ঘোষণা দিলেন, কোন সরকারই গ্রহণযোগ্য হবে না। জনগণের লক্ষ্য শাহ। যুগ যুগ ধরে ইরানের জনগণের ওপর যে

www.pathagar.com

অত্যাচারের স্টীমরোলার চালান হয়েছে তার জবাবদিহি করতে হবে জনগণের আদালতে। শাহ দেশত্যাগ করলেন। শাপুর বখতিয়ার সর্বশক্তি নিয়োগ করেও জনতার ঢল রুখতে পারলেন না। সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনতার কাতারে নেমে এল। অবশেষে গুলীগোলা ও আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে শহীদের রক্ত বিজয়ী হল।

আমি জেল থেকে ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতাম। আর অনুভব করতাম অপূর্ব শিহরণ। মনে হত আমি ইরানের পথে পথে বিপ্লবী জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে ইসলামের সবচাইতে বড় কলঙ্ক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।

ইরান আধুনিক বিশ্বে নতুন করে প্রমাণ করল, ইসলামের অর্থ আপোষহীন সংগ্রাম। প্রমাণ করল, ইসলাম একক অভিযাত্রায় দুর্লঙ্ঘ্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর এক দুর্নিবার শপথ। এ ব্যাপারে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর একটা প্রসঙ্গ টানা যায়। তখন ইরানের শাহের গুলীতে প্রত্যেক দিন শত শত লোক শহীদ হচ্ছেন। ঐ সময় কিছু ইরানী নেতৃবৃন্দ ইমাম খোমেনীকে প্রশ্ন করেন– 'আপনি কি মনে করেন না জাতির এত যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যে কোরবানী দিচ্ছে জনগণ, এর একটা ভয়াবহ ঝুঁকি আছে? এর ফলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে? পর্যায়ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে? এর চেয়ে বরং এই উত্তপ্ত অবস্থায় আন্দোলনকে থামিয়ে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে রেখে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার করে নেয়া ভাল?' তারা বুঝিয়েছিলেন ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন– 'আল্লাহ আমাদের যা করতে বলেছেন আমরা সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাব। এর বিনিময়ে তিনি আমাদের সাফল্য আমাদের জীবদ্দশায় দিবেন, কি পরবর্তীতে কোন ভবিষ্যতে দিবেন, তা তাঁর ইচ্ছাধীন।' ইমাম খোমেনী কোন শক্তির ওপর নয়, এমন কি জনগণের শক্তির ওপরও নির্ভর করেননি। তিনি নিষ্ঠার সাথে খোদা নির্দেশিত পথে জাতির জন্য কাজ করেছেন আর নির্ভর করেছেন আল্লাহর ওপর।

১৪শ' বছর ধরে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও স্বৈরতন্ত্র যেভাবে ইসলামের প্রগতিশীল শক্তির ওপর আঘাত হেনেছে, যেভাবে মুসলমানদের মন-মগজ স্থবির করে দিয়েছে, যেভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মর্চে ধরানো হয়েছে
মধ্য দিয়ে ইসলামের নিজস্ব জেল্লা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ই

www.pathagar.com

অবস্থা হয়েছে এমন, যা চৌদ্দশ' বছর ধরে বিভিন্ন দিকে ফাটল ধরেছে, দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ইট কাঠ খসে গেছে, ভিত হয়েছে দুর্বল। এর সংস্কার করে একে দুর্গ বানানো তো দূরের কথা এখানে নিরাপদে কোন মতে বাস করাও সম্ভব নয়। অতএব একে ভেঙে চূর্ণ করতে হবে। এর ভিত্তি উপড়ে ফেলতে হবে। আর এটা সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা কোন মতে সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন বিপ্লব, চূড়ান্ত বিপ্লব। সংস্কার আন্দোলন করে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন মার খেয়েছে। শক্তিশালী সংগঠন হয়েও জামায়াতে ইসলামী এগুতে পারছে না। জামাতের বিপ্লবী কর্মীরা এখন আয়েশের সন্ধানে ব্যস্ত।

জেল থেকে ইরানী বিপ্লবকে জানার বোঝার চেষ্টা করি। ক্রমশঃ আমি তাদের আপোষহীন প্রক্রিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। ইরানের সেই মহান বিপ্লবী নেতা ১৪শ' বছর পর মুসলমানদের যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে গেছেন তার চেহারা মোবারক দেখার ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে ওঠে। ইরানের সংগ্রামী জনতা ও তাদের বিপ্লবোত্তর কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।

আশির মাঝামাঝিতে নব্বই শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য কাজী আজিজ ভাই কারাগারে অন্তরীণ হলেন। এতে আর যাই হোক আমার যেন মনে হয়েছে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত তথ্য আমাকে জানানোর জন্য সম্ভবত তিনি খোদার তরফ থেকে উপস্থিত হয়েছেন।

তার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারলাম, ইসলামী বিপ্লব ইরানে কিভাবে সংঘটিত হল? ইরান বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে, পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরকে কিভাবে ইরান থেকে উৎখাত করা হয়েছে? আমেরিকা ও আরবের শিখণ্ডী সরকারসমূহ ইরাকের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইসলামী ইরানের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছে? কিভাবে একের পর এক শহরগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে? ইরান এককভাবে সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলা করছে কিভাবে? একে একে আজিজ ভাই আমার সামনে সবকিছু তুলে ধরেন। আমেরিকা ও আরবের প্ররোচনায় ইসলামের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ড দুনিয়ার তাবৎ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নিগৃহীত হচ্ছে। ইসলামী ইরানের সপক্ষে ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্জাত জনগণের আওয়াজ আমাদের সরকারও যেন সহ্য করতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আজিজ ভাই কারা-অন্তরালে।

www.pathagar.com

তার কারামুক্তির পরও তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন। ইরানের যাবতীয় বই আমাকে সরবরাহ করেছেন। তার সাথে খন্দকার রাশেদুল হক, মাহফুজ ভাই সহ কয়েকজন সরকারী অফিসারও আসতেন, যারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রগতিশীল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

আমি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলে আজিজ ভাই এক মহান ভ্রাতৃত্ববোধের তাগাদায় আমার কাছে প্রায় আসতেন। আমিও তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। আমার অধিকাংশ সময় কাটত জামায়াতের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে। সেই পুরান ছকবাঁধা নিয়মে সাংগঠনিক কাজ। সেই গতানুগতিক কর্মপন্থা, যা আমার প্রগতিশীল চিন্তা চেতনাকে আহত করত। আমি এখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজতাম।

কিছুসংখ্যক বিবেক বর্জিত অসৎ আনাড়ীদের হাতে রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত সৎ ও বিবেকবান লোকদের যে হেনস্তা এটি আমাকে বরাবর বিড়ম্বিত করেছে। অথচ একাত্তরের রাজনৈতিক পরাজয়ের তিলক পরে আমাদের সংগঠন আজও পুরান পাঁকে আবর্তিত হচ্ছে। সেই গতানুগতিক গণতান্ত্রিক শ্লোগান। কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষ নতুন বোতল, পুরানো মদ সবকিছু ভেঙে চূরমার করতে চায়। কোন পথ না পেয়ে সবার সাথে আমিও সংগঠনের পুরানো পথ ধরে এগুতে থাকি। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে তেহরানের রাজপথে, দেজফুল, কাসরে সিরিন আর খুররম শহরের রণাঙ্গনে। ইরানের বিপ্লবী কর্মসূচী ও আপোষহীন সংগ্রামের সাথে পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বাংলার শ্যামল প্রান্তরের জিন্দাহ্‌দীল অগণিত মানুষের মত আমিও কখন আমার অজান্তে একাত্ম হয়ে গেছি।

একদিন মাগরিবের নামাজ সবেমাত্র শেষ করেছি এমন সময় আত্মপ্রত্যয়ে সমুন্নত দুটো মানুষ আমার ডেরায় এসে ঢুকলেন। একজন আমার অতি পরিচিত। অন্য জনের সাথে আমার এখনও পরিচয় হয়নি। অপরিচিত আগন্তুকের সাথে আজিজ ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি একজন ইরানী ছাত্রনেতা, দিল্লীতে লেখাপড়া করতেন। বিপ্লবের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম মমত্ববোধ আমার ভালো লাগলো। তিনি বলেন– 'যে রঙীন স্বপ্ন বুকে নিয়ে আপনার তারুণ্যকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তাক্ত পথ ধরে হেঁটেছেন, ১০ বছর কারাবাসে কাটিয়েছেন, আমরা অজস্র খুন আর আগুনের তুফানের মধ্য দিয়ে সেই মঞ্জিলে পৌঁছেছি। এই মঞ্জিল আপনার আমার এবং দুনিয়ার সমস্ত

www.pathagar.com

বিপ্লবীদের। ইসলামী ইরানের পক্ষ থেকে আমি দাওয়াত নিয়ে এসেছি।'

ইরানের এই দাওয়াত যেন পরম পাওয়া বলে মনে হল। আমি সাথে সাথে দাওয়াত গ্রহণ করলাম। মনে হল, 'এ মেরে খাব কি তাবির এ মেরে জানী গজল।' ইরান যেন আমার স্বপ্নের মঞ্জিল আমার হৃদয়ের সংগীত।

তার সাথে প্রোগ্রাম হল– প্রথমত আমাদের যেতে হবে বোম্বে। বোম্বের ইরানী কালচারাল সেন্টারে একদিন অবস্থান করতে হবে। তার পর ইরানী এয়ার লাইন্সের বিমান আমাদের নিয়ে যাবে তেহরান।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত। বিরাশির ৬ আগস্ট তারিখে আমি, পিজি হাসপাতালের ডাক্তার আলমগীর সাহেব ও রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষারত ছাত্র শিবির নেতা আজাদ সাহেব তেহরানের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বাংলাদেশ বিমান আমাদের বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এখানে ইরানের কালচারাল সেন্টারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বিপ্লবী তরুণরা ইতিমধ্যে এসে গেছেন। আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হলাম। এখানে আমার সাথে অনেকে বক্তব্য রাখলেন। পরদিন সকালে আমরা তেহরানের উদ্দেশ্যে ইরানী বিমান 'হুমা'য় চাপলাম। ইরানে পৌঁছালে আমাদেরকে নিয়ে আসা হল তেহরানের সুসজ্জিত হোটেল পার্কে। এখানে এই হোটেলকে কেন্দ্র করে আমরা সমগ্র ইরানে আবর্তিত হয়েছি।

একদিন দুপুরে পবিত্র কোমের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এই কোম নগরী তেহরান থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে শিরাজ ও খুজিস্তানগামী একটি মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। এখানে ইমাম মুসা কাজেমের কন্যা ও ইমাম রেজার বোন হযরত মাসুমার মাজার রয়েছে। এখানে শহীদ আয়াতুল্লা মাদানী, শহীদ আয়াতুল্লা মোতাহারী ও হুজ্জাতুল ইসলাম মোন্তাজারিরও কবর রয়েছে। এ শহরটি ইরানবাসীদের জন্য দ্বিতীয় পবিত্র নগরী। ১৮শ' বছরের পুরান এই শহরটি ইসলামী তালিম-তরবিয়তের প্রাণকেন্দ্র। ইরানে ইসলামী আন্দোলনের বড় বড় ঢেউ এখান থেকে উত্থিত হয়েছে। দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের মহান সৈনিকদের দৃষ্টি এই কোম শহরে নিবদ্ধ। এই কোম শহরে আয়াতুল্লাদের বাণী এক একটি ঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করে এশিয়ার লৌহমানব ইরানের শাহ পাহলবীর রাজ প্রাসাদে আঘাত হেনেছে। এই কোমের চেতনা উৎসারিত আলেমদের আবেদন প্রচণ্ড ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি নিয়ে জালেমশাহীর একটার পর একটা দুর্গ ধসিয়ে দিয়েছে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখলাম এই শহরটি। দেখলাম এই নগরীর মানুষগুলোকে। নতুন

www.pathagar.com

ইতিহাসের স্রষ্টা এরা। ইতিহাসের গতিধারাকে পাল্টে দেয়ার মহান হাতিয়ার যেন এই কোমের প্রত্যেকটি মানুষ। এদের চোখ, মুখ, চেহারা, চাহনিতে এক আমিত-তেজ বিপ্লবের আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। যেন 'ওরা জানেনা হার মানা, ওদের গতিতে প্রখর ডানা।'

বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফওজিয়া মাদ্রাসায় এলাম। এই সেই মাদ্রাসা যেখানে প্রত্যেকটি তালেবে ইলমের কলবে ঢেলে দেয়া হয় বিপ্লবের ফয়েজ। প্রত্যেকটি রুহ এই মাদ্রাসায় এসে শাহাদাতের জন্য নেশাগ্রস্ত, উন্মাদ হয়ে উঠে। শূন্য হাতে বুক খুলে এরা গর্জে ওঠা কামানের সামনে দাঁড়াতে পারে। কামানের গর্জনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। শাহ যখন বিশ্ব জনমতকে ধোঁকা দেয়ার জন্য শ্বেত বিপ্লবের নামে তার সমস্ত অপকর্মগুলো বৈধ করার উদ্দেশ্যে গণভোট করে এবং সরকারী ঘোষণা দেয় যে বিপুল গণ-সমর্থন রয়েছে শাহের সপক্ষে, সে বছরই ঈদ উপলক্ষে ইমাম বক্তব্য রাখেন– 'শাসক গোষ্ঠীর বে-আইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। চরম পরীক্ষার ভয়ে ভীত হবেন না। সরকার যদি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, নতি স্বীকার করবেন না। আমরা ইসলামের জন্য সংগ্রাম করি। কোন শক্তিই তা সে যত বড়ই হোক না কেন আমাদের স্তব্ধ করে দিতে পারবে না।'

একই বছর ২২ মার্চ কোম থেকে উত্থিত ইসলামের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য মেশিনগান সজ্জিত একদল সশস্ত্র সৈন্য কোমে প্রবেশ করে। ইমামের গৃহের চতুর্দিকে জনতার ভিড়, সেনাবাহিনীর অবস্থান থেকে ইসলাম বিরোধী শ্লোগান উত্থিত হল। সেনাবাহিনীর ছত্র-ছায়ায় শাহের পালিত গুণ্ডারা মাদ্রাসার ভেতরে প্রবেশ করল। বিক্ষিপ্ত ছাত্রদের মারধোর গালিগালাজ ও অত্যাচার শুরু করল। কোমের জনতা মাদ্রাসার চারিদিকে বেষ্টন করে অবস্থান নিতে থাকলো। সেনাবাহিনী ও গুণ্ডারা গুলীর ঝড় তুলে ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। ইমাম ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বললেন– 'আপনারা শান্ত থাকুন। আপনারা এমন সব দ্বীনি নেতার অনুসারী যারা এর চাইতে আরো বেশী নির্যাতন ভোগ করেছেন। যারা এ ধরনের দৌরাত্য ও নির্যাতন চালায় শেষ পর্যন্ত এসব তাদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত ও আযাদী রক্ষার জন্য আপনাদের অনেক দ্বীনি নেতা শাহাদাত বরণ করেছেন। সুতরাং তাদের পবিত্র উত্তরাধিকার হিফাযত করার দায়িত্ব আপনাদেরই।'

এই কোম থেকে ইমাম খোমেনী দেশের সমস্ত দ্বীনি মোবাল্লিগদের কাছে আরজ রাখলেন– 'ইসলামী জনতার ওপর শাহ যে জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে,

www.pathagar.com

ইসরাইল ও তার দালাল গোষ্ঠী ইসলামের প্রতি যে সত্যিকার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনারা সে সম্পর্কে আপনাদের খোতবায় আলোচনা করুন।' তার বক্তব্যগুলো দেশের সর্বত্র চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা বেড়েই চলেছে ক্রমশ। এক পর্যায়ে সাভাক বাহিনী হুমকি দিল, ফায়জিয়া মাদ্রাসায় বক্তৃতা দেয়া চলবে না। সেই দিনই আশুরার পড়ন্ত বিকেলে ইমাম ভাষণ দিলেন– 'আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে শাসক গোষ্ঠী ইসলাম ও ইসলামী নেতৃত্বের বিরোধী। ইসরাইল শাহ-এর সহযোগিতায় আমাদের ঐশী কেতাব কোরআনের অবমাননা করতে চায়। ইসলামী নেতৃত্বকে নির্মূল করতে চায়। ইহুদীরা আমাদের ব্যাবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও কৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।'

৫ জুন কোম অবরুদ্ধ হয়। সেনাবাহিনী ইমামের বাড়ী ঘেরাও করে। তাকে দ্রুত সামরিক গাড়ীতে তুলে নিয়ে তেহরানের কারাগারে আবদ্ধ রাখে। বিদ্যুতের মত এ খবর তেহরানের সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। জনতার ঢল নেমে আসে রাজপথে। কোম শহর রক্তাক্ত হয়ে উঠে। নিহত হয় ৪ শত। তেহরানের রাজপথের অবস্থাও একই রকম। লালে লাল হয়ে ওঠে অজস্র শহীদের রক্তে। শাহের মেশিনগানের গুলীতে লুটিয়ে পড়ে ১৫ হাজার জিন্দা-দীল মানুষ। তারপর ইমামকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। বিপ্লবের আগুন রাজপথ থেকে সরে আসে। বছরের পর বছর ধরে রেজা শাহের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের স্তূপে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সে আগুন বাসা বেঁধে থাকে আলেমদের অন্তরে। সমগ্র কোম নগরী ১৫ বছর ধরে সে বিপ্লবের আগুন একইভাবে বহন করতে থাকে। শাহী আগ্রাসনের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়া পর্যন্ত কোমের জাগ্রত জনতা তাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ করেনি। মানুষের অন্তরকে জিন্দাদীলে পরিণত করার জন্য কোম আজও প্রচণ্ড শক্তির উৎস।

ফায়জিয়া মাদ্রাসায় আমরা আমন্ত্রিত। দুপুরের খানাদানায় আরও অনেকের সাথে আমরা অংশ নিলাম। বিকেল নাগাদ শুরু হয় অনুষ্ঠানের। এখানে একজন আলেম ভাষণ দিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদতের তাৎপর্য বিষয়ে। তিনি ভাষণ দিচ্ছেন, বলিষ্ট তার বক্তব্য। ইমাম হোসেনকে ঘিরে কুচক্রীদের বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের রহস্য একে একে উদঘাটন করছেন। তার বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে সমবেত মর্সিয়ার বেদনা-বিধৃত সুরের মূর্ছনা। এতে অনুষ্ঠান আবেগ বিমণ্ডিত হয়ে উঠছে। শ্রোতাদের সবার চোখ দিয়ে একইভাবে গড়িয়ে আসছে অশ্রুর ধারা। অনুষ্ঠান হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হল। আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। ১৪শ' বছর ধরে বিপ্লবের বহ্নিশিখা, সেই কারবালার বহ্নিশিখা এভাবেই তারা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ

www.pathagar.com

কারণেই আজকে প্রতিটি অন্তরের ছোট ছোট আগুন সম্মিলিতভাবে সূর্য-শিখায় পরিণত হতে পেরেছে। এ কারণেই ইরানী জনতার অভিব্যক্তি আপোষহীন। তারা নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসতে পারে। আর এই ১৪শ' বছর ধরে আমরা রাজতন্ত্রীদের সাথে আপোষ করে এসেছি। রাজা, বাদশাহ, আমীর আর সুলতানদের ষড়যন্ত্র আমাদের চেতনাকে গ্রাস করে আমাদের ইসলামী স্পৃহাকে হত্যা করেছে। আমরা ইসলামের মূল প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে এর ক্ষয়ে যাওয়া খোলসটা আঁকড়ে ধরে বেহেশতের প্রতীক্ষা করছি।

ভাবছি রসূলুল্লাহর (সাঃ) পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আজও আমাদের ঘুম ভাঙছেনা কেন? কারণ ওমরের (রাঃ) ঝুপড়িতে ইসলামের অনুসন্ধান না করে আমরা তাজমহলের মর্মর পাথরে ইসলামের শান শওকত খুঁজতে ব্যস্ত। আমরা বেহেশতী জেহরা ঈদগাহে ইসলামকে না খুঁজে ফাহাদের দৌলতখানায় ইসলাম খোঁজার চেষ্টা করছি। ইরানের শাহ পাহলবী ৩৭ বছর জনগণের সম্পদ লুট করে যে সুরম্য ৪টি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন সেগুলো দেখার আগ্রহ আমাদের কম ছিল না। বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ প্রাসাদের মালিককে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও প্রাসাদগুলো অক্ষত ছিল। নিরস্ত্র জনতার কাছে আমেরিকার মদদপৃষ্ট তথাকথিত লৌহমানবের নির্লজ্জ পরাজয়ের কলঙ্ক-চিহ্ন হিসাবে ইরান সরকার প্রাসাদগুলোকে সম্পূর্ণ আগের অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এর ফলে বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তিমূল আরও মজবুত হয়েছে। জনগণের কাছে যা এতদিন ছিল অবিশ্বাস্য এবং আরব্য উপন্যাসের কল্প কাহিনী, স্বচক্ষে এবং সুস্পষ্টভাবে এসব অবলোকন করে জনতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তারা কিভাবে গুটিকতক লোক দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। চারটে রাজপ্রাসাদের জন্য এক বিরাট মূল্যবান এলাকা অনুৎপাদনশীল খাতে স্রেফ কতিপয় লোকের ভোগ বিলাসের জন্য বিনিয়োগ করা হয়েছিল। প্রাসাদের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। আধুনিক সাজ সরঞ্জাম আর আসবাবপত্রের বিপুল সমাহার। এ ছাড়াও পৃথিবী মন্থন করে যা কিছু পাওয়া গেছে যা কিছু শাহের পছন্দ হয়েছে সবগুলোর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এখানে। বিজ্ঞানের সর্বোন্নত ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে প্রাসাদগুলোতে। প্রমোদ কানন, সুইমিংপুল, হেলিপ্যাড, নাচঘর সব রকম আরাম আয়েশ এবং লালসা চরিতার্থ করার সব আয়োজন এখানে বিদ্যমান ছিল। এ ছাড়াও প্রাসাদগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বৈচিত্রময় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সর্বাধুনিক আয়োজন ও সমকালীন শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র ও উপকরণের ব্যহারের আধুনিকতম ব্যবস্থা ছিল। এখনও সৌন্দর্য ও

www.pathagar.com

সুষমামণ্ডিত সুগন্ধে সুবাসিত হাম্মামখানার কাছাকাছি গেলে মন মাতাল হয়ে ওঠে। সবকিছু দেখে মনে হল, শাদ্দাদের বেহেশত শাহের প্রাসাদের কাছে মাথানত করবে। প্রাসাদের খাস কক্ষগুলোতে ঢোকার অনুমতি নেই। এ কারণে তালাবন্ধ। জানালা দিয়ে সবকিছু দেখলাম। দেখে আধুনিক শাদ্দাদের জন্য দুঃখ হল। জনগণের সম্পদ লুট করার তার এত আয়োজন-উদ্যোগ। তার আভিজাত্য-স্বাচ্ছন্দের জন্য এত রক্তপাত এত প্রাণহানি। তার পরিণতিটা কি হল? খুনের আসামী হয়ে নিরাশ্রয় ছিন্নমূল তৃণের মত ভেসে বেড়াতে হল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সব সময়। তার অপকর্মের প্রধান সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাও তাকে ঠাঁই দেয়নি। তার ভাষায়– মৃত ইঁদুরের মত আমেরিকা আমাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। তার ঐশ্বর্য আর বিত্ত-বৈভবের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে শেষ অবধি।

ইরান সফরকালীন সময়ে একদিন তাবরিজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তাবরিজ ইরানের উত্তর পশ্চিমে সবচেয়ে জনবহুল ও বৃহত্তম প্রদেশ আজারবাইজানের রাজধানী, রাশিয়া ও তুরস্কের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। প্রাকৃতিকভাবে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতিবাদী ও সংগ্রামী। ষাটের দশকে কোমে আয়াতুল্লা খোমেনী আত্মপ্রকাশের পর সরকার বিরোধী যে আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে তার ঢেউ তাবরিজে এসে আছড়ে পড়ে। এতে শাহের নির্বিচার গুলীতে ২শ' লোক প্রাণ হারায়।

১৯৭৮ সালের শুরুতে আবার শাহ-বিরোধী বিপ্লবের গুমোট নিম্নচাপ তেহরানে ঘনীভূত হয়। তাবরিজের সংগ্রামী মানুষগুলো একটা ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তারপর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল রাজপথে নেমে আসে। শাহ তার শেষ দিন পর্যন্ত তাদের ফেরাতে সক্ষম হননি। বিক্ষোভ, মিছিল, শোকসভা ও পথসভায় রাজপথ মুখর হয়ে ওঠে। মসজিদগুলো পরিণত হয় বিপ্লবের কেন্দ্র-বিন্দুতে। সাভাক তার নির্মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় গ্যারিসনের সৈনিকদের ডাক পড়ে। কিন্তু তাবরিজের মানুষগুলোর মরিয়া মনোভাব লক্ষ্য করে গ্যারিসনের সেনাবাহিনী রাজপথে অবস্থান নিতে অনীহা প্রকাশ করে। এক বিরাট হত্যাযজ্ঞ এড়ানোর উদ্দেশে হয়তো সেনাবাহিনী বর্বরোচিত পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। অতঃপর শাহের নির্দেশে হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচার গুলী চলে। এতে ৫শ' প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। এর ফলে আন্দোলনের গতি

www.pathagar.com

ব্যাহত হয়েছে এমনটি নয় বরং এতে বিপ্লবের প্রকৃতি আরও ভয়ঙ্কর আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠে।

এই সেই তাবরিজ যেখানে মসজিদে অনুষ্ঠিত শোকসভার ওপর বাইরের গ্যারিসনগুলো থেকে নিয়ে আসা বর্বর সৈনিকরা গুলীবর্ষণ করে। নিহত মানুষদের গোঙানী, আহতদের আর্তনাদ, প্রতিবাদী জনতার তকবীর, সাইরেন ও গুলীর শব্দে পরিস্থিতি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। অজস্র গুলী বুকে নিয়ে জনতা ধাওয়া করে সৈনিকদের। সেনাবাহিনী পালাতে বাধ্য হয়। নিরস্ত্র জনতার এই কোরবানী, নির্বিচার গণহত্যার বাস্তব চিত্র, আর বিপ্লবের নতুন স্ফুলিঙ্গ ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ করে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাবরিজের ঘটনা প্রবাহ, তাবরিজে ঝরানো বিপ্লবী জনতার রক্ত ইরানের ভাগ্য পরিবর্তনের বিরাট প্রেরণা হয়েছিল শেষ অবধি।

মেহমান হিসাবে তাবরিজে অবস্থানকালে তাদের সেই প্রতিবাদী প্রচণ্ড রূপের উল্টো দিকটা দেখে বিস্মিত হয়েছি। তারা যেমন আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় প্রয়োজনে উজাড় করে রক্ত ঢালতে পারে; তেমনি মেহমানের পান-পেয়ালায় সরবত ঢেলে হাসিমুখে নিবিড়-সান্নিধ্য দিয়ে সৌজন্য উজার করতে পারে অকাতরে। তাদের মুখেই শুনেছি তারা কিভাবে নির্বিকারে অজস্র জীবন দিয়ে মহান ইসলামী বিপ্লবকে তার অন্তিম লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজও তারা রণক্লান্ত হয়ে পড়েনি। শাহাদাতের মঞ্জিলে পৌঁছে তবেই যেন তারা বিশ্রাম নেবে।

ঐতিহাসিক শহর শিরাজ সমুদ্রতল থেকে ১৬শ' মিটার উচ্চে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ এই শহরটিতে আমাদের নিয়ে আসা হল। গুলিস্তাঁ-বুস্তাঁর এই শহরটির বিমোহিত করা মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে আবেগময় করে তোলার জন্য যথেষ্ট। সম্ভবতঃ এই কারণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের চারণভূমি হয়েছে। এটা প্রেয়সীর কপোলের একটা তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারাকে বিক্রি করতে উদ্যত ছিলেন যে সৌন্দর্যপ্রিয় কবি সেই হাফিজ এখানে ঘুমিয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন মানব সত্তার রহস্য উন্মোচনকারী কবি শেখ সাদী। বিশ্ব সাহিত্যে যেমন তাদের কর্ম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, অনুরূপভাবে তাদের মাজারগুলোতে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরম্য সৌধ। পুষ্পে শোভিত সৌন্দর্য আর সুরভিতে মৌ মৌ করছে মাজার বেষ্টিত ফুলের বাগান। স্মৃতি সৌধগুলোর পুষ্পময় চত্বরগুলো দেখে মনে হল– হুসন্ আর ইশ্‌ক সৌন্দর্য আর প্রেমের দুটো ধারা এখানে এসে একাকার। এমন মনোরম মোহনায় এই কবিরা

www.pathagar.com

এলেও থমকে দাঁড়াতেন। আর তাদের হংসপাখা কথা বলত, গানে গানে মুখর হয়ে উঠত। কিন্তু গানের সেই বুলবুলিরা 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে।'

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত কবিদের ভক্ত অনুরক্ত দেখে মনে হল আমি গান গেয়ে উঠি 'লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনুগো আঁখি খোল।' কিন্তু ফুলের জলসায় শায়িত মজনুরা কোন দিন আর আঁখি খুলবে না। তাদের সে ঘুম ভাঙার ঘুম নয়। আমি দোয়া করলাম তাদের জন্য আর বললাম– 'খোশ রহো আহলে চামান– হে বাগানবাসী তোমরা সুখে থাক'।

দেখলাম, মুসলিম স্থাপত্য আর ঐতিহ্যের জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন জুমা মসজিদ, নয়া মসজিদ। দেখলাম নরেন জেস্তান বাগান ও পারস্য যাদুঘর।

শিরাজের সৌন্দর্য সুষমা দেখে যদি কেউ একে বেহেস্তের বাগান বলে তাহলে মনে হয় ভুল হবে না। জুন্দ রাজবংশের আমলে শিরাজকে রাজধানী করার রহস্যও সম্ভবতঃ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ৪৯ বছর শিরাজ ইরানের রাজধানী ছিল। এখানকার রোমান্টিক কবি একটা নারীর তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা দিতে চাইলেও বিশ শতকের শিরাজ মহান ইসলামী বিপ্লবের শক্তিশালী দুর্গ। বুলবুলি আর গুলবাগের সুর আর সুরভির সমাহারে থেকেও শিরাজের আবাল-বৃদ্ধবনিতা আজানের বিপ্লবী আহ্বান ভুলেনি। শাহের নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মত প্রতিরোধ মূর্তিমান হয়ে ওঠে এখানে। শিরাজের দুঃসাহসিক জনতার ব্যূহকে ভেঙে ফেলার জন্য শাহী সৈন্যরা তাবরিজের মত এখানকার মসজিদেও নির্বিচারে মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করে। বন্দুকের গর্জন, মানুষের আর্তনাদ, কাতর কণ্ঠের আহাজারি, প্রতিরোধকামীদের সোচ্চার তকবীর ক্যাসেটে আজও বাণীবদ্ধ হয়ে আছে। শত শত মানুষ আত্মাহুতি দেয় কিন্তু তবু মৃত্যু-পাগল মানুষগুলোর মুষ্টিবদ্ধ হাত রাজতখ্তের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে সক্ষম হয়।

আমরা আয়াতুল্লাহ শিরাজীর বাসভবনের দিকে পা বাড়ালাম। বহু মানুষ এখানে। আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল। আয়াতুল্লাহ শিরাজী বিপ্লবের সুদৃঢ় স্তম্ভ। তার চোখ, চাওনি আর সমস্ত আদল থেকে বিপ্লব বিচ্ছুরিত। বক্তব্য রাখলেন ইংরেজীতে। কোন জড়তা নেই। সুস্পষ্ট বক্তব্য সুদৃঢ় বাচনভঙ্গী। তার বাণীগুলো বিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতের মত মনে হল। আমাদের অন্তরে অন্তরে যেন মুহূর্তেই ছড়িয়ে দিলেন এক ভয়ঙ্কর অগ্নিগিরির লাভা। অনেক দিন হয়ে গেছে অথচ তার

www.pathagar.com

সেদিনের বক্তব্য আজও আমাকে উদ্বেল করে তোলে।

গাড়ী চলছে। দুর্নিবার গতিতে আমাদের গাড়ী চলছে। কখনও সুদৃশ্য শ্যামল প্রান্তর, কখনও পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলছি। ভাবছি এদেশের মানুষের অপূর্ব ত্যাগ আর কোরবানীর কথা। কতইনা রক্ত দিয়েছে এদেশের মানুষ। আজও দিচ্ছে। কোন ক্লান্তি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। বিশ্রামের সময় নেই। সবাই ছুটছে, মোহগ্রস্তের মত ছুটছে এক অন্তিম লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ইরানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেও এদের নেশা কাটেনি। আল্লাহর দ্বীনকে এরা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এদের অকুতোভয় কর্মপ্রয়াসী জাতীয় উদ্দীপনা দেখে মনে হল এরা যেন বিশ্ব বিপ্লবের জন্যই জন্মেছে। বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম সফল লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরী হবে না। তাদের সবারই যেন এই কথা, একই অভিব্যক্তি– 'হামদার্দ কি আফসানা দুনিয়াকো শুনা দেঙ্গে, হো যায়েগী ফির দুনিয়া আবাদ এতীমো কা– শুনিয়ে দেব এই পৃথিবীকে প্রেম আর ভালবাসার বার্তা, এ পৃথিবীটা আবার হয়ে উঠবে দুঃস্থ, আর এতিমদের আবাসভূমি।'

দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌঁছলাম বেহেস্তী জেহরার দোর গোড়ায়। শত শত মানুষের ভিড়। আবাল-বৃদ্ধবনিতার সমাবেশ। অনেক মহিলা মাতম করছে তার ভাই, তার স্বামী, অথবা তার আত্মীয় পরিজনদের জন্য। এই আবেগ বিহ্বল বেদনার্ত অনুভূতি আমাদের আপ্লুত করে তোলে। আমাদের অজান্তে চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। দূর দূরান্তের মুসাফির আমরা কখন যে একাকার হয়ে গেছি এদের সাথে। বিরাট কবরগাহ। কবরগুলো সুবিন্যস্ত সাজানো। হাজার হাজার জীবন্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে এখানে। আল-কোরআনে এদেরই বলা হয়েছে জীবন্ত। বলা হয়েছে – 'এবং তাদের মৃত বলো না যারা আল্লাহর পথে শহীদ।' এই কবরগুলোর জীবন্ত মানুষরা গোটা জাতির জীবনীশক্তি। ওদের হাতিয়ার গর্জে উঠবেনা কোন দিনও। কিন্তু ওদের জীবন্ত কবরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত জাতীয় প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ওদের খুন আর খাকের দ্রবণ জাতীয় সত্তাকে সঞ্জীবিত করতে থাকবে। প্রত্যেক কবরে শহীদের ছবি টাঙানো আছে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দুঃসাহসিক সিপাহীদের অধিকাংশ তরুণ। শহীদদের বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। স্বজনহারানো বেদনাবোধ স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে। তারা সন্তানদের শাহাদাতের জন্য

www.pathagar.com

গৌরবান্বিত। বাকী সন্তানদেরকেও তারা শাহাদাতের রাস্তায় যাওয়ার জন্য প্রেরণা যোগাবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

এই বেহেস্তী জেহরা, এই বিরাট কবরগাহ দেখে মনে হয়েছে, যে জাতি মৃত্যুর জন্য এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে তাকে দুনিয়ার কোন শক্তি মারতে পারে না। আমার মনে হল, কোন শক্তিধর পরাশক্তি ইরানের অনিবার্য বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বাংলাদেশের কুটির থেকে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখা কবির গজলের দুটো কলি এই কবরের তোরণে লেখা থাকলে বোধ হয় মানানসই ও সঠিক হত–

'শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারী।'

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যকে নিয়ে চিন্তা করতাম। এতদিন যেমন ছিল আশা তেমন ছিল আশঙ্কা। আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বিজয়ের পর বাংলাদেশে যেমন নেমেছে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ধস, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যেমন হয়েছে দেউলিয়া, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন হয়েছে বিপন্ন; তেমন একটা পরিণতির দিকে ইরান এগিয়ে যায় কিনা– এমন একটা উদ্বেগ ছিল দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের শরীক মানুষগুলোর। কিন্তু ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বস্তুবাদী মুজিবের মত ভুল করেনি। আত্মোৎসর্গকারী তরুণদের ময়দান থেকে ঘরে পাঠিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত চেতনাগুলোকে মরচে ধরিয়ে বিবর্ণ করেনি। কর্মক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে কর্মবিমুখ অলস জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেনি। বেগবান তারুণ্যকে শয়তানের ইন্ধনে পরিণত হতে দেয়নি। ইমাম খোমেনী তাদের সামনে তুলে ধরেছেন জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী।

দক্ষ অদক্ষ তরুণ কর্মী ও ছাত্ররা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে জিহাদ শাজিন্দেগীর (পুনর্গঠন জিহাদের) কর্মসূচী নিয়ে গেছে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিধ্বস্ত বাড়ীঘর নির্মাণ, পানি সেচের ব্যবস্থা, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, এসব করছে শিক্ষিত অশিক্ষিত তরুণ কর্মীরা। আমরা দেখেছি বিধ্বস্ত ইরানকে তারুণ্যের স্পর্শে তাজা হতে।

দু' বছর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ইমাম খোমেনী দেশটাকে পিছিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। বরং সমস্ত সিলেবাস, সমস্ত কারিকুলাম পরিবর্তন এবং নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য এটুকু সময়ের প্রয়োজন ছিল। আগের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলাম তৈরির সিলেবাস চালু রাখলে হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের রক্তদান বিফলে যেতে বাধ্য

www.pathagar.com

হত। এ ছাড়াও দুটো বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথাকথিত বামপন্থীদের সস্তা রাজনীতির আখড়াসমূহ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। এসব দেখে মনে হল, তাপস আধ্যাত্মিক নেতা কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

ইরানে জিহাদে শাজিন্দেগী অর্থাৎ পুনর্গঠন জেহাদ সংস্থাটি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জনমনে দাগ কাটতে সক্ষম হয় এবং দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এককালের বিভ্রান্ত তরুনরা নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের তারুণ্যকে নিয়োগ করেছে জাতীয় পুনর্গঠনে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সবরকমের কূট-কৌশল নিঃশেষ হওয়ায়, দুনিয়ার মুসলমানদের দৃষ্টি ইরানের বিপ্লব থেকে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে শিয়া বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবের মহানায়ককে কাফের হিসাবে মুসলিম বিশ্বে উপস্থাপন করা হচ্ছে। পরস্পরকে সংঘাতের মধ্যে নিয়ে এসে কায়েমী স্বার্থবাদী লুটেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদেরকে নিরংকুশভাবে শোষণ করার পথ পরিষ্কার করছে। প্রচারণার তোড়ে বিভ্রান্ত মুসলমানদের তবু অনেক জিজ্ঞাসা। এসবের সঠিক উত্তরের জন্য ইরানের সুন্নী আলেম খোঁজ করলাম। ইরানের পার্লামেন্ট সদস্য একজন সুন্নী আলেমকে পেয়ে তার সাথে আলাপ করতে চাইলে তিনি সাগ্রহে রাজী হলেন। তার ভাষায়– 'ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপারে সুন্নীরা নীরব ছিল অথবা শাহকে সমর্থন দিয়েছে এমন একটি ঘটনাও আমার জানা নেই। তুর্কমেন, কুর্দ, বেলুচ সব সুন্নীরা শিয়া ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দোসর ইরানের শাহকে উৎখাত করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে। বিপ্লবের পরে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও সুন্নীরা ভোট দিয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে।'

কুর্দীস্তানের উত্তেজনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– 'ওখানে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তারা শিয়া সুন্নী কোনটাই নয়। সস্তা শ্লোগানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা বাস্তবায়নের জন্য কিছু কুচক্রী কাজ করে যাচ্ছে। আমরা শিয়া সুন্নী উভয়ে মিলে তাদের প্রতিহত করছি, ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এখন আগের মত আর সেই অশান্ত অবস্থা নেই। ইমামকে আমাদের নেতা হিসাবে মনে করি। ইমামই আমাদের নেতা, আমাদের পথ প্রদর্শক।'

www.pathagar.com

তিনি আরও বললেন– 'ইমাম মদ নিষিদ্ধ করেছেন, সুদ উৎখাত করেছেন, রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছেন, হেজাব চালু করেছেন, হক আর ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা সুন্নীরা কি এ কথাই বলব– মদ খেতে চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই, রাজতন্ত্র ফিরিয়ে দাও, সামাজিক সুবিচার অনৈসলামিক? যদি এসব না চাই তাহলে আপনারা বলুন, ইমামের পথ আর আমাদের পথের পার্থক্য কোথায়? ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যে এক-আধটু পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটুকু শাফী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও রয়েছে। এ পার্থক্য মৌলিক নয়। অতএব আমাদের বিভেদও নেই। ইরানের সমস্ত শিয়া সুন্নী কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি। কায়েমী স্বার্থবাদী ও শোষক শ্রেণী, তা সে শিয়া হোক অথবা সুন্নী হোক, আমরা শিয়া সুন্নী সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব।'

'রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ শত শত বছর ধরে আমাদের শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ লুট করছে। বিভেদের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলিম উম্মাহকে শতধাবিভক্ত করছে। ছোট্ট একটা অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের হাতে আমরা মার খাচ্ছি। লাঞ্ছিত হচ্ছি দেশে দেশে, দুনিয়ার সবখানে। সাম্প্রদায়িকতার ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কোথাও যেন মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে না পারে সেজন্য আপনারা যে যেখানে আছেন সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের কূট-কৌশলগুলো দুনিয়ার সামনে তুলে ধরুন।'

ইরানের সুন্নী নেতা বলে চলেছেন– 'লেবাননের সুন্নী নেতারাও ইমামকে তাদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে শোষক ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার জন্য দুনিয়ার সকল মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।' এ ব্যাপারে ইমাম খোমেনী বলেন– 'তারা আমাদের মধ্যে মতবিরোধ বাধাতে চায়। আমাদের অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কারণ আমরা সবাই মুসলমান, আল কোরআনের অনুসারী। পবিত্র কোরআন ও তওহীদের জন্য আমাদের অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।'

জুমুআর নামাজের প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমরা ইরানে না এলে বুঝতাম না। নিছক একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বলে আমরা আজও বিশ্বাস করতাম। অথচ এই জুমআর নামাজই এখানে শাসক ও শাসিতের দূরত্ব দূর করে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের সীমানায় নিয়ে এসেছে। সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের ব্যবধান

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইনফরমেশন গ্যাপ দূর করার এই যে ধর্মীয় অনুভূতিসিক্ত সর্বাধুনিক ব্যবস্থা, এমনটি পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক মতবাদ দিতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অজস্র সামিয়ানার নিচে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয় নামাজের জন্য। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। খোতবায় দাঁড়ালে হাতে থাকে অটোমেটিক মেশিনগান। এ যেন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতের লাঠি, ১৪শ' বছর পর অটোম্যাটিক মেশিনগানে পরিণত হয়ে গেছে। মনে হয় সময়ের এই যে ব্যবধান সেটা এখানে এসে দূর হয়ে গেছে। এ যেন সার্ভাইভাল অব দি ফিটেস্ট-এর অনিবার্য পরিণতি। পৃথিবীটা যোগ্যতমের আবাস। কালের ব্যবধানে যোগ্যতার বিবর্তনও আনতে হবে স্বাভাবিকভাবে। সময়ের গতির সাথে জীবনকেও গতিশীল করে তুলতে হবে। ইরানের সামগ্রিক নেতৃত্বে এ দিকটায় কোন ফাঁক চোখে পড়ল না। ইমামের খোতবার জন্য ৩/৪ স্তর বিশিষ্ট কোন মেহরাব নয়, ভূমি থেকে ১৫ ফুট উঁচু একটা ডায়াস, এর থেকে বেশ কিছু দূরে একটা স্টেজ। এমন না হলে লক্ষ লক্ষ মুসল্লীদের মধ্যে খোতবা দেয়া সম্ভব নয়। সমবেত জনতার সংখ্যা অনুমান করার চেষ্টা করলে ভুল হবে, কেননা সাড়িবদ্ধ জনতার শেষ প্রান্তটি চোখে পড়ে না।

খোতবা আমাদের দেশের মতই দুটো পর্যায়ে বিভক্ত। এ ব্যাপারে আমরা ১৪শ' বছর আগে রয়ে গেছি। অর্থাৎ সেই পুরানো দিনগুলোতে যে খোতবা পরিবেশন করা হত হুবহু সেটিকে পাঠ করা হয় মাত্র। তাও সেটা পাঠ করা হয় আরবীতে। যা অনেকেই শুধুমাত্র পুণ্যের আশায় চোখ বন্ধ করে অন্ধের মত শুনে যায়। কিন্তু গণমনে এর বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয় বলে আমার মনে হয় না।

অথচ এখানে প্রথম পর্যায়ে খোতবা দেয়া হয় চলতি ঘটনা প্রবাহ সামনে রেখে। এতে রয়েছে জাতীয় মূলনীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয় ইসলামের হুকুম আহকাম ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে। এখানে সমস্ত পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

এই কেন্দ্রীয় জামায়াত ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একইভাবে জুম্মার জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় জামায়াত পরবর্তীতে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয়।

ইসলামী বিপ্লব যে শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের ভিতকে উপড়ে ফেলেছে, ইমামের ভাষায়

www.pathagar.com

'বড় শয়তান' আমেরিকাকে ইরানের মাটি থেকে উৎখাত করেছে তা নয়; পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনসৃষ্ট ইরানের জাতীয় সত্তার গভীরে প্রোথিত অপসংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হয়েছে।

তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েদেরকে মাতৃত্বের মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে পুরুষদের ভোগ বিলাস ও লালসার একমাত্র সামগ্রীতে পরিণত করা হয় বিপ্লব-পূর্ব ইরানে। বারাঙ্গনা ও প্রমোদবালায় পরিণত হয় ইরানের অগণিত নারী। সমগ্র জাতীয় সত্তার অর্ধেক এই নারী সমাজকে অনিবার্য ধ্বংসের কিনার থেকে মুক্তির নব দিগন্তে টেনে আনে ইরানের ইসলামী বিপ্লব। তাই বলে ইরানে নারী সমাজকে অবরুদ্ধ করা হয়নি। নিশ্ছিদ্র অবগুণ্ঠনে আবৃত করেও রাখেনি। হিজাব অর্থাৎ শালীন পোশাক পরিহিত অবস্থায় ইরানের মেয়েদের অবাধ বিচরণে কোন বাধা নেই। ইরানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোন মেয়ে যদি একাকী হেঁটে যায় তাহলে তাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে কেউ তাকিয়েও দেখতে পারবে না।

আজকের ইরানে একটিও বারবনিতা নেই। এ সবের ভাগারগুলো নির্মূল করা হয়েছে। পুনর্বাসন করা হয়েছে এদের। ইসলামী বিপ্লব এদেরকে বারবনিতা থেকে গৃহবধূতে পরিণত করেছে। পথে ঘাটে সবখানে আমরা দেখেছি মেয়েদের অবারিত পদচারণা কিন্তু শালীন পোষাকে আবৃত। তথাকথিত উদারনীতির নামে লালসা সৃষ্টি করার মত কোন পথই খোলা রাখা হয়নি। এখানকার মহিলারা বুঝেছে, হিজাব তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও মর্যাদার প্রতীক। বুঝেছে ইসলামী বিপ্লব মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণের উত্তম গ্যারান্টি। আজকের ইরান সিনেমা, সাহিত্য, শিল্পকলার মাধ্যমে মেয়েদের হিজাবে উদ্বুদ্ধ করছে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করে। ইমামের বাণীসমূহ ইরানের সমগ্র নারী সমাজকে হিজাবে উদ্বুদ্ধ করেছে সবচাইতে বেশী। ইমামের ভাষায় : 'শত্রুরা আমাদের শহীদের রক্তকে ততটা ভয় করে না যতটা ভয় করে আমাদের বোন ও মেয়েদের হিজাবকে। হিজাব শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।'

বিপ্লবের পর হিজাব প্রচলনে তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এর বিরুদ্ধে মহিলাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। অত্যন্ত মুখরোচক একটি শ্লোগান সামনে নিয়ে ময়দানে নামে। তাদের দাবী– 'স্বাধীনতার বসন্তে স্বাধীনতা চাই।' বামপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের প্ররোচনায় হাজার খানেক মহিলা পাশ্চাত্য পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর কয়েক দিন পরে দু'লক্ষ মহিলা হিজাব

www.pathagar.com

পরিহিত অবস্থায় হিজাবের সপক্ষে মিছিল বের করে ইসলামের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের এই ষড়যন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দেয়। আসলে ইরানে ইসলামী বিপ্লবকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৮ সালে ৮ সেপ্টেম্বর ব্লাকফ্রাইডে অর্থাৎ কালো শুক্রবারে তেহরানের রাজপথে গুলী চালিয়ে যে চার হাজার নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা হয়, তার মধ্যে ৬শ' জনই ছিলেন মহিলা। এত বড় কোরবানী দুনিয়ার কোন বিপ্লবে মহিলারা দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

মেয়েদের হিজাবে উদ্বুদ্ধ করে ইরান সরকার তাদের দায়িত্ব শেষ করে দিয়েছে এমন নয়। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক ও সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। মেয়েদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এমনকি সামরিক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে হাজার হাজার মেয়েকে। সেদিনের অবলা মেয়ে, তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকদের ক্রীড়নক অসহায় মেয়েরা কাঁধে বন্ধুক নিয়ে ইসলামী বিপ্লব ও জাতীয় ইজ্জত আযাদীর অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হয়েছে। তেহরানের মেয়েদের শালীন অথচ দৃপ্ত পদচারণা আমি অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি আর ভেবেছি, কি এক যাদুর স্পর্শে সমগ্র ইরানের ঘরে বাইরে একইভাবে এমন একটা বিপ্লব সংঘটিত হল।

ইরানের শিল্পকলা ও সাহিত্য থেকে অপসংস্কৃতিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়া হয়েছে। ইসলামী ভাবধারায় অবগাহন করে সঙ্গীত এখন ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে ব্যপ্ত হয়েছে। 'তুমি'র ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বেরিয়ে জাতীয় সত্তায় বিলীন হয়েছে। ভোগ বিলাসের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইরানের চলচ্চিত্র নতুন জগতে প্রবেশ করেছে। ইসলামের স্পর্শে চলচ্চিত্র আজ একটি জাতীয় শক্তি। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এমন ভোগ-বিলাসী ধারণার অবকাশ ইরানে নেই। আর্টের উদ্দেশ্য– মানুষ গড়ে তোলা। ইকবালের ভাষায়, 'আর্টের লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়ে তোলা তাহলে এ আর্টই হতে পারে পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার।' পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ইকবালের বাণীই যেন ইরানে বিমূর্ত। ইকবাল আরও বলেছেন– 'শামশিরই সনন আওয়াল তুসই রুবাব আখের।' অর্থাৎ 'তরবারী আর শৌর্যবীর্য একটা জাতির উত্থান এনে দেয় আর সেই জাতির পতনকে ত্বরান্বিত করে উদ্দেশ্যহীন গান বাজনা।' সম্রাট বাহাদুর শাহের জলসাঘরে যখন গজল আর ঠুংরীর রেওয়াজ হচ্ছে, এস্রাজ আর তানপুরার তারে তরঙ্গ তোলা ভৈরবীর আলাপে

www.pathagar.com

হায়দরাবাদের নিযামের দরবার যখন তন্ময়, নবাবরা যখন শরাবে বুঁদ হয়ে মদালস ঢুলু ঢুলু বিরস চোখে সুন্দরী সাকীর দিকে চেয়ে চেয়ে রুবাইয়াতে পাঠ নিচ্ছে, ঠিক সে সময়ই ইংরেজরা সমবেত বুটের আওয়াজ তুলে রাজপথ জনপদ গিরি-কান্তার পেড়িয়ে লাল কেল্লায় করেছে পদাঘাত। তারপর ২শ' বছর জিল্লতির শিকল পরিয়ে রেখেছে উপমহাদেশের মুসলমানদের। আজও তাদের দেয়া অপ-সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করছে। পৃথিবীর একটি মাত্র দেশ ইরান ১৪শ' বছর পর সমস্ত প্রভাব আর চক্রান্তের ব্যূহ ভেদ করে আপন মহিমায় ভাস্বর।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইরান এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে আপামর জনসাধারণের জন্য। পাশ্চাত্যের সেবাদাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীদের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে একই শিক্ষাপদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে সব প্রতিষ্ঠানকে। যেকোন শ্রেণীর মানুষের জন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবারিত।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুঁজিপতিদের আধিপত্য ও আমলাদের আধিপত্য বিলোপ করা হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শ্রমিক সাধারণের জীবনের মান পাল্টে গেছে পুরোপুরি। বামপন্থীদের একমাত্র হাতিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ইসলামী বিপ্লবের স্পর্শে পেয়েছে নতুন জীবনের সন্ধান। শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের বেতনের ব্যবধান কমিয়ে ১ ঃ ৩ এ সীমাবদ্ধ হয়েছে। এমনকি ৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের এক ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছে শ্রমিকদের জীবনবোধ বিকাশের উদ্দেশ্যে, নৈতিক ট্রেনিং দানের জন্য।

ইরানের কারাগারগুলো এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিপথগামীদেরকে এখানে বিভিন্নভাবে পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার অব্যাহত প্রয়াস আমরা কারাগারগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দেখেছি মুজাহেদীনে খালকের সদস্যদের ও তুদেহ পার্টির তরুণ কর্মীদের ওপর বল প্রয়োগ করে নয় বরং সদাচারের মাধ্যমে এদের মন-মগজে ইসলামী চিন্তা-চেতনা প্রবিষ্ট করানো হচ্ছে। আবেগ আর প্ররোচনার পথ পরিহার করে ক্রমশঃ তারা ইসলামী জীবনবোধের দিকে ফিরে আসছে। বেশ কিছু কারাবাসীদের সাথে আমাদের কথা হয়েছিল, তাদের সবার বক্তব্য ছিল প্রায় একই। তা হল– 'আমরা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি, পুরান মদের বোতল ভাংতে আমাদের একটুও সংকোচ নেই। বিদেশী আর বিজাতীয় গোলামী আর নয়, বিভ্রান্তির দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। ইমামের নির্দেশে আমরা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাব।'

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় কথা, কারাবাসীদের পরিবারবর্গদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অপরাধী পুত্র অথবা স্বামীর কারাদণ্ড হলে সরকারই সেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকে অথবা কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেয়। একটা অপরাধীকে শায়েস্তা করার জন্য আর পাঁচটা অপরাধীর জন্ম দিতে চায় না ইরান।

ইসলাম ও তাওহীদবাদের প্রকৃতিটা সম্ভবত আল্লাহ এমনই করে দিয়েছেন। যখন পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠী তাদের জিন্দেগী এবং তাদের সমাজে একে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে তখনই সেই জনগোষ্ঠীকে দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থবাদীরা জোটবদ্ধ হয়ে সর্বাত্মকভাবে উৎখাতের উদ্যোগ নেবে। এমনটি না হলে বুঝতে হবে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি নেই। মৃত লাশকে কেউ আঘাত করে না।

রাসূলে পাক (সাঃ) সেই সমাজেরই শ্রেষ্ঠতম মানুষ হয়ে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, হকের এই দাওয়াত কায়েমী স্বার্থবাদীরা কবুল তো করেইনি বরং সম্মিলিতভাবে ইসলামকে অঙ্কুরে বিনাশ করার চেষ্টা করেছে। জন্মভূমি ত্যাগ করে ২৬০ মাইল দূরে মদিনায় হিজরত করেও ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি তিনি।

স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে একই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বিজয় ছিনিয়ে আনতে ৭০ হাজার মানুষকে দিতে হল আত্মাহুতি, লক্ষাধিক মানুষ হল ক্ষত বিক্ষত। এরপরও শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব সংকট থেকে নিষ্কৃতি পেল না। দুনিয়ার সব কটি পরাশক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা সুপরিকল্পিতভাবে ইরানের সম্মুখে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি করল।

আমেরিকা ও তার দোসররা দুইভাবে তাদের স্বার্থে কাজ করতে শুরু করল। প্রথমত পাশ্চাত্য প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব সমূহের ভাবমূর্তি বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল– যেন ক্ষমতার চাবিকাঠি তাদের অনুচরদের হাতে এসে পড়ে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হল একই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত ইসলামী নেতৃবর্গ, যারা অনমনীয় ও অপোষহীন, যাদের বিবেককে কেনা সম্ভব হবে না, তাদের জীবননাশের পরিকল্পনা নেয়া হল। বিপ্লবের মাত্র দু'মাসের মধ্যেই ইসলামী ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম চীফ অব স্টাফ জেনারেল কারানীকে খুনীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। ইসলামী চিন্তাবিদ আয়াতুল্লাহ মোতাহারীকে খুন করা হয়। শহীদ হলেন মোফাত্তেহ, কাজী তাবাতাই, ডক্টর বেহেশ্‌তী, রেজাই

www.pathagar.com

ও বাহোনার-এর মত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। রাতের অন্ধকারে খুন হল বহু বিপ্লবী রক্ষী, তেহরান পরিণত হল সন্ত্রাসবাদের আখড়ায়।

বনীসদর ক্ষমতাসীন হয়ে আমেরিকার নীলনক্সা মত কাজ শুরু করল। সুপরিকল্পিত ভাবে ইমামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্যোগ নিল। বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র হনন করে এতে জাতীয়তাবাদী চরিত্র আরোপের চেষ্টা করা হল। জনগণকে লক্ষ্যচ্যুত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিআইএর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্রান্ত উপলব্ধি করতে ইরানের বিপ্লবী জনতার বাকি রইলো না। বিপ্লবী ছাত্ররা গোয়েন্দাবৃত্তির আড্ডাখানা তেহরানস্থ আমেরিকান দূতাবাস দখল করল। আমেরিকার জন্য ছিল এটা প্রচণ্ড আঘাত। যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা তৎপরতার দ্বারা বিস্তৃত প্রচারণা চালিয়ে আমেরিকা বিশ্ববাসীর সামনে আরব্য উপন্যাসের দানব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ল। যেন হিন্দুশাস্ত্রের বিশ্বসংহারী কালী মূর্তির বিসর্জন হল দূতাবাস দখলের মাধ্যমে। আমেরিকা ইরানের সম্পদ আটক করল। এতেও বরফ গললো না। জিম্মি উদ্ধার ও ইরানের কৌশলগত অবস্থানগুলোতে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত ষড়যন্ত্র খোদার মেহেরবানীতে তাবাসের মরু বালুকায় সমাধিস্থ হল।

এরপর আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠল। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার অবস্থান আর দৃশ্যের বাইরে রইল না। একদিকে উপর্যুপরি অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে এবং বনিসদরের কর্মকাণ্ড দিয়ে ধাপে ধাপে গোটা দেশকে অরাজকতার দিকে এবং অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল, অন্যদিকে ইরাককে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ইরানকে শায়েস্তা করতে চাইল। ঘরে বাইরে সবখানে সবদিক দিয়ে ইরানকে বিপর্যস্ত করে তুলল আমেরিকা।

আশির সেপ্টেম্বরে ভয়ঙ্কর আক্রমণের মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সূচনা করল ইরাক। বোমা আর গোলার আঘাতে বড় বড় শহরগুলো বিধ্বস্ত হল। কাসরে শিরিন, আবাদান, খুররম শহর, ইলম সালামচে, দেজফুল এবং নাফত শহরের ২০ লাখ মানুষ হল বাস্তুহারা। বিরাট বিরাট দালান গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হল। বোমা ও গোলার আঘাতে ধ্বংসের অবশিষ্টটুকুও বুলডোজার দিয়ে ধুলিস্যাত করা হল। চেঙ্গিশ আর হালাকুর প্রেতাত্মা যেন সাদ্দামের ওপর ভর করল। তাতারী আক্রমণের মুখে যেমন বাগদাদ জনমানবহীন বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হয়, সীমান্তের সমৃদ্ধ শহরগুলোতে ইরাক তেমনই নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখল। এইসব

www.pathagar.com

ধ্বংসস্তূপ আমি ব্যাপকভাবে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছি।

পাশ্চাত্যের সব কটি পরাশক্তির বিপরীত বলয়ে অবস্থান করেও প্রাচ্যের সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করল। মুসলমান হয়েও আমেরিকার ইঙ্গিতে ফাহাদ, হাসান, হোসেন, সাদাত প্রমুখরা প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করল ইরাককে।

একাশীর ২৮ জুন আমেরিকার চরেরা বোমা মেরে ডঃ বেহেশ্‌তীসহ ৭২ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে একইদিনে একই জায়গায় শহীদ করলো। জুমুআর নামাজের ইমাম আয়াতুল্লাহ মাদানী, আয়াতুল্লাহ যাদুকী, আয়াতুল্লাহ দস্তগীর, আয়াতুল্লাহ ইস্পাহানী সহ অগণিত দেশপ্রেমিক দ্বীনি আলেম ও গণনেতাদের হত্যা করা হল। শহিদী রক্তে সঞ্জীবিত হয়ে গর্জে উঠল সমগ্র জাতি। আমেরিকার দালাল বনিসদরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল। প্রতিঘাতের সম্মুখীন হল ইরাকের আগ্রাসী বাহিনী। ইসলামের সৈনিকরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল ইরাকের মাটিতে। কুচক্রীরা তখন শান্তির সপক্ষে যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মাধ্যমসমূহ, যারা এতদিন আগ্রাসনের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিল তাদের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন গান। আশির ১৩ জানুয়ারী দি টাইমসের সম্পাদকীয়তে লেখা হল– Never invade a revolution. বিপ্লবকে আঘাত করোনা। একই সম্পাদকীয়তে বলা হল– Unexpected resistance offered by the Iranian in the face of Iraqui armoured advances. ইরাকী গোলন্দাজের আক্রমণের মুখে ইরানের প্রতিরোধ অপ্রত্যাশিত।

ইরানে আমরা সপ্তা দুয়েক অবস্থান করেছি। এ সময়গুলোতে মনে হয়েছে আমি আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেছি আমার আপন গৃহে। ইরানের মনুষগুলোকে মনে হয়েছে আমার আত্মার আত্মীয়। মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি ২ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত এই দেশটিতে আমি একজন অতিথি। এখানে স্পন্দিত হতে দেখেছি আমার আত্মার প্রতিধ্বনি, দেখেছি আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের বিমূর্ত প্রকাশ। কত সৌভাগ্যবান এদেশের মানুষ। এদের জীবন, এদের মৃত্যু, এদের সংগ্রাম, এদের সাধনা এক মহান লক্ষ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই মাটিতে মরণেও সুখ, বেঁচে থাকায় নিবিড় প্রশান্তি, সংগ্রামে অপূর্ব শিহরণ। আমার মনে হয়েছে– আমৃত্যু এখানে যদি থাকতে পারতাম। কিন্তু আজকেই ইরানে আমার

www.pathagar.com

অবস্থানের শেষ দিন আগামীকাল ২২ আগস্ট স্বদেশের উদ্দেশে বিমানে চাপতে হবে।

আবার ভাল করে দেখার ইচ্ছা জাগলো। শেষ বারের মত দেখার ইচ্ছা হল এদেশের স্বাধীন মানুষগুলোর দৃপ্ত পদচারণা। পথে নামলাম। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে হাঁটছি। শোহাদা স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি। দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো ইমামের প্রতিচ্ছবি। কত বিচিত্র শৈল্পিক আখরে পুরিপূর্ণ হয়ে আছে দেয়ালগুলো। ইংরেজী ফারসীতে লেখা অজস্র শ্লোগান। আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ছাড়াও অজস্র কোরআনের উদ্ধৃতি, যেদিকে তাকাই সেদিকে চোখ পড়ে। ইংরেজীতে লেখা Neither East nor West, Islam is the best. এ শুধু দেয়ালের লিখন নয়। দুই পরাশক্তিকে ইরানীরা দুই কনুইয়ের গুতোয় দুই প্রান্তে সরিয়ে রেখেছে। ঐশী নির্দেশকেই তারা মনে করে তাদের একমাত্র পথ। ইতিহাসের গতিধারায় মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক পথ পরিক্রম করে ইসলাম আজকের ইরানে যেন সেনথিসিসের অনিবার্য পরিণতি হয়ে এসেছে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে তো এটা এমনিতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ থিসিস, সমাজতন্ত্র এন্টিথিসিস, ইসলাম সেনথিসিস। যে কোন বিচার বিশ্লেষণে ইসলাম একটি তৃতীয় স্রোত, আল কোরআনের ভাষায় মধ্যপথ।

একটা দেয়ালের লিখন চোখে পড়ল। ইরানের বিপ্লবী জনতার এই লিখন সমাজতন্ত্রের আবেগে তাড়িত দুনিয়ার নিগৃহীত মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। জুলুম নিপীড়ন শোষণ বঞ্চনা অবসানে সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া ইজারাদারীর বিরুদ্ধে এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ বলতে হয়। দেয়ালে লেখা ছিল– Mr. Marks, Is riligion opium of the society? Arise and see, the religion has created a revolution, not economic forces. মিঃ মার্কস, ধর্ম কি সত্যি আফিম! ওঠো, উঠে দেখ, অর্থনৈতিক শক্তি নয়, ধর্মই সৃষ্টি করেছে একটি বিপ্লব।

আমি পড়লাম। বার বার পড়লাম। মনে হল আমার দেশের বিপ্লবী তরুণদের জন্য অনেক কিছু পেয়ে গেছি। এক নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। আগামী কাল ঢাকায় ফিরে যাব।

www.pathagar.com

নয়

'দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।' এ শুধু জাতীয় কবি কাজী নজরুলের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের প্রাণের অভিব্যক্তি। বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের আবেগ বিদ্ধৃত হয়েছে কাজী কবির সেই মরমী গানের প্রথম কলিতে কিন্তু কজনের ভাগ্যে জোটে। আজন্ম লালিত এ স্বপ্ন ছিল আমার, মার ইচ্ছে ছিল, আমি জেল থেকে বেরুলে আমাকে নিয়ে হজ্জে যাবেন। রসূলের দেশে। রসূলে পাকের (সাঃ) পদচারণায় পবিত্র মাটির সাহচর্যে হাবীবে খোদার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত নির্মল হাওয়ার সংস্পর্শে সেই আরাফাত, সেই খানা-এ-কাবা, সেই রওজা মোবারক, সেই মসজিদে নববীতে আমাকে নিয়ে মায়ের ঘুরার কত যে সাধ ছিল সে আমি জানি। সেই অপূর্ণ সাধ বুকে নিয়ে মা আমার চির নিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে গেছেন। মা ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু মায়ের সেই স্বপ্ন, সেই সাধ আমার মধ্যে প্রবাহিত রেখেছেন। বাইরে এসে মুক্ত আলো বাতাসেও মায়ের সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণ সাধকে ঘুমাতে দিইনি। সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম।

ইতিমধ্যে ইরান সফর শেষ হয়েছে। রক্ত আর আগুনের তুফান বছরের পর বছর বয়ে চলেছে যে মাটিতে। সেই শহীদী খুন আর খাকের ছোঁয়া নিয়ে আমার সংগ্রামী চেতনাকে শানিত করে এসেছি। এখন রসূলের দেশের উত্তপ্ত বালুকায় দাঁড়িয়ে লু হাওয়ার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাঁটি হতে চাই, নিখাদ করতে চাই আমার প্রত্যয়কে। এর জন্য দিন রাত আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছি। আল্লাহর রাস্তায় চলা মুসাফিরের নিজের ইচ্ছা বলে তো কিছু থাকতে নেই। ৪০ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত একজন কয়েদীর ১০ বছরের মধ্যেই খালাস হল, সেওতো আল্লাহর ইচ্ছা। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আমার মালিকের সাথে আমি একাকার হয়ে গেছি। তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করেছি নিজেকে। আমার মায়ের অন্তিম ইচ্ছা এই হজ্জ্ব পালনের সুযোগ তিনিই আমাকে করে দিয়েছেন। নিয়মনীতির বেড়া ডিঙিয়ে হজ্জের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। এক পা এক পা করে সেই দিনটিও এসে উপস্থিত।

www.pathagar.com

বিরাশির ১৪ অক্টোবর। তখন রাত। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উপস্থিত হলাম। আমি ও কাজী আজিজ ভাই, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ ভাইয়ের সহযোগিতায়। আলোয় ঝলমল চারিদিক। একটা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার রমণীর মেকআপ করা মুখ যেন এই ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। মনে হল, দারিদ্র-স্পর্শতায় বিবর্ণ, বিবস্ত্র রমণীর মুখাবয়বে বেনারসীর ঘোমটা। গোটা দেশে অন্ধকারের অমানিশা আর এখানে আলোর বন্যা। মনে হল জীর্ণ দেহটার সমস্ত রক্ত সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে এনে সমস্ত মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কি বিচিত্র এদেশ সেলুকাস! 'নিরানব্বই'-এর ঘাড়ে পা রেখে 'এক' এমনি করে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত আর কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে?

ডাঃ মঞ্জুর ভাই যিনি এই শীতের রাতে কষ্ট স্বীকার করে বিমান বন্দরে আমাদের নিয়ে এলেন এবং আমাদের বিমান আকাশে পাখা মেলার পরেও আজকের রাতটা বিমান বন্দরেই তাকে কাটাতে হবে। এই মঞ্জুর ভাই তার কথা বলতে গিয়ে একসময় আমাকে জানিয়েছিলেন তার জীবনের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা। মঞ্জুর ভাই পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য হিসেবে ঢাকা কলেজ শাখায় কাজী আজিজ ভাইয়ের নেতৃত্বে কাজ করতেন। সাহসী কর্মী হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আজিজ ভাইয়ের সাথে কারাবরণ করেন। '৭১ সালে জাতির সংকটকালে ব্লাক ১৬ ডিসেম্বরের পর তার প্রতিবেশী তাকে মুক্তিফৌজের হাতে ধরিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে অত্যন্ত অশালীনভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছিল। এসময় তিনি দৃঢ়তার সাথে তার ভূমিকা যে সঠিক ছিল সেকথা ব্যক্ত করেন। তিনি এও বলেন যে, 'ঈমানী দায়িত্ব মনে করেই আমরা দেশ ও জাতির আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই কাজ করেছি। আমাদের ভূমিকা ছিল নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই উৎসারিত। আপনাদের সাথে আমাদের পার্থক্য শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির।' এভাবে মঞ্জুর ভাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কোন রকম রাখঢাক না করে যথার্থ জবাব দিয়েছিলেন। তাকে আলবদর কমান্ডার হিসেবে পৃথকভাবে রাখা হয় কিন্তু আল্লাহর কুদরতে তিনি সেখান থেকে অলৌকিকভাবে সাধারণ বন্দীদের সাথে মিশে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। বর্তমানে তিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে সুখ্যাতির সাথে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

www.pathagar.com

রাত ১০টায় বাংলাদেশ বিমানের এক বোয়িং এ আমরা পা রাখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসে ভর দিয়ে বিমান প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলল। ভোর হয় হয়। সূর্যটা তখনও উঠেনি। ঘোষণা শুনলাম– 'কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান জেদ্দার মাটি স্পর্শ করবে। যে যার সিটের বেল্ট বেঁধে নিল। আমি ইচ্ছে করেই বাঁধলাম না।' কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। বুঝলাম বোয়িংটি মাটি স্পর্শ করেছে। আজিজ ভাই বললেন– এসে গেছি। পা পা করে দরজার কাছে এগিয়ে চললাম। নেমেই বিমান বন্দরের গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীটি নিয়ে এল আমাদের গন্তব্যের দোর গোড়ায়। কাস্টমস ও অন্যান্য অফিসার আমাদের মালামাল চেক করলেন। চেক করলেন কাগজপত্র। অনেক বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের মধ্যে সউদী অফিসাররা সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাদের ব্যবহারে শালীনতা ও সভ্যতার অভাব দেখলাম। হতে পারে, আমরা তাদের দৃষ্টিতে মিসকিন দেশের মানুষ বলে আমাদের প্রতি তাদের আচরণ এমনটি। তাছাড়া এরা দেখেছে আমাদের নেতৃবৃন্দকে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাদের শাহী দরবারে ধর্ণা দিতে। এরপরে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অসৌজন্যমূলক আচরণ যদি করে থাকে তাতে ওদের দোষ খুব একটা দেয়া যায় না।

বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আমরা মক্কার উদ্দেশ্যে একটা গাড়ীতে উঠলাম। প্রশস্ত আর মসৃণ পথ। প্রচণ্ড গতিতে গাড়ী এগিয়ে চলছে। কিন্তু ঝাঁকুনির লেশমাত্র নেই। দু'পাশে সবুজের সমারোহ। আমাদের দেশের মত অকৃত্রিম প্রকৃতির অবিন্যস্ত সৌন্দর্য নেই। ধনকুবেরী শাহী খেয়ালে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে গাছগুলো লাগান হয়েছে। গাড়ী এগিয়ে চলছে। সিনেমার পর্দার মত পারিপার্শিক দৃশ্যগুলো অত্যন্ত দ্রুত পিছু হটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মরুভূমির শূন্যতা আর মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত মরুদ্যান চোখে পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকালাম, ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। সামনে ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়গুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে। এক সময় আমাদের গাড়ী পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে এসে পড়ল। এবার দু'পাশে পাহাড়। পাহাড়গুলোতে ঘর বাড়ী। প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই, নতুন নতুন ডিজাইনে এগুলো তৈরী। মক্কা শহরে এসে পড়লাম। মনটা অনাবিল পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়ী খানা-এ-কাবার কাছাকাছি এসে থামল। আমরা সকলে খানা-এ-কাবার চত্বরে প্রবেশ করলাম। তওয়াফ শেষে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মিম্বার সামনে রেখে

www.pathagar.com

দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। এই মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি খানা-এ-কাবার নির্মাণ কাজে তদারকী করতেন।

কোন পরিচিত মুখ চোখে পড়ে কিনা এমন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা খানা-এ-কাবার আশেপাশে ঘুরাফিরা করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মালেক ভাইকে আমার চোখে পড়ল। কোন এক সময় তিনি ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলেন, এখন জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। কারাগারে থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে তিনি আমার সাথে দেখা করতেন। মালেক ভাই আমাকে নিয়ে শহীদ ভাইয়ের বাসায় গেলেন। শহীদ ভাই মক্কা মোয়াজ্জেমায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিশেষ প্রতিনিধি। সউদী আরবে কর্মরত জামায়াত সমর্থকদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা তার কাজ। শহীদ ভাই আলবদর ছিলেন। ঢাকা কারাগারে তার সাথে আমার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে দেখে বিস্মিত হলেন। আমার উপস্থিতি অবিশ্বাস্য ঠেকছিল তার কাছে। কেননা ১০ বছরের মধ্যেই আমি ছাড়া পাব এমন ধারণা তার ছিল না। আমাকে পেয়েই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর জানতে চাইলেন আমার মুক্তির ইতিবৃত্ত। খুলে বললাম। সংগঠনের সাথে সম্পর্কের কথা জানতে চাইলেন। তাও বললাম। কিন্তু আমার উত্তর শুনে আমাকে মুরতাদ ভাবলেন কিনা জানিনা তবে খুশী যে হতে পারলেন না, বুঝা গেল স্পষ্ট। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন– আমরা আপনার কাছে এমন কিন্তু আশা করিনি, সংগঠনের অগ্রগামী ভূমিকায় আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম।

বললাম– আমিও এমন প্রত্যাশা নিয়ে জেলখানায় মুক্তির প্রহর গুনেছি। কারা প্রকোষ্ঠে থেকেও আমি জামায়াতের দাওয়াত দিয়েছি। তরবিয়তী প্রোগ্রাম চালু রেখেছি। বাইরে এসে অনেক চেষ্টা করেও এ্যাডজাস্ট করতে পারলাম না। দীর্ঘ দিন ধরে যে বিপ্লবী চিন্তা চেতনা অনেক ঝড়-ঝাঁপটার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছি, সেটাকে বিপ্লব বিমূখ কোন সংগঠনে জড়িয়ে নষ্ট করতে চাইনি। এটা যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে হয়তো হয়েছে খোদার কাছেই এর জবাবদিহি করব।

শহীদ ভাইয়ের সাথে কোন উত্তপ্ত আলোচনায় জড়াতে চাইনি। তিনিও প্রসঙ্গটা বেশী দূর গড়াতে চাইলেন না। তিনি আমাদের জন্য মেহেরবানী করে থাকা খাওয়ার আয়োজন করে দিলেন। যদিও ব্যয়টা আমাদেরই বহন করতে হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট সৌদী আরবে অবস্থানরত বাঙালীরা আমাদের

www.pathagar.com

কাছে আসতে লাগলেন। দেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা, জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। আমরা জামায়াত বিরোধী কোন মিশন নিয়ে সৌদী আরবে এসেছি এমনটি নয়। অথচ প্রসঙ্গ আসাতে আমাদের অনেক কিছু বলতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে প্রকারান্তরে খাটো করার জন্য জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতার লক্ষ্য কি? সৌদি আরবের মদদকে অব্যাহত রাখার জন্য তথাকথিত ডেজার্ট ডেমোক্র্যাসী নিয়ে মাতামাতি কেন? তরুণদের ক্ষুরধার চেতনাসমূহে মরচে ধরানোর আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র কোন লক্ষ্যে? ইসলামের সামগ্রিক আবেদন বাদ দিয়ে পুরান কায়দায় পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নিয়ে রাজনৈতিক চর্চার উদ্দেশ্য কি? আয়েশী জীবন যাপনের জন্য জেহাদের ময়দান ছেড়ে জামায়াতের সংগ্রাম বিমূখ বাণিজ্যিক কর্মসূচীর প্রবণতা কোন দিকে? আমাদের আলাপ আলোচনায় বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন জামায়াত সমর্থক ও কর্মীদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

শহীদ ভাই অনুভব করলেন যে আমরা এখানে থাকলে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। হয়তো আগামীতে চাঁদা দেওয়াও বন্ধ হতে পারে। এমন সম্ভাবনা আঁচ করে আমাদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। অবস্থা দেখে আমার মনে হল যে তিনি আরও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। পুলিশকে সংবাদ দেয়াও বিচিত্র নয়। শাহী পুলিশেরা বিপ্লবী মানসিকতার বহু লোককে নির্বিচারে খুন করেছে এমন ইতিহাসও আছে। আমি ও আজিজ ভাই পরামর্শ করে সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

ইতিমধ্যে ইরানীদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। ইসলামের মূল প্রাণশক্তির দিকে বিশ্বের মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য ইরানীরা লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে হাজীদের আহ্বান জানাতেন। এ ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের সেবাদাস প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব-জনমত সৃষ্টির জন্য ইরানীরা সক্রিয় ছিল। আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে তাদের এই মহৎ কাজে শরীক হলাম।

একদিন আমি কিছু লিফলেট নিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের মধ্যে বিলি করছি। এমন সময় দেখলাম, কিছু পুলিশ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আরও দেখলাম তারা নড়েচড়ে উঠল। চারিদিক থেকে পুলিশ আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

www.pathagar.com

তাদের গতিবিধির ওপর রয়েছে আমার সতর্ক দৃষ্টি। বেকায়দা অবস্থা আঁচ করে জনতার ভিড়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে হারিয়ে গেলাম। তারপর সুযোগ বুঝে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে গেলাম অনেক দূরে।

কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। আমাদের কি মনে হল, শহীদ ভায়ের বাসায় ইচ্ছে করে এলাম। হতে পারে এটা অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া, প্রাণের টানও বলা যায়। কেননা এক সময় আমরা পরস্পরের সহযোগী হয়ে একই আন্দোলন এবং অনুভূতির একই স্তরে দাঁড়িয়েছিলাম।

দেখলাম মওলানা মোহম্মদ আলী ভাই ও অধ্যাপক ইউসুফ আলী ভাই আসছেন। দেখে খুশীই হলাম। তারাও আকস্মিকভাবে আমাকে খোদ মক্কায় দেখে হতবাক। অবশ্য বিমূঢ় বলা যাবে না। কেননা এখানে আমার আসাটা তেমন আহামরি কোন ঘটনা নয়। মোহাম্মদ আলী ভাই বললেন– 'উপরে আসেন।' আমার ওপর তার আদর্শিক দাবী নিয়ে তিনি হয়তো উপরে আসতে বললেন কিন্তু আমি বড় ভাইয়ের আদেশ মনে করে তাকে অনুসরণ করলাম। সাথে আজিজ ভাইও রয়েছেন।

মোহাম্মদ আলী ভাই আন্তরিকতার সাথে কথা পাড়লেন। বললেন– 'আমরা তো রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর দাওয়াতে এসেছি। পাকিস্তান থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মিয়া তোফায়েল আহমদ সাহেবও এসেছেন। কিন্তু আপনারা?' প্রশ্ন রাখলেন তিনি।

বললাম– 'অন্যান্যরা যেমন এসেছেন আমরাও ঠিক তেমনি এসেছি। তবে এই ফাঁকে জেহাদের ফরজ এক আধটু আদায় করার চেষ্টা করছি।'

জিজ্ঞেস করলেন– 'তার মানে?'

বললাম– 'ইরান পবিত্র মক্কাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিপ্লবের সপক্ষে যে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে চাইছে আমরা তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশীদার।' মোহাম্মদ আলী ভাই চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন– 'কি বলতে চাচ্ছেন?'

আমরা সুপস্পষ্টভাবে কোন রকম রাখঢাক না করে বললাম, রুশ-মার্কিন-ইসরাইল ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি। প্রতিক্রিয়াশীল তাবেদার আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও আমরা সোচ্চার। ইসলামের পবিত্র এলাকাসমূহ বিশেষ করে খানা-এ-কাবাকে তাবেদারীর মসিলিপ্ত রাজতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করতে চাই।' আমাদের প্রতিটি শব্দ যেন মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের কলিজায় তীরের

www.pathagar.com

মত বিদ্ধ হল। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। তার মস্তিষ্কে যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন– 'আপনারা জানেন ইরানীরা শিয়া?' বেশ কিছু দুর্বল হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে তার কথার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। শয়তান কোথায় বাসা বেঁধেছে তার উক্তি থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝে ফেললাম। কোরআনে বলা হয়েছে– 'শয়তান ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে আক্রমণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে।' বিপ্লব-বিমুখ অলস মস্তিষ্কে শয়তান ডেরা বাঁধবে এটাই তো স্বাভাবিক। এক ভয়াবহ কারবালার পথ অতিক্রম করে, শত শত বছরের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটানো ইরানের নতুন সূর্যোদয় যাদের চোখে পড়েনা, বুঝতে হবে তারা এখনও কোন শরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। অথচ সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এরাই এক নতুন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখে আসছে।

আজিজ ভাই বললেন– 'ইরানীরা শিয়া এটা নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সবাই জানে। ইমাম খোমেনী সুন্নীর দাবী করেছেন এমন ঘটনা আমার জানা নেই। তবে আপনাদের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রশ্ন একটাই, যা খুলেমেলে আপনারা বলছেন না। তা হল– শিয়ারা কোন অধিকারে ১৪শ' বছর পর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করল? সুন্নী রাষ্ট্রসমূহে মদ, জুয়া মেয়েদের বেলেল্লাপনা, পুঁজিবাদী শোষণ, সমাজতান্ত্রিক নিপিড়ন কায়েমীভাবে বহাল থাকা সত্ত্বেও আয়াতুল্লাহ খোমেনী এসব উৎখাত করলেন কেন? কে অধিকার দিল তাকে? খাদেমুল হারামাইন সৌদি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পদলেহন করা সত্ত্বেও মার্কিনীদের ঘাঁটি সমূহ উৎখাত করা হল কেন? এ প্রশ্নগুলোর জবাব সত্যিই কঠিন। কাজগুলো কাফের ছাড়া আর করবে কে?'

আমাদের কথা শুনে মোহাম্মদ আলী ভাই একটু নরম সুরে বললেন– 'ইরানের ইসলামী বিপ্লব নির্ভেজাল ইসলামী বিপ্লব কিনা সেটা সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনও সময় আসেনি, আরও আমাদের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন।'

বললাম– 'সাম্রাজ্যবাদীর কালো হাত ইরানের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। আপনারা চাচ্ছেন ইরান বিধ্বস্ত হলে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যুগের পর যুগ গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিবেন ইরানী বিপ্লব ইসলামী ছিল কিনা, এইতো! বিপ্লবের ৩ বছর পরও যারা বিপ্লব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারা তাদের নিজস্ব আন্দোলনকে কোনদিনও তার মঞ্জিলে নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামীর

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাতা ও মূল ব্যক্তিত্ব মওলানা মওদূদী যখন ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে 'হৃদয়ের স্পন্দন' বলে বর্ণনা করেছেন সে ক্ষেত্রে সেই বিপ্লব সম্বন্ধে আপনাদের অনিহা থেকে কি আঁচ করব আমরা।'

মোহাম্মদ আলী ভাই এবার বলেন– 'শিয়া সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া ইসলামের নামে কোন কিছু ঘটলে এ নিয়ে আমাদের মাতামাতি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনারা যেখানে সহজ উপলব্ধি নিয়ে চিন্তা করবেন, আমাদের সেখানে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে।'

আমরা বললাম– 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর সতর্কভাবে মন্তব্য করতে হবে এ সত্যটুকু মেনে নিলেও এটা বলতে হয়, ইখওয়ানুল মুসলেমীনের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে আপনারা যেমন মাতামাতি করেছেন, সেই একই দাবী নিয়ে ইরানীরা আপনাদের নৈতিক সমর্থন আশা করে। কেননা ইসলামের জন্য তাঁদের কোরবানী সবচাইতে বেশী। নির্ভেজালের প্রশ্ন তুলতে পারেন। রাসূলুল্লাহর প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া নির্ভেজালের দাবী আর কেউ করতে পারে না। এমন কি জামায়াতে ইসলামীও প্রশ্নাতীত নয়। আমরা মনে করি, ইসলামের আওয়াজ পৃথিবীর যে প্রান্তে আর যার দ্বারা উত্থিত হোক না কেন, তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিরীক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন দেয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বানুভূতি যাদের ভেতরে নেই, তাদের সম্বন্ধে এটাই ভাবতে হবে যে, হয় তারা পরিস্থিতি সম্বন্ধে গাফেল নয়তো কোথাও তাদের বিবেক বন্ধক হয়ে আছে। আপনাদের সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য রাখতে চাইনা। শুধু এটুকু বলতে চাই আমাদের সচেতন বিবেকের উপলব্ধিকে আহত করার চেষ্টা করবেন না। এমন একদিন ছিল, আপনাদের কথায় অন্ধের মত চলেছি। এত ঝড় ঝঞ্ঝা, এত ঘাত-প্রতিঘাত, এত চড়াই উৎড়াইয়ের মধ্যে এগিয়ে আসার পর আজও আপনারা চান আমরা আপনাদেরকে অন্ধের মত অনুসরণ করি। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। আপনাদেরকেও আমরা বাজিয়ে দেখব আপনারা কতখানি নিখুঁত, কতখানি নির্ভেজাল।

আলোচনা আর বেশী দীর্ঘায়িত করতে চাইলাম না। এতে তিক্ততা বাড়বে বৈ কমবে না। আমরা শেষ করতে চাইলাম। তারাও এমন চাচ্ছিলেন। কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সমাপ্তি ঘটল। আলোচনার শুরুতে যে আন্তরিকতা ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট হওয়াতে শেষটায় আর তেমন থাকল না। আমরা ফিরে এলাম আমাদের অবস্থানে।

www.pathagar.com

মক্কায় থাকা অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে হতো। কেননা সাম্রাজ্যবাদী চক্র এখানেও তৎপর। তাবেদার সউদী বাদশাহ তার গোয়েন্দা বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের খুঁজে বের করার জন্য। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সন্ধানী চোখ থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে আমরা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কাজ করে চলেছি। বাংলাদেশ হাজী সমিতির সভাপতি জনাব কাজী আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক আমি হাজীদের বিভিন্ন শিবির ঘুরে ঘুরে হজ্জের সত্যিকার স্পিরিট এবং এর আন্তর্জাতিক মূল্য বিশ্লেষণ করেছি। বুঝিয়েছি হজ্জ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়। একে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসাবে তুলে ধরেছি। পৃথিবীর মুসলমানদের সমস্যা এখানে উপস্থাপিত হতে হবে। মক্কা মোয়াজ্জমা মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়। সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে কোথাও কোন মুসলমান তার স্বাধীন বক্তব্য রাখতে না পারলেও হজ্জে এসে নির্বিঘ্নে দুনিয়ার মুসলমানরা তাদের সমস্যা উপস্থাপন করবে, দুনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য কামনা করবে, সমস্ত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু হোয়াইট হাউসের ইঙ্গিতে স্বঘোষিত খাদেমুল হারামাইনের প্রতিক্রিয়াশীল তাবেদার সউদী শাসকগোষ্ঠী সেটা হতে দিতে চায় না। তার ঝুলির বিড়াল বেরিয়ে আসতে পারে অথবা প্রগতিশীল ইসলামী শক্তিসমূহকে পেছন দিক থেকে আঘাত হানার জন্য জুব্বার ভেতরে লুকান কৃপাণের সন্ধান দুনিয়ার মুসলমানরা পেয়ে যেতে পারে। এমন এক আশঙ্কায় সউদী শাসকেরা শঙ্কিত। এই আশঙ্কা ছিল আবু লাহাব, আবু জেহেলের। ইসলামের বিজয় সূচিত হলে তাদের কায়েমী স্বার্থ ও কর্তৃত্বের ভিত উপড়ে যাবে।

যাইহোক, আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে ইরানীদের সাথে যৌথ কর্মসূচী নেয়ার জন্য তাদের সাথে বিভিন্ন গোপন বৈঠকে মিলিত হচ্ছি। একদিন সিদ্ধান্ত নেয়া হল আগামীকাল একটা মিছিল বের করা হবে। কথা হল– যেখানে প্রায় ১০টা রাস্তা এসে মিশেছে সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে একটা মিছিল পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে মক্কা মোয়াজ্জমার প্রধান সড়ক পরিক্রম করবে এবং হেরেম শরীফে নামাজ আদায় করবে। কিন্তু হাজার হাজার পুলিশের সন্ধানী চোখ এড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল কি করে সম্ভব হবে? কিন্তু সেটাও সম্ভব হল। নির্দেশ ছিল– আশে পাশে বিভিন্ন কাজের অছিলায় সবাইকে অবস্থান করতে হবে। মিছিল

www.pathagar.com

শুরু হওয়ার ৫ মিনিট আগে বিদ্যুৎগতিতে সমবেত হতে হবে ঐ মোড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে মিছিল এগিয়ে যাবে। যেই কথা কাজও ঠিক তেমনি হল। মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমে গেল। মিছিল এগিয়ে চলছে। পুলিশ কিছু বুঝবার আগেই মিছিল গতি পেয়ে গেছে। লক্ষ জনতার ঢল। এ ঢল 'রুখবি কি দিয়া বালির বাঁধ।'

গতি রুখা সম্ভব হল না। মিছিল এগিয়ে চলছে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর বিভিন্ন প্রস্তুতি ছিল। ছাদের উপর ইট পাটকেল নিয়ে সাদা পোষাকে পুলিশ বাহিনী তৈরী ছিল। তৈরী ছিল গরম পানির গাড়ী। রাবার বুলেট নিক্ষপ করার জন্য পুলিশেরাও ছিল প্রস্তুত। মিছিল এগিয়ে চলছে, একযোগে হামলা শুরু হল। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হল শত শত মানুষ। ইরানী স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল শুধুমাত্র আহতদের হাসপাতালে পৌছানোর জন্য নিয়োজিত ছিল। তারা বিদ্যুতবেগে তাদের কাজ করে চলেছে। পুলিশের বিরাট বিরাট দল মাঝে মাঝে আকস্মিক বেষ্টন দিয়ে গ্রেফতার করছে মিছিলকারীদের কিছু কিছু লোককে। কিন্তু তবু মিছিলের গতি অনিরুদ্ধ। মিছিল এগিয়ে চলছে। আমাকে পুলিশ বেষ্টন করল। তাদের এক কথা 'হিন্দ হিন্দ' অর্থাৎ আমি হিন্দুস্তানী। আমার পোষাক আশাক থেকে তারা এমন আন্দাজ করেছিল। আমার পরনে ছিল আলীগড়ি পায়জামা আর পাঞ্জাবী। আমি পুরোপুরি পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে, পালানোর কোন পথ নেই।

হঠাৎ দেখলাম, মিছিলের হাজার হাজার মানুষ পুলিশদের ঘেরাও করে ফেলেছে। টানা-হেঁচড়া আর হাতাহাতি চলছে। এক ফাঁকে আমি কেটে পড়লাম। ইরানীরা পুলিশের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য এমনটি করেছে বলে আমার মনে হল। মক্কা নগরী শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল। মিছিল এগিয়ে চলেছে। এ যেন রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই মক্কা বিজয়ের দিন। সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী মিছিল হেরেম শরীফে এসে শেষ হল।

আমরা সবাই আরাফাতে রওয়ানা হলাম। হেঁটেই চলেছি। পায়ে হেঁটে ১ ঘন্টায় পৌছান যায়। পাহাড়ের পথ কেটে কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। দুনিয়ার মুসলিম এক জামায়াতে নামাজ আদায় করলাম। দুনিয়ার সাদা-কালো, আমীর-গরীব, বাদশাহ ফকীর আরাফাতের উন্মুক্ত অঙ্গনে এসে একাকার। ইসলামের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের সুমহান আবেদন এখানে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। উত্তপ্ত রোদের প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও কি এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করলাম। সেটা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

মিনায় এসে নজরুলের একটি কবিতার প্রথম চরণ মনে পড়ল– 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।' কোরবানীর এত বিপুল আয়োজন কেন? কেন লক্ষ লক্ষ পশুকে মিনার ময়দানে জবেহ্ করা হয়? শুধুমাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নতকে সমুন্নত রাখার জন্য? না, তা নয়। খোদার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানী দেয়ার এক মানসিক প্রস্তুতি। এখানকার পশু কোরবানী একটা প্রতীক মাত্র। এ কোরবানীর অর্থ খোদার দরবারে পুনরায় অঙ্গীকার করা যে, মওলা আমরা প্রস্তুত, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা প্রস্তুত।

এখানে এসে হাজীরা প্রায় প্রত্যেকে কোরবানী দিল। লক্ষ লক্ষ পশু জবেহ্ হল এখানে। আমরা রোজা রেখে কোরবানীর দায়িত্ব এড়িয়ে গেলাম। এখানে হাজার হাজার টন গোশত্ আর লক্ষ লক্ষ পশুর চামড়ার অপচয় দেখে আমার খারাপ লেগেছে। মওলানা মওদূদীর পরামর্শে সউদী সরকার গোশত্ সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ ব্যাপারে দুনিয়ার মুসলমানদের চিন্তা-ভাবনা করে সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া উচিত। অবশ্যি পবিত্র মক্কা মদীনার খাদেম কোন এক বিশেষ রাষ্ট্র হলে দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব তেমন থাকে না।

কোরবানীর অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা মুজদালেফায় রওয়ানা হলাম। সেখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে নৈশ এবাদত।

"আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।" যেন আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড়গুলো ঘুমিয়ে আছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। ছোট বড় পাহাড়ের বিচিত্র সমাবেশ এখানে। মানুষ স্বাধীনভাবে যে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান নিয়ে নৈশ এবাদতে মশগুল হয়ে গেছে। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারকা যেন পর্যবেক্ষকের মত পাহারা দিচ্ছে। রাতের প্রত্যেকটি মানুষের এবাদত বন্দেগীর এক একটি সাক্ষী যেন ওরা। এত বিরাট গণ-সমাবেশ অথচ নিঃশব্দ চারিদিক। নৈসর্গিক পরিবেশে সারারাত এবাদত করলাম। প্রাণভরে ডাকলাম আমার প্রভু, আমার মওলা, আমার মালিককে।

মুজদালেফা থেকে মিনায় আবার ফিরে এলাম। মিনা থেকে মক্কায়, তারপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দু'পাশে বালি আর বালির সমুদ্র। পাড়ি দিচ্ছি আমরা। আজ থেকে ৫০ বছর আগে এই দুর্গম মরু পার হত মানুষ উটের পিঠে। তখন কী দুঃসহ ছিল এই পথ-পরিক্রমা। আল্লাহর কাছে আমাদের শুকরিয়া যে

www.pathagar.com

তিনি বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখে মানুষের কষ্টকে কত লাঘব করে দিয়েছেন।

যাইহোক আমরা মদীনায় এসে পড়লাম। এসেই গভীর আগ্রহে মসজিদে নববীর দিকে এগুলাম। এই সেই মসজিদ, নবী করীম (সাঃ) এখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এখান থেকেই সৈন্য পরিচালনা করে সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ভিত্তি উপড়ে ফেলেছেন। প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ এখান থেকে দেয়া হত। এখানে বসেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎকার দিতেন। এখানেই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এই মসজিদ থেকেই পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টেছেন তিনি।

কিন্তু যেদিন মসজিদ থেকে প্রশাসনকে বিচ্ছিন্ন করা হল সেদিন থেকেই অধঃপতিত হল ইনসাফ। একপা একপা করে অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলল ইসলাম ও মুসলমান! আল্লাহর অনুশাসন বদলে এল ব্যক্তিগত মর্জি আর খোশ-খেয়াল। এক কথায় স্বৈরাচার। ইকবালের ভাষায়– 'জুদা হো দ্বীন সিয়াসাত সে তো রাহযাতী হ্যায় চেঙ্গিজী– দ্বীন থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন করলে সেখানে বিরাজ করে চেঙ্গিসের বর্বরতা।' আজকের অধঃপতিত মুসলমানরা চেঙ্গিজের সেই বর্বরোচিত দুঃশাসনে আবর্তিত হচ্ছে। রাজপ্রাসাদ আর রাজকীয় ঐশ্বর্যের ওপর দাঁড়িয়েও আরবের শাসকরা আজ পরাশক্তির কাছে নতজানু।

ধীরে ধীরে মসজিদের দিকে এগিয়ে চলছি। রসূলেখোদার (সাঃ) পদধুলি নিয়ে যে মসজিদ আজ গৌরবের শীর্ষে সেখানে নামাজ পড়ে দোয়া করে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার গভীর প্রত্যাশায় মনটা উদ্বেল হয়ে আছে। মসজিদে পা রাখছি এমন সময় কানে বাজল অনেক মানুষের করুণ কান্না। গণ-গুঞ্জনের মত কান্না মসজিদের ভেতর থেকে ভেসে আসছে। বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে এগিয়ে চললাম। দেখলাম অনেক মানুষ যাদের অনেকের পা নেই, হাত নেই। অথচ তাদের আদল থেকে ঐশ্বরিক জ্যোতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। ওরা কাঁদছে, ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। দুটো হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করছে ওরা। অন্তরে জমাট বাঁধান ব্যথার অশ্রু যেন ইশ্‌কের উত্তাপে গলে গলে ঝরছে। ওরা কাঁদছে– ওদের সকরুণ কান্নার উচ্ছ্বাস, ওদের ব্যথা নির্গলিত আবেদন, ওদের অশ্রু নিসিক্ত মিনতি, ওদের বেদনার্ত আহাজারিতে মনে হল একটা ঝড় উঠছে, প্রলয়ঙ্করী ইশকের তুফান। এই তুফানে

www.pathagar.com

আশেক আর মাশুক একাকার হয়ে গেছে। মনে হল, আল্লাহর আরশের সাথে এসব নির্যাতিত মানুষের ব্যবধান এক মিলিমিটারও নেই। আমরা অনেক মানুষ, দেশ বিদেশের অনেক মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখছিলাম। অভিভূত হয়ে দেখছিলাম এই অনিন্দ সুন্দর ঐশ্বরিক দৃশ্যটি। হৃদয় বিগলিত উচ্ছ্বাসে আমরাও যেন থরথর করে কাঁপছি। ইশকের মাতম যেন আমাদেরও ছুঁয়ে গেছে। সবার চোখে বাঁধভাঙা অশ্রু।

এইসব ইরানী যুবক, এক দিকে এদের ত্যাগ আর কোরবানী, অন্যদিকে খোদার প্রতি গভীর আস্থা আর নিবিড় আসক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। প্রত্যেকটি মানুষের নীরব জিজ্ঞাসা– কি অপরাধ ছিল এসব তরুণদের? অপরাধ তো একটিই। বাতিল মতবাদকে উৎখাত করে এরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এরা। আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের ধারক রাজা বাদশাহ আর আমীর ওমরাহ, ইসলামের দুশমন আমেরিকার ইঙ্গিত সাদ্দামের ওপর ভর করেছে। আরব জাতীয়তার নামে তথাকথিত কাদেশিয়ার নামে ইসলামী ইরানকে আঘাত হেনেছে। ইরানের আবালবৃদ্ধবনিতা আল্লাহর নামে জানবাজি রেখে প্রচণ্ড প্রতিঘাত করেছে। সেইসব রণাঙ্গনে আহত তরুণ এরা। এদের কোরবানী এদের রক্তাক্ত ইতিহাসই একদিন আরবের তরুণদের তৌহীদবাদে উদ্বুদ্ধ করবে। তরুণ প্রাণের তাজা রক্ত পান করেই একদিন জাহেলিয়াতমুক্ত হবে আরব। আমাদের দোয়া, বিশ্ব মুসলমানদের দোয়া, এইসব নির্যাতিত তরুণদের দোয়া থেকে একদিন নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে আরব সাগরে। তারপর প্রলয়ঙ্করী প্রচণ্ড ঝড় উঠবে। এর পর মেঘ কেটে যাবে। আকাশ পরিষ্কার হবে। নতুন করে আবারও ইসলামের বিকাশ ঘটবে।

রসূল (সাঃ) বলেছেন– 'আমার মেহরাব ও রওজার মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের টুকরা বিশেষ।' এই স্থানটিতে নামাজ পড়ার বিশেষ ফজিলত মনে করে বহু হাজী এখানে ভিড় জমায়। আমি ও আজিজ ভাই এখানে সকালে এসে দুপুর পর্যন্ত অবস্থান করি। এখানে নামাজ কালাম ও তসবিহ-তাহলিলের মধ্যে আমাদের সময় অতিবাহিত হয়। খোদার বিশেষ রহমতে আমরা এখানে এতখানি সময় পেয়েছিলাম, যা কোনভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

মসজিদে নববীর সামান্য দক্ষিণে রওজা শরীফ। এখানে রসূলে পাক (সাঃ) শায়িত রয়েছেন। তাঁর কবরের পাশে ইসলামের মহান খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) শায়িত রয়েছেন। সমস্ত রওজা শরীফ লৌহপ্রাচীর বেষ্টিত। আমরা অনেক মানুষের ভিড়ে রওজা শরীফের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে দরুদ শরীফ পাঠ করলাম।

এখানে এসে মানুষ আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমরা আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম রসূলে খোদা (সাঃ) ও নিকটতম সাহাবাদের উদ্দেশ্যে।

মসজিদে নববী থেকে জান্নাতুল বাকীর দূরত্ব মাত্র পোয়া মাইল। ইসলামের আত্মোৎসর্গকারী মহান সৈনিকদের অনেকেই ঘুমিয়ে আছেন এখানে। এখানে রয়েছেন হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ), ইমাম হাসান (রাঃ), জয়নাল আবেদীন (রাঃ), ইমাম মালেক (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিত্ব। এখানে শায়িত মহামানবদের উদ্দেশে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদিত হল। আমরা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলাম।

মদীনা থেকে রওয়ানা হলাম জেদ্দা। আমরা যে গাড়ীতে উঠেছি সে গাড়ীতে আর যারা ছিল এদের সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোক। বাহরাইনে কর্মরত রয়েছেন। জেদ্দা পর্যন্ত আমরা একই পথযাত্রী। মনে মনে বললাম, ভালই হল এক সাথে কিছুক্ষণ আলাপ হবে। আজিজ ভাই তাদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন আমার ইতিবৃত্ত টেনে। আমার ১০ বছর কারাবাসের ভোগান্তির কথাও বাদ রাখলেন না। এর ফলে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে উঠলো। তাদের সদ্ব্যবহার, তাদের অন্তরঙ্গ সংলাপ, তাদের অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধ আমার দারুণ ভাল লাগল। তারা বললেন– তিন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমার হিসেবেও এই তিনজনের নাম রয়েছে শীর্ষে মুজিব-ভুট্টো-ইন্দিরা। এই তিন জনের যৌথ কূট-চক্রান্ত পূর্বাঞ্চলের ৮ কোটি মানুষকে টেনে এনেছিল এক ভয়াবহ সংকটের দোর গোড়ায়। দেখলাম তাদেরও একই অনুভূতি!

মুসলমান রক্তাক্ত হল। দেশ ছিন্নভিন্ন হল, ফায়দা নিল হিন্দুস্তান। ওরা বললেন– 'ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো' আমি ভাবলাম– 'সবকুছ্ লুটাকে হুঁসনে আয়াতো কেয়া কেয়া।' মুখে বললাম, 'আপনাদের অনুভূতি আর আমাদের জনগণের অনুভূতি তো একই ছিল ভাই। কিন্তু আমাদের শাসক গোষ্ঠীরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

করেছে আমাদের নেতারা। চটকদার শ্লোগানে আমরা ভুলেছি, ভুল পথে চালিত হয়েছি।'

আরও বললাম– 'আপনারা ভ্রাতৃত্ব বোধ নিয়ে যে একত্রীকরণের চিন্তাভাবনা করছেন সেটা কোন দিনও আর সম্ভব হবে না'। তারা বললেন– 'আগের মত না হলেও অন্তত কনফেডারেশন তো হতে পারে।'

বললাম– 'কনফেডারেশনের স্বপক্ষে হয়তো কোন দিন রায় পাওয়া যেতে পারে। একত্রীকরণের চিন্তাভাবনা একেবারে ভুল। বরং এটাই ভাল আমরা দূর থেকে এক ভাই আর এক ভাইকে সমবেদনা জানাব। প্রয়োজনে সাহায্য করব। কেউ আগ্রাসনের মুখোমুখি হলে আমরা পরস্পরের পাশে দাঁড়াব।'

জেদ্দা থেকে ফিরে চললাম আবার মক্কায়। এখন আমাদের ঘরে ফেরার তাগাদা। কাফেলার পর কাফেলা ফিরে যাচ্ছে। জীবনের নতুন দিক-নির্দেশনা নিয়ে ফিরে চলছে তারা আপন গৃহে। হাজীরা উপলব্ধির নতুন ফসলকে কতটুকু কুড়াতে পেরেছে জানিনা। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি ও বিষাক্ত চিন্তাধারার প্লাবনে ভেসে যাওয়া পৃথিবীর বিরান ময়দানে হাজীরা তাদের কুড়ানো ফসলের কে কতটুকু ছড়াতে পারবে তাও আন্দাজ করা মুশকিল। কেননা রুশ-আমেরিকা প্রভাবান্বিত প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে এমন তো হতে পারে না। তারা গাফেল হলেও সিআইএ কেজিবি গাফেল থাকবে এমন তো নয়। হাজীদের নতুন চেতনা নতুন উপলব্ধি প্রতিক্রিয়াশীল চক্ররা কেড়ে নিতে কতক্ষণ! তবু দোয়া করবো আল্লাহর কাছে– 'সবাইকে তোমার দ্বীনের জন্য কাজ করার তওফিক দিও, মালিক।'

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন সাহেবের পত্র

১৯৭১ সালে পাকিস্তান যখন অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়েছিল তখন যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করতে পারেনি, পরবর্তীকালে তাদের ঢালাওভাবে দালাল এবং দেশদ্রোহী বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এই অভিযোগে অনেকে নিহত হয়েছে এবং যারা প্রাণে বেঁচেছে তারাও কারাভোগ করেছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে এরকমই ঘটে, যারা বিজয় লাভ করে, তারা ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে বইপত্র লিখিত হয়েছে– প্রচুর না হলেও বেশ কিছু কিন্তু এ সবই একতরফা। তথাকথিত দালালদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে এ কথা কেউ যেন শুনতেই নারাজ। সেদিক থেকে কে. এম. আমিনুল হকের লেখা "আমি আলবদর বলছি" একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। পাকিস্তান নামক মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে অনেক যুগের সাধনার পর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক বিচার শক্তি হয়ত আপেক্ষিকভাবে দুর্বল ছিল, কিন্তু তাদের দেশদ্রোহী বলতে গেলে শব্দের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে যদি কেউ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে না আসে তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন দল বিদ্রোহ ঘোষণা করা মাত্র পূর্বের জাতীয়তাবোধ সব মিথ্যা হয়ে ওঠে।

অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে সাহসিকতার সঙ্গে আমিনুল হক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৮৯

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
(সাবেক ভিসি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি)

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জের ইতিহাস। জেলা ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি

সভাপতি : মোঃ মাকসুদুল হক
জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ
সম্পাদক : মোঃ সাইদুর
বিন্নগাও, কিশোরগঞ্জ।

এই বইয়ের ৪৪০ পৃষ্ঠায় এইভাবে সমালোচনা করা হয় :

কিশোরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা কেউ কোন বই লিখেননি যেখানে থাকতো যুদ্ধের বর্ণনা, ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী, দেশপ্রেমের কথা, সর্বোপরি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার মরণপণ লড়াইয়ের কথা। কিন্তু রাজাকার-আলবদররা বসে নেই। এই পর্যায়ে দু'টি বইয়ের উদাহারণ দেয়া হলো। একটি রম্যরচনা, অন্যটি নিম্নরূপ ঃ (১) 'আমি আলবদর ছিলাম'– এই ভূমিকা দিয়ে অষ্টগ্রামের কে, এম, আমিনুল হক বইটি শুরু করেছেন। উক্ত বই থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো : "ভৈরবে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে আমি সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নিলাম।... আমি বাহ্মণবাড়ীয়ায় চলে এলাম। এখানে সংগঠনের অন্যতম সংগঠক ফারুক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আমার উন্নত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিলেন।... আমার ধারণা ছিল এর মধ্যে হয়তো অষ্টগ্রামে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এসে শুনলাম এখানকার অবস্থা আগের মতোই। সশস্ত্র ই,পি,আর, আওয়ামী লীগ আর বামপন্থীদের চারণভূমি এই অষ্ট্রগ্রাম। গ্রামে আমার আসার সংবাদ ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে পৌছে গেছে এ খবর জানলাম দেলোয়ার মাস্টার অর্থাৎ দিলু ভাইয়ের চিরকুটে।... আমি তড়িঘড়ি আমার নিকট আত্মীয়দের সহযোগিতায় গোপনে নৌকাযোগে অন্যত্র সরে যাই। অষ্টগ্রামের সাবিয়ানগর থেকে কুলিয়ারচর হয়ে কিশোরগঞ্জে এসে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারপর আমাদের সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম।" (পৃঃ ২৯-৩০)

"একাত্তুরের ১৭ই ডিসেম্বর। কিশোরগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ও হিন্দুস্তানী সেনার সম্মিলিত আক্রমণের মুখে প্রচন্ড প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজাকার, আলবদর, মুজাহিদ ও পুলিশের মৃত্যুকামী সদস্যরা। ১৬ই ডিসেম্বর হিন্দুস্থানের হাতে পাকিস্তানী বাহিনী অস্ত্র সমর্পণের পর যে বিজয় সূচিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের প্রতিরোধ যেন তার কলংকের তিলক। অসংখ্য সেল প্রতিনিয়ত এসে পড়ছে শহরের বিভিন্ন অবস্থানে।... মাগরেবের নামাজের বেশ কিছুক্ষণ পর নেজামী ইসলাম পার্টির প্রধান সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি তাঁর জামেয়া এমদাদিয়া থেকে আমাকে তলব করেছেন।... তার অশ্রুসজল সকরুণ চাওনি আমাকে বিব্রত

www.pathagar.com

করছিল ভয়ংকরভাবে। নীরবতা ভংগ করে বললেন, আমিন, কুদরতের ফয়সালা আমাদের স্বপক্ষে নেই।... আওয়ামী লীগ নেতারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আমি মনে করি রক্তক্ষরণের চাইতে অস্ত্র সংবরণই উত্তম।... ইতিমধ্যে আমরা সরকারী হাইস্কুলে এসে পৌছলাম।... ওদিকে আর এক দল হলের ভেতর প্রবেশ করে মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দিল। তিনিও নিমিষে রক্তস্নাত হয়ে উঠলেন। আর একজন নির্যাতন চালিয়ে এডভোকেট বদরুজ্জামানের হাত ভেংগে দিল। মুসলিম লীগ নেতা ও পৌরসভার চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল সাহেবের উপর ভয়ংকরভাবে অত্যাচার চালানো হল।... কিছুদিন পর আমাদেরকে কিশোরগঞ্জ জেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়।...

"একদিন আমাকে একজন কনস্টেবল এসে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে বলে এবং আমাকে জানায় এ কারাগার থেকে স্থানান্তরিত করার জন্য উপর থেকে হুকুম এসেছে। আমি তৈরী হলাম। আরও ৩ জন আমার সহগামী হলেন এমপি লোকমান হোসেন, সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের নাতি আনোয়ার হোসেন খান এবং এন এস এফের আবুল কাশেম।... জেল গেটে (ময়মনসিংহ) এসে পরলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে হল বাইরে। কেননা তখন অফিসার নেই। এখন আমাদের মনে হচ্ছে, আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। অনেকক্ষণ পরে অফিসাররা আসার পর আমাদের ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ঢুকেই দেখলাম মওলানা মুসলেহউদ্দিন। তিনিও আমাদের মত একজন কারাবন্দী তিনি পিডিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।... একদিন শুনলাম ঢাকা থেকে কারাগার সমূহের ডিআইজি জনাব আবদুল আওয়াল সাহেব আসবেন।... আমাকে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য জমাদার মুখ খুললেন। বললেন "স্যার এই যে আমিন। এই জেলের সবচেয়ে বড় টেরর। ২টা কেসে ৪০ বছর জেল হয়েছে।"

(পৃষ্ঠা : ১/৩/৭/১৯/২৯/৩০/৩১/৩৪/৪১/৪২)

"আমি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকা অবস্থায় জানতে পারলাম আমার মুক্তির দিন আসন্ন। কেননা প্রেসিডেন্ট সাত্তার ঈদ উপলক্ষে যে ৬ জন বন্দী মুক্তির ঘোষণা দেন তার মধ্যে ছিলাম আমিও।"... (পৃঃ ১৪১-১৪২)

www.pathagar.com

জনাব আমিনুল হক
পূর্ব তেজতরী বাজার, ঢাকা।

লন্ডন, ৩১শে জুলাই ১৯৮৯ ইং

আমার প্রিয় ভাই আমিনুল হক,

আস সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের কাছে অশেষ শোকরিয়া জানাই যে তিনি আপনাকে জানতে আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। আরো তার কাছে শোকরিয়া জানাই যে আল্লাহ আপনার মত একজন মর্দে মুমীনকে অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু আপনাকে বাঁচিয়েই রাখেন নাই বরং আপনার ঈমানকে আরো জোরদার করেছেন এবং মহা মূল্যবান 'আল বদর বলছি' বইখানা লেখা এবং প্রকাশ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন।

বইখানা পাবার সাথে সাথেই আমি তা অতি আগ্রহ সহকারে পড়ে ফেলেছি। এবং পড়ার পর আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার অনেক উপকারের মধ্যে মনে হয় যেটি সবচেয়ে মূল্যবান সেটি হচ্ছে, আমার ঈমান আরো মজবুত হয়েছে।

বইটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ইতিমধ্যেই লন্ডনের পাক্ষিক ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিজেরও ইচ্ছা আছে এটির একটি বিস্তারিত রিভিউ করার। কবে তা বলতে পারছি না আজ। কদিন আগে জনাব আশরাফকে (সেবা) লিখেছিলাম আপনার কাছে আমার মোবারকবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। আমি বুঝতে পারছি না তিনি তা ইতিমধ্যেই করেছেন কিনা, বা আমার অনুরোধ সম্বলিত চিঠি তিনি মোটেই পেয়েছেন কি না। তার কাছে এই বিষয়ে আমার নাম- ইচ্ছার কথা বলতে পারেন। ইতিমধ্যে সাতদিন আগে আপনার কয়েকটি বইয়ের বিক্রয়মূল্য বাবদ মাত্র তিরিশটি পাউন্ড এক বন্ধুর হাতে ঢাকা পাঠিয়েছি। তা পেয়েছেন কিনা জানি না। না পেলে অধ্যাপক সাজ্জাদ সাহেবের কাছে খোঁজ নিতে পারেন।

শুনেছি যে দাওয়াতের একজনের কাছে আপনার বইটির আরো কিছু কপি আছে। তা যদি পাই তাহলে সেসব বিক্রি করেও কিছু অর্থ আপনার কাছে পাঠাতে পারি। আপনার সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগের জন্য আপনার সঠিক ডাক ঠিকানা যদি আমাকে জানাতেন তাহলে আমি উপকৃত হতাম।

আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি আমাদের সাধারণভাবে পরিচিত এক সহকর্মীর হাতে পাঠানোর জন্য। আমি আশা করছি যে তিনি এটি আপনার কাছে পৌঁছাবেন। তিনি যদি আপনার সাথে আসার আগে দেখা করেন তাহলে তার হাতে জরুরী খবরাদি জানালে আমি বাধিত হব।

জনাব আশরাফসহ অন্য সব মোজাহীদ ভাইদের কাছে আমার সালাম ও জেহাদী শুভেচ্ছা জানালে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ফি আমানিল্লাহ। ইতি-

আপনার এক নগণ্য তাওহীদি ভাই,
ড. মুঃ তাজাম্মুল হোসেন

www.pathagar.com

৭১-এর স্মৃতি প্রসঙ্গে
অধ্যাপক আবু জাফরের লেখা থেকে–

"দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হলো আমি কলকাতা চলে যাই।...

আমরা প্রথমে গেলাম কলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র-যোগাযোগ ছিলো। তিনি আমাদের তিনজনকেই প্রভূত সমাদর করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উপেন তরফদারকে বলে আমাদের একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নিলেন। সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সপ্তাহে উপর্যুপরি দু'বার প্রচারিত হয়।

বেতার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর নাকতলার বাসাতে। তাঁকে পূর্বে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও যেহেতু ঘনিষ্ঠ পত্র-যোগাযোগ ছিলো...

বুদ্ধদেব এবং প্রতিভা বসু, দু'জনের কাছে আমরা আশাতীতভাবে সমাদৃত ও আপ্যায়িত হলাম। প্রতিভা এবং বুদ্ধদেব উভয়েই তাঁদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন ঢাকায়। অতএব ঢাকা ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর এরকম দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমার দু'জন সহযাত্রী অবিরলভাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হঠাৎই একটু ছন্দপতন ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, 'কী-এমন হলো যে, তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছো! তোমাদের কতো দিকে কতো উন্নতি হচ্ছিলো, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তো দিল্লীর অনেক অন্যায়-অবিচারের শিকার, তাই বলে কি আলাদা হয়ে যাবো? এখন হয়তো আর ফেরার পথ নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই ভুল করেছো। আমি তোমাদের লড়াইকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সমর্থন করি না।'

আমরা তিনজনেই হতবাক, মানুষটি বলে কী!

কথা আর এগোলো না। আমরা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে এলাম আমাদের প্রিয় কবির 'কবিতা ভবন' থেকে। বেলাল ভাই অর্থাৎ ভারত বিচিত্রার প্রাক্তন সম্পাদক কবি বেলাল চৌধুরী এবং কবি আল মাহমুদ দু'জনেই বুদ্ধদেব ও বুদ্ধদেব-পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁরা উভয়েই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানেন।...

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনা। আমাকে ও আমার আত্মীয় আবুল কাসেমকে দেবদুলাল তাঁর বালিগঞ্জের বাসায় একদিন খুব আদর করে সকালের নাশতা খাওয়ালেন। আমরা পরিতৃপ্ত উদরে যখন চা খেতে শুরু করেছি, দেবদুলাল অনেকটা উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'কিছু মনে করো না, তোমরা আসলেই স্বাধীনতার যোগ্য নও।'

আমরা দু'জনেই স্তম্ভিত। স্বাধীনতা পেতে না পেতেই এতোবড় অপবাদ! তিনি বললেন, 'দেখ, এতো বড় একটা যুদ্ধের তাণ্ডব বয়ে গেলো, এতো প্রাণহানি, এতো ক্ষয়ক্ষতি; তোমাদের এখন কতো কাজ, কতো দায়িত্ব। অথচ কয়েকদিন আগে তোমাদের কিছু নেতা এসেছিলো কলকাতা থেকে নামকরা কিছু গায়ক ও নর্তকী ভাড়া করে দিতে হবে। তারা সপ্তাহব্যাপী বড় রকমের ফাংশন করবে ঢাকায়। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এইরকম অকথ্য অমার্জনীয় দায়িত্বহীনতা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখ হয়, অনুতপ্ত হই, তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও কিছু অবদান ছিলো।'"

(আমার দেশ : আমার স্বাধীনতা, পাক্ষিক *পালাবদল*)

www.pathagar.com

ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর (লন্ডন) দৃষ্টিতে

ইকবাল ও জিন্নাহ এবং 'আমি আল বদর বলছি' এর মূল্যায়ন

যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিকড় গেড়ে বসা বামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের তৎপরতার ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক গতিধারা সম্বন্ধে বিশ্ব বিভ্রান্ত তথাপি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যে মতামতরূপী আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

দুটি বাংলায় এবং একটি ইংরেজীতে সাম্প্রতিক এ তিনটি পুস্তক যথার্থই এ পরিবর্তনের চিহ্নফলক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথমটির বাংলা নাম 'আমাদের সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় কায়েদ-ই-আযম'। পাকিস্তানের পতনের পর এটি প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সংকলিত হয়েছে নির্বাচিত সব কবিতা, বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং পূর্ণ কলেবরের বই থেকে উদ্ধৃতি। কৌতূহল উদ্দীপক যে, এর লেখক ও লেখিকারা তাঁরাই যাঁরা ১৯৭২ সালে এসে পুরোপুরি ডিগবাজি খেল এবং বাঙালী মুসলমানদের সকল দুর্ভাগ্যের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে জিন্নাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করলো। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বেকার তাঁদের যেসব অভিমত সেগুলো তারা বেমালুম ভুলে গেল। অথচ সেসবের রয়েছে জাজ্বল্যমান প্রমাণ। একটা জাতির ত্রাণকর্তা রাতারাতি কি করে বিশ্বাসঘাতকে রূপান্তরিত হলো সেটা ব্যাখ্যা করতে তাঁরা অক্ষম। সংবাদপত্রগুলোর কতক অংশ পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এর বিক্রয়ের দিকটি লক্ষ্য করলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, জনতা কত আগ্রহভরেই না এ সংকলনটিকে স্বাগত জানিয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ কায়েদের কাছে কতইনা ঋণী বিষয়টি সেটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পুস্তকটির লেখক কে. এম. আমিনুল হক। ১৯৭১ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আল-বদর নামক যে সংস্থা এবং যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে তাঁদের দলেরই একজন সদস্য হচ্ছেন লেখক। এটি তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক পুস্তক। লেখক কে. এম. আমিনুল হক তথাকথিত 'দালাল আইনে' জীবনের দশটি বছর কাটিয়েছেন জেলে। এবং সামান্যের জন্য ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলা থেকে বেঁচে গেছেন। তাঁর বর্ণনায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, পঞ্চমবাহিনী ও ভারতীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির হেফাজতের জন্য ১৯৭১ সালে যা কিছু তিনি করেছেন সেজন্যে তিনি অনুতপ্ত নন, ক্ষমাপ্রার্থীও নন। কেবলমাত্র মুজিবুর রহমানের আমলেই নয় বরং তাঁর উত্তরসূরীদের আমলেও বাংলাদেশের জেলের অভ্যন্তরে তাঁকে যে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে সিটা বিনা দ্বিধায় তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পাঁচ বছর পূর্বে এ ধরনের একটা পুস্তক অবশ্যই তড়িঘড়ি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

www.pathagar.com

হতো। এর লেখককে পুনরায় কারারুদ্ধ হতে হতো। কিন্তু কোন কোন মহল থেকে আমিনুল হক বীরোচিত প্রশংসা লাভ করেছেন। সে যে শাস্তিভোগ করেছে সেটা ছিল দৃষ্টান্তমূলক বিষয়, এক কৌশল, যার মাধ্যমে মুসলিম দেশ হিসেবে মুসলিম বাংলার চেতনাকে অবদমিত করা হয়েছে।

তৃতীয় পুস্তকটি হচ্ছে "ইকবাল গবেষণা"। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দালাল হিসেবে তিনিও দুটি বছর কাটিয়েছেন কারাগারে। পুস্ত কটিতে ইকবাল সম্বন্ধে আজকের বাংলাদেশের অভিমত প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক থেকে সাংবাদিক এবং স্বাধীন সমালোচক অনেকেই এ পুস্তকে অবদান রেখেছেন। সবাই প্রমাণ উপস্থাপিত করে এ অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশ ইকবালের কাছে বিরাটভাবে ঋণ হওয়ার কারণেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ইকবালের স্বপ্ন ভিন্ন মুসলিম-বাংলার জন্ম সম্ভব হতো না।

ইকবাল গবেষণা সংস্থা বিগত ১লা জুনে ইকবালের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সাধারণ বৈঠক আহ্বান করেছিল। ঢাকার বিভিন্ন স্তরের জনতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, ব্যাংকের প্রশাসক ও সাংবাদিক উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। দু'শতাধিক শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা সমূহে বার বার গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে যে, ইকবালের বাণীর রয়েছে এক শাশ্বত আবেদন যেটা আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে। উক্ত সভার অন্যতম বক্তা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র এডভোকেট জনাব মুজিবর রহমান ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল ও জিন্নাহর অবদান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন।

প্রকাশিত এসব পুস্তক, ইকবাল বার্ষিকীর সভা এবং সংবাদপত্রে এসবের প্রাপ্ত প্রচারে এটাই স্পষ্টত প্রতীয়তমান হয় যে, ১৯৭১ সালের ভুলের সংশোধনের জন্য বাংলাদেশের একটা পথ-নির্দেশক ফলক ঘুরে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের ঘটনাই তো বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে।

মূল : সাইয়েদ নসরুল আহসান
ভাষান্তর : চোকদার আবদুস সাত্তার

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

মন্তব্যবিহীন উদ্ধৃতি

৭১-এ আওয়ামী লুণ্ঠন এবং প্রবাসে নেতৃবৃন্দের অনাচার

শুধুমাত্র বগুড়ার স্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপরে। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা এবং আমলাদের একটা অংশ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে বসে ছিনিমিনি খেলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কোন জবাব আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসে কিংবা স্বাধীনতার পর জনগণের কাছে দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। লুটপাট সমিতির কার্যকলাপে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছিল তার কয়েকটি বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

'লুটপাট সমিতি'র সদস্যরা তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিটের হোটেল, বার এবং রেস্তোরাঁগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য 'জয়বাংলার শেঠ' বলে পরিচিত। যেখানেই তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিংবা হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্র্যান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফক্স, মলিন রুজ, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেস্টুরেন্টগুলো জয়বাংলার শেঠদের ভীড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় ও খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজে রঙ্গীন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয়-বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশি হন। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্র্যান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কব্জা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যানরা কাচুমাচু হয়ে তাকে জবাব দেয় সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙ্গালী শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসালো খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল-তাবোল বকে এই বলে একজন বারম্যানকে হুকুম দেয়, "কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত তিনি ও তার সঙ্গীগণ ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবেন বারে।" তার হুকুম শুনে বারম্যান ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন, "রোজ আপনাদের বারে সেল কত টাকা?" ম্যানেজার তার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, পুরো দিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন। পুরো টাকার মদ ওরা খেয়ে শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেবার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন। ম্যানেজার তার কথা শুনে 'থ হয়ে গিয়ে মাতালের প্রলাপ মনে করে কোন রকমে সেখান থেকে কেটে পড়েন।

আর একদিন আর একজন জয়বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতো পড়ার দিনটি উদযাপন করার জন্য ব্লু ফক্স রেস্টুরেন্টে প্রায় ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এ ছাড়াও অনেক শেঠ দিল্লী এবং বোম্বেতে গিয়ে বাড়িঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কীর্তিকলাপের ওপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর। অনেকে তার এ ঔদ্ধত্যে ক্ষেপেও গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন।

দরগা রোডের বিশু বাবুর বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশু বাবুর বাড়িতে এবং ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভিনিউ এর তিন তলার ছাদের দুটো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থ সচিব জনাব সামুজ্জামান এবং তার পরিবার ও রাফি আক্তার ডলি। এ টাকার কোন হিসাব ছিল না। কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়াড়ীদের সাহায্যে এগুলোর এক্সচেঞ্জ করা হতো। এ কাজের দালালী করেও অনেকে কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হলেও তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সংবরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে বেয়োনেটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলংকার খুলে নিয়েছিলেন; এমন ঘটনাও ঘটেছে। এ ধরনের কিছু ব্যক্তি নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেছেন আজ অব্দি। কিন্তু তারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কলঙ্ক। তাদের অপকর্মের জন্য সাধারণভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কলঙ্কের ভাগী হতে হয়েছে।

'যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরগুলোতে বরাদ্দকৃত রিলিফ সামগ্রী নিয়েও কেলেংকারী হয়েছে অনেক। ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল প্রায় ১ কোটি শরণার্থী। তাদের জন্য সারা বিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে প্রচুর এসেছিলো। কিন্তু তার কতটুকুই বা দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে! এ সমস্ত রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের। বগুড়ার স্টেট ব্যাংক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও পাবনা ট্রেজারি থেকে। সে টাকারও কোন সুষ্ঠু হিসাব পাওয়া যায়নি।'

যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি :
রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অব) শরীফুল হক ডালিম, পৃঃ ১২০-১২২

www.pathagar.com

বিজয় হল ছিনতাই

আত্মসমর্পণের প্রায় ১ সপ্তাহের পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন সে সত্যটি উদঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হল না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই অসহায় মহানায়ক কর্নেল ওসমানীর কতই না প্রশংসা। কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা? এর অন্তরালে কি রহস্য? রহস্য তো নিশ্চয়ই রয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৬ই ডিসেম্বর, যাকে আমরা 'বিজয় দিবস' হিসেবে অভিহিত করি, সেই দিন থেকেই বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে 'বিজয় দিবস' এর পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'বিজয় দিবস' হিসেবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা এবং পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয় ঘোষণা করা।

'এই বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তিপিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব দর্শক, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাঁবেদার এবং কর্ণেল ওসমানী ছিলেন অসহায় বন্দী। এ যেন ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নববিজিত ভারতভূমির যোগ্য লীজ গ্রহণকারী সত্তা। সুতরাং যেমন সত্তা তেমনই তার শর্ত– আর যায় কোথায়।'

মেজর (অব) এম এ জলিল : অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৩৬

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ভারতের বেপরোয়া লুণ্ঠন

'দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ই ডিসেম্বরের পরে মিত্র বাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস-বেপরোয়া। সে লুণ্ঠন ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা।'

পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক গাড়ী, অস্ত্র, গোলাবারুদসহ আরো অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 'প্রাইভেট কার' পর্যন্ত যখন রক্ষা পায়নি তখনই কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়িগুলো রিকুইজিশন করে খুলনা সারকিট হাউস ময়দানে হেফাজতে রাখার চেষ্টা করি।

'এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ী পেয়েছে সেটাকেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে।'

www.pathagar.com

'যশোহর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করেছে। বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথযাত্রীরা। কথিত মিত্র বাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।'

মেজর (অব) এম এ জলিল : অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৩৭-৩৮

আত্মঘাতী পদক্ষেপ

'অবস্থা দৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভারতীয় সাহায্য প্রার্থনা, বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার সুবর্ণ সুযোগ হিসাবেই-অপেক্ষমান ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়।'

'আমি ভারতের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিগ্ধ ছিলাম। ভারত বৃহৎ দেশ, তাহার প্রয়োজনও বৃহৎ। ছোট ছোট দেশ বড় বড় দেশের স্বার্থে উচ্ছন্নে যাইতে বাধ্য হয়।'...

'১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতের মাটি হইতে বাংলাদেশের সরকার ঢাকায় পদার্পণ করে ২০শে ডিসেম্বর। ইহা এক অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা। শুধু তাই নয়, স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের সরকার ১লা জানুয়ারী (১৯৭২) এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান শতকরা ৬৬ ভাগ হ্রাস করেন। উল্লেখ্য যে, এই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রামান ছিল ভারতীয় মুদ্রামান হইতে বেশি। তাজুদ্দিন সরকার এক ঘোষণায় দুই মুদ্রামানের বিনিময় হারের সমতা আনিতে চাহিয়াছিলেন বটে কিন্তু ফল দাঁড়াইল অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি এবং জনজীবনে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতিদ্বয়কে পরস্পর সম্পূরক ঘোষণা করা হয় এবং এতদিন যাবত ভারতে পাট বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাজুদ্দিন সরকার ১৯৭২ এর ১লা জানুয়ারী হইতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। তাজুদ্দিন সরকারের উক্ত ঘোষণা অর্থনীতির মূল সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'...

'ভারতীয় দৈনিক সাংবাদপত্র "অমৃতবাজার" এর ১২ই মে ১৯৭৪ সংখ্যার রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার দুই হইতে আড়াই শত রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করিয়াছে। স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য যদি ৪৫০ কোটি হয়, তাহা হইলে স্বর্ণভরি ১০০০ টাকা মানে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা হয়। তদুপরি মহাচীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী হইতে অস্ত্র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তরের অভিযোগ উত্থিত হয়।'

অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, পৃঃ ৫২৮-৫৩১

www.pathagar.com

চোরাচালানীরা সংঘবদ্ধ হল

বহু ত্রুটির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি দশ মাইল এলাকাকে সীমান্ত আখ্যা দেওয়া। বাংলাদেশ ও ভারতের মোট চৌদ্দ'শ মাইল ব্যাপী সীমান্ত রেখার দশ মাইল এলাকাকে বর্ডার ট্রেডের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়ার পরিণাম কি, যে কোন কান্ডজ্ঞানী লোকের চোখে তা ধরা পড়া উচিত ছিল। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশের গোটা বর্ডার এলাকাই চোরা চালানের মুক্ত এলাকা হইয়া পড়ে।

সুখের বিষয় বছর না ঘুরিতেই এই চুক্তি বাতিল করা হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে তার কব্জা হইতে বাংলাদেশ আজও মুক্ত হইতে পারে নাই।

আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৪৯৮

সৌখিন দেশপ্রেমিকদের অর্থনৈতিক শোষণ

'সেই সৌখিন দেশপ্রেমিকরা যারা যুদ্ধ করার জন্য নয়, বরং প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ভারতে গিয়েছিল তারা আজ সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। মানুষকে প্রতারণা করার ক্ষমতা ওদের অনেক। অভিনয় নিখুঁত। ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে ওরা কুণ্ঠা বোধ করে না। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, মহারথীরা আজো কোন এক অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য প্রভুদের অঙ্গুলী নির্দেশে চলতে বাধ্য। এই ঘটনাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির জীবনে বিপর্যয়ের মূলে অনেকাংশে আছে এই লোভী মানুষগুলোর অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি। জানিনা আর কত দিন করতে হবে।'

'স্বাধীনতার পর কি হলো? এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। কলকারখানা ধ্বংস হলো। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হলো অনেকে। সেইসব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন তারা আগেই করে রেখেছিল। পুরো দেশ ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসায়। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাঁদরেল সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালী মহলের সমর্থনপুষ্ট নাহলে এত বিরাট আকারে অবৈধ ব্যবসা সম্ভব নয়। তাহলে কি একথা বলা যায় না, কোন প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি?... "শুধু তাই নয়, ভেজালে ছেয়ে সমস্ত দেশ।"

'পুরো দেশটাই আজ যেন একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি। সবার লক্ষ্য হচ্ছে যেমন করেই হোক নিজের পকেট ভর্তি করা। সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কার কি এসে যায়? আর শাস্তির তো কোন ভয়ই নাই।'

www.pathagar.com

'দীর্ঘ তিনটি বছর আমরা এই সব কলঙ্কময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের চোখের সামনে ধান চাল পাট পাচার হয়ে যায় সীমান্তের ওপারে। আর বাংলার অসহায় মানুষ খাদ্যের জন্য বিশ্বের দুয়ারে সাজে ভিখারী। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু ভৌগোলিক হয়ে রইল। বিশ্ব মানব সভায় যে সম্মান আমরা পেয়েছিলাম, ভিক্ষার ঝুলি হাতে সে সম্মান স্বেচ্ছায় পদদলিত করেছি। স্বাধীনতা শুধু কিছু সংখ্যক ভাগ্যবানের জীবনে এনেছে অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য।'

মেজর (অব) মোঃ রফিকুল ইসলাম : দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, পৃঃ ১১৯-১২৬

বাংলাদেশ নয় পাটের রাজা হল ভারত

আওয়ামী বাকশালীরা যাই মনে করুক বাংলার মানুষ ঠিকই বুঝে নিয়েছিল যে, এটা ছিল সেই মারাত্মক খেলারই এক অনিবার্য পরিণতি ঃ যে খেলায় গোটা মাঠে একদিকে ছিলেন শেখ মুজিব এবং অন্য দিকে ছিলেন কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার ধুরন্ধর বরকন্দাজরা ভারতের দোসর হিসাবেই। বর্ডার চুক্তির নামে বেরুবাড়ী ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফারাক্কা চুক্তির নামে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার কারসাজী, টাকা বদলের নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'ফোকলা' করে ফেলা হয়েছিল। বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তাপচা মালামালের বাজারে। পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কলিকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিফট চালিয়েও কাজ কুলাতে পারত না।

আখতারুল আলম : দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, পৃঃ ১১৫-১১৬

৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার

দুইশ' বছরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যা করতে পারেনি, ২৫ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যা করবার সাহস পায়নি, মাত্র তিন বছরে হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী বঙ্গবন্ধুরা(!) তা করেছে। বাংলাদেশের কি সর্বনাশ তারা করেছে তার একটি হিসাবের সারসংক্ষেপ দেখুন :

১। ধান, চাউল ও গমের পাচার হয়েছে	৭০/৮০ লাখ টন।
মূল্য (গড়ে ১০০ টাকা মূল্য ধরলে)	২১৬০ কোটি টাকা।
২। পাট পঞ্চাশ লাখ বেলের উপরে	৪০০ কোটি টাকা।
৩। ত্রাণ সামগ্রী পাচার হয়েছে	১৫০০ কোটি টাকা।
৪। যুদ্ধাস্ত্র, আমদানী করা যন্ত্রাংশ, ঔষধপত্র, মাছ, ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগী, ডিম, বনজ সম্পদ ইত্যাদি মিলে	১০০০ কোটি টাকা।
সর্বমোট	৫০৬০ কোটি টাকা

(জনতার মুখপত্র, ১লা নভেম্বর, ১৯৭৫)

www.pathagar.com

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

আতাউর রহমান খান : প্রদর্শনের ফলেই দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। (২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪)

ভাসানী ন্যাপ : যারা লুটপাট করে খেতে পারে না তাদের পক্ষে বাঁচার কোন উপায় নেই। (৮ এপ্রিল ১৯৭৪)

আওয়ামী লীগের সহযোগী সিপিবি ঃ 'দেশ আজ চরম সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে উপস্থিত। মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও লাইসেন্স পারমিট শিকারীদের চক্রান্তের সাথে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের যোগসাজশ, সর্বোপরি শাসকদের একাংশ উক্ত সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলেই বর্তমান সময়ে সংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।' (১৮ এপ্রিল, ১৯৭৪)

৭০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি : বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট অতীতের সর্বাপেক্ষা জরুরী সংকটকেও দ্রুতগতিতে ছাড়াইয়া যাইতেছে এবং ১৯৪৩ সনের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর্যায়ে পৌছাইয়া গিয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সরকার 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলিয়া অভিহিত করার মাধ্যমে দুর্দশার প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। মন্বন্তরের মোকাবেলায় দেশের বিভিন্ন সামাজিক শক্তিসমূহের উপর কোন প্রকার আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছেন কতিপয় বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের উপর এবং অভ্যন্তরীণ একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ, টাউট, বদ মাতব্বর ও অনুশোচনাহীন আত্মসাতকারীর উপর। এ দুর্ভিক্ষ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠন ও পাচারের পরিণতি। ১৭৬১ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ন্যায় ১৯৭৪ সালের এই মন্বন্তরও মনুষ্য-সৃষ্ট এবং উৎপাদনযন্ত্রের সহিত সম্পর্কবিহীন এক শ্রেণীর মজুতদার, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ীরাই ইহার জন্য দায়ী।

খাদ্য ঘাটতি কখনো দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না। সামান্যতম খাদ্য ঘাটতির ক্ষেত্রেও শুধু বন্টন-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যায়। যদি দেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা নিম্নতম ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সুবিচারকে নিশ্চিত করার সামান্যতম আন্তরিক চেষ্টাও থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধের তিন বছর পর এবং দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী বৈদেশিক সাহায্যের পর ৭৪ সনের শেষার্ধে আজ, বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যুর পরিস্থিতি হইত না। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও মন্বন্তরের মোকাবিলা কোন মানবিক প্রশ্ন নয়, ইহা একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন।'

www.pathagar.com

তিন বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকার চাল পাচার হয় : গত তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে বলে একটি বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে। পশ্চিম বাংলার একটি মাসিক পত্রিকার ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ!' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয় যে, 'বাংলাদেশের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুসারে ১৯৭১ এর পরবর্তী তিন বছরে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ৩৩৩ লাখ টন। তাছাড়া ১৯৭৪-এ আউস ধান উৎপন্ন হয়েছে ২৮ লাখ টন। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৩৫১ লাখ টন। আর এই তিন বছরে খাবার জন্য মোট প্রয়োজন ৩২৩ লাখ টন এবং বীজধানের জন্য (মোট উৎপাদনের ১০%) প্রয়োজন ৩৩ লাখ টন অর্থাৎ মোট প্রয়োজন ৩৫৬ লাখ টন। এই তিন বছর (১৯৭৪-এর অক্টোবর পর্যন্ত) বিদেশ থেকে মোট খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ৬৫ লাখ টন।

অর্থাৎ উৎপাদন ও আমদানী খাতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে, ৩৫১+৬৪ = ৪১৫ লাখ টন, মোট প্রয়োজন যেখানে ৩৫৬ লাখ টন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হবার কথা– কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর রিপোর্ট, দৈনিক জনপদ

ভারতে জাল নোট ছেপে অর্থনীতি ধ্বংসের চক্রান্ত

'বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া ধনসম্পদের বিনিময়ে প্রতিবেশী ভারত থেকে আমাদের দেশে আরো যেসব মহামূল্যবান ধনসম্পদ আসতো তার একটি হচ্ছে ভারতে মুদ্রিত বাংলাদেশী জাল টাকা। এই জাল মুদ্রা পাচার এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়াছিল যে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। এক কথায়, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন হয়ে পড়েছিল দেশী-বিদেশী লুণ্ঠন ক্ষেত্র। এখান থেকে খাদ্য শস্য, অর্থকরী ফসল, বৈদেশিক মুদ্রায় কোন মূল্যবান যন্ত্রপাতী ও যন্ত্রাংশ উধাও হয়ে গেছে। আর তার বিনিময়ে এসেছে ভারতে ছাপা জাল টাকার নোট, বিড়িপাতা আর গরম মসল্লা। এই চমৎকার ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়লেও ক্ষমতার স্নেহপুষ্ট এক শ্রেণীর তথাকথিত জননেতার পকেটে সাগরের জোয়ারের মত টাকা জমা হচ্ছিল এবং এত টাকা যে, সেটা তারা দেশের ব্যাংকে জমা রাখা নিরাপদ বোধ করতেন না।'

আবদুর রহিম আজাদ : একাত্তরের গণহত্যার নায়ক কে? পৃঃ ৫২

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

২৫ মার্চ-এর গণহত্যা অভিযানের মুখে রাজনৈতিক শক্তি যখন জাতিকে অপ্রস্তুত অবস্থায় তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে, জাতির সামনে কোন দিক-নির্দেশনা না দিয়ে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে সে সময় এই সেনাবাহিনীর সদস্যসরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জাতিকে পথ দেখিয়েছে। চট্টগ্রাম কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের ডাক দিয়েছে সেনাবাহিনীরই একজন সদস্য– মেজর জিয়াউর রহমান। সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাস প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করেছে ইপিআর-এর সদস্যরা। ১১টি সেক্টরে সশস্ত্র যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে সশস্ত্র বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সকল ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তখন মানুষকে সাহস যুগিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, প্রতিরোধ যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে এবং মানুষের শ্রদ্ধা-ভালবাসা কেড়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এভাবে জাতীয় স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে জনচিত্তে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিব স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিলেন তাদের সরিয়ে দিলেন নেপথ্যে। তাদের অবস্থান, শক্তি এবং মর্যাদাকে আরো সংকুচিত করার জন্য গঠন করা হলো রক্ষীবাহিনী। অল্প দিনের মধ্যেই সাফল্যের সাথে রক্ষীবাহিনী নিজেকে সামাজিক ত্রাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পেল রক্ষীবাহিনী। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হবে না। গোটা জাতি বুঝল, ৯ মাসে যে স্বাধীনতার জন্য তারা রক্ত ঝরিয়েছে সে স্বাধীনতা 'জলপাই রং'-এর হাতে বন্দী হয়ে গেছে।'

'এই জলপাই রং-এর খেলায় সীমান্ত খুলে গেল। যার পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ পেল অত্যাশ্চর্য এক বিশ্ব পরিচিতি– 'তলাবিহী ঝুড়ি'।' [আবদুর রহিম আজাদ : 'একাত্তরের গণহত্যার নায়ক কে?' পৃঃ ৪৫]

'সেনাবাহিনীর প্রতি আওয়ামী লীগের তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা অবহেলাকে জেনারেল জিয়াউর রহমান তার এক ভাষণে স্বীকার করেছেন। ৭৫ সালে ১২ই নভেম্বর তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত (১৫ই আগস্ট) যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলা ছিল এতটাই যে, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নিদারুন হতাশা।' (দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী)

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকার প্রতিক্রিয়া

'যশোহর-খুলনা-কুষ্টিয়া এই তিনটি জেলার সমস্ত সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নির্বিঘ্নে চলিতেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট এইসব সমাজ বিরোধী ব্যক্তিকে দমনে সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট)

লাইসেন্স পারমিটের জম-জমাট ব্যবসার যাতাকলে পড়ে মানুষ খাবি খাচ্ছে। (গণকণ্ঠ, ২৯ আগস্ট, ১৯৭২)

গরীব মানুষ খাদ্য পায় না, টাউটরা মজা লুটছে। (গণকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২)

'বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জোয়ানগণ গত দুইদিন সীমান্ত এলাকা হইতে ভারতে ছাপা বিভিন্ন মানের মোট ২ হাজার ৭শ' ৬২ টাকার বাংলাদেশী কাগজী মুদ্রা আটক করিয়াছেন।' (ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৩)

ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ইসলামপুর, মৌলভীবাজার, চকবাজার হইতে ব্যবসায়ী নামধারী এক শ্রেণীর লোক হাজার হাজার মণ চাল, ডাল, প্রভৃতি ক্রয় করিতে শুরু করিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলও জিনিস-পত্র কেনার এই ধুম দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেছেন যে, এই মালপত্র যাইতেছে কোথায়?...

'কোন একটি মহলের খবরে প্রকাশ, সীমান্তের ওপারে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সীমান্ত এলাকায় গুদাম নির্মাণ করিয়া এই সব জিনিসপত্র কিনিয়া গুদামজাত করিতেছে।' (ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৩)

'দুষ্কৃতিকারী দমনের নামে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম : পাবনার যুবতী মেয়েরা ইজ্জতের ভয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।' (ইত্তেফাক, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

'গেল হপ্তার রাজনীতি : রক্ষীবাহিনীর রুদ্র মূর্তির সামনে ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়েছিল।' (ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৭৪)

খাদ্যোদ্বৃত্ত দিনাজপুর জেলাতেও দুর্ভিক্ষ নিষ্ঠুর থাবা ফেলিয়াছে। ফলে দিনাজপুর জেলা সদরেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ জন অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। রেল স্টেশন ও ইহার আশেপাশে বুভূক্ষ মানুষের ভিড় ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় রংপুর হইতে হাজার হাজার অসহায় পরিবার দিনাজপুরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।' (ইত্তেফাক, ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'স্মাগলিং হয় সীমান্ত এলাকা হইতে এ খবর সবারই জানা কিন্তু সরকারী খাদ্য গুদামেও যে এই 'কারবার হইয়া থাকে তাহার খোঁজ কেহ রাখেন কি?' (ইত্তেফাক, ১ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'এক মুঠ নুন দ্যাও।' (ইত্তেফাক, ১ আগস্ট, ১৯৭৪)

'দুঃখিনী বাংলাকে বাঁচাও।' (ইত্তেফাক, ১০ আগস্ট, ১৯৭৪)

'ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভাংগে'। (ইত্তেফাক, ২৩ সেপ্টম্বর, ১৯৭৪)

'ওরা বুভূক্ষ মানুষের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে' ঐ

www.pathagar.com

'বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি : দেশ মন্বন্তরের করালগ্রাসে।' (ইত্তেফাক, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

'ক্ষুধার আগুন জ্বলিতেছে।' (ইত্তেফাক, ১ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের লাশ দাফন।' (ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৪)

'উত্তরাঞ্চলে অনাহারে ও কলেরায় দৈনিক দেড় সহস্র লোকের মৃত্যু।' (ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'গত কয় বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অন্যূন ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে, (এবং) শেখ মুজিব দেশব্যাপী ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন।' (ইত্তেফাক ২৭-মার্চ ১৯৭৫)

'১৫ই আগস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এর আগে সাড়ে তিন বছর ধরে ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকার এ দেশে শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের এক ভয়াবহ রাজত্ব কায়েম করেছিলো। এই সময়ে বাংলাদেশে ঘটেছে ভয়াবহ মন্বন্তর।'

'সরকারী হিসেবে বলা হয়েছে, এই মন্বন্তরে সাড়ে সাতাশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারীভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সূত্রে জানা গেছে '৭৪-এর দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও বেশী।'

'এই দুর্ভিক্ষের সূচনা ঠিক চুয়াত্তরে হয়নি, হয়েছে আরো আগে থেকে। বলা যেতে পারে '৭২ সালেই দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। গ্রামবাংলায় যখন চালের দর প্রতিদিন ধাপে ধাপে বাড়ছিলো, সেই সংগে বাড়ছিলো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর এবং ক্রমশ সেগুলো চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। হাজার হাজার কোটি টাকার ধান ও পাট বিদেশে পাচার হয়েছে চোরা পথে। রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানায় দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকরা, যারা ছিলেন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধি তারা শুরু করলেন অবাধ লুণ্ঠন, বিক্রি করে দিলেন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রী।'

'জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো। বিদেশ থেকে আমদানী করা কয়েক হাজার কোটি ডলারেও সেই ঘাটতি পূরণ হলো না, বরং বিদেশী ত্রাণ সামগ্রীও পাচার হয়ে গেল সীমান্তের ওপারে।'

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তি

কামরুজ্জামান

'গত মঙ্গলবার ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে জনাব কামরুজ্জামান বলেন যে, জাতি সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই– এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।' (দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৪)

তাজুদ্দিন

'বাংলাদেশের কতিপয় নেতার বিদেশে ব্যাংক ব্যালান্স রয়েছে, তারা অনবরত দেশ থেকে মুদ্রা পাচার করে দিচ্ছে, ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেশের মানুষ কাপড়ের অভাবে মরছে আর এক শ্রেণীর শিল্পপতি নামধারী লন্ডনে কাপড়ের কল চালু করেছে।' (জনপদ, ১১ মার্চ, ১৯৭৪)

এম এ মোহাইমেন

'দুদিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এডমিনিস্ট্রেটার, পারচেজ অফিসার, ম্যানেজারগণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের যোগ সাজসে প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্র কলে দ্বিগুণ আড়াই গুণ শ্রমিক নিয়োজিত হলো। শ্রমিক ভাতার ব্যাপারে কারচুপির অন্ত রইল না। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেয়া হতে লাগল। পাটকলগুলিতে পাট এবং খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অল্পদিনেই বুঝা গেল ভারতের যেখানে পাটকলগুলি দক্ষ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে পাটকলগুলি জাতীয়করণ করে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য পরিচালকদের দ্বারা পরিচালনা করা মস্ত বড় ভুল হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আমরা বাজার হারাতে লাগলাম আর সে স্থান দখল করল ভারত। পাটকল জাতীয়করণ করার সময় এটা মোটেই খেয়াল করা হয়নি যে, পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র পাট উৎপাদনকারী দেশ নই।

'বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা কেনা ও সূতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হলো। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের একেক জন ম্যানেজারের গড়ে মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজারে এসে দাঁড়ায়। অধিকাংশ সূতা কালো বাজারের মারফৎ সরকারী মূল্যের উপর বেল প্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকার অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌঁছাতে লাগল। বাড়লো তাঁতীদের দুর্গতি, জাতীয়করণ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হলো।' (এম এ মোহাইমেন : 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ,' পৃঃ ১৪)

www.pathagar.com

'১৯৭২ সনে অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রি তৈরী না করেই যাকে তাকে পরিচালক বানিয়ে সেগুলি চালাতে দেওয়া হলো। ইনভেন্ট্রি তৈরী না করে চালাতে দেওয়ার দরুন কারখানা চালু করার সময় তৈরী মালের স্টক কত ছিল তা আর কারও জানবার উপায় রইল না। ফলে আরম্ভ হলো যথেচ্ছ লুট। তখন এক একটি কল-কাখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরি মাল ছিল। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশবাসীর যুদ্ধ চলার দরুন উৎপন্ন দ্রবাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ায় বহু কারখানাতেই প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। '৭২ এর প্রথম থেকেই ঐ সমস্ত মাল লুট হতে আরম্ভ হলো। ১৬ ডিভিশন নামে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গোরা। এত সম্পদ বাঙ্গালী যুবকেরা কখনও এক সংগে চোখে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটা সর্বগ্রাসী বন্যায় দেশ তলিয়ে গেল। সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙ্গালী যুবকদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা। তারপর আরম্ভ হলো লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি।' (এম এ মোহাইমেন : বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, পৃঃ ৪৪)

'এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে, ভারত মনেপ্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোনদিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার লক্ষ্যেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এত সাহায্য করেছিল, এদেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্য সাহায্য করেনি। তাদের এ ধারণা সত্য কি মিথ্যা সে আর এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে যখন বাংলাদেশ হয় তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিল। ঠিক এসময়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এ ধরনের বক্তব্য ও আচরণে অধিকাংশ প্রবীণ ও বুদ্ধিজীবি মহলের ধারণা হলো আওয়ামী লীগ ভারতীয় চিন্তা ও প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে কার্যকারণে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে ভারতীয় স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস আওয়ামী লীগের নেই।'

'ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যকার কতগুলো বিরোধের বিষয়, যেমন ফারাক্কা, দহগ্রাম, আঙ্গুরপোতা ও তালপট্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একান্ত নীরবতা, যেটা জনমনে এ দলের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করেছে।' (এম এ মোহাইমেন : 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ', পৃঃ ৪৪)

'তাই গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবত বাংলাদেশ বলে আসছে নেপালের সঙ্গে মিলে নেপালের পার্বত্য এলাকায় বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য। এভাবে বাঁধ দিলে প্রচুর পানি সংরক্ষণ করা যাবে যা দিয়ে খরা মওসুমে ভারতের ও বাংলাদেশের উভয়ের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। এটি একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা এবং ভারত ও নেপাল রাজি হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিতে ওয়ার্লড ব্যাংক সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত নেপালের সহযোগিতায় ফারাক্কার পানি সমস্যার

www.pathagar.com

মত গুরুতর একটা সমস্যার সমাধানে রাজি হচ্ছে না। ভারতের এ মনোভাবকে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করে। বাংলাদেশকে দুর্বল প্রতিবেশী পেয়ে ভারত ইচ্ছামত যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছে মনে করে বাংলাদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মানুষ সাধারণভাবেই আশা করেছিল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে একটা বক্তব্য রাখবে এবং বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য ভারতকে অনুরোধ জানাবে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।' (এম এ মোহাইমেন : 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ', পৃঃ ৪৫)

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের চিত্র

'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম সমিতি ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে ২৯৩৪টি লাশ কুড়িয়েছে– সবগুলিই বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশী রাস্তা থেকে কুড়ান।' ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার ৭ গুণ এবং অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ান সংখ্যারও প্রায় দ্বিগুণ।

'গ্রাম-বাংলার ছিন্নমূল হতাশ মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারীদের স্থান নিয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্তরে নির্জীবের মত বসে আছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।' (পিটার গিল, ডেইলী টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫)

স্পষ্টতঃই বাংলাদেশের পরাজয়ের সংগ্রাম চলছে। দিনে দিনে বাংলাদেশ আরো গরীব হচ্ছে। কল্পনা করা শক্ত কিন্তু বাস্তব এটাই যে, আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সময়ের অবস্থা থেকে অনেক শোচনীয়। খাদ্য ঘাটতি আগের চেয়ে অনেক বেশী। শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট-এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। শিল্প উৎপাদন এখনো ১৯৬৯-৭০ এর মাত্রায় পৌঁছায়নি– যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক মিলিয়ন।

'সুবিস্তৃত ইউএন 'এইড অপারেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ টনী হেগেন হিসাব করে দেখেছেন যে, রিলিফ সামগ্রীর ৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রকৃত দুঃস্থ লোকদের হাতে পৌঁছেছে।' (কেভিন বিফাটি, ফিনান্সিয়াল টাইম, লন্ডন, ৬ জানুয়ারী, ১৯৭৫)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

'অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবী করেছিল, এই ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিন দিন সময় দেওয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাশ করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।' (পিটার গিল, ডেইলী টেলিগ্রাম, লন্ডন, ১৯৭৫)

'কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও নব্যশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী– এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে,

www.pathagar.com

"স্বাধীন" বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হ'ল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তা অবশ্যম্ভাবী ছিল।' (ফ্রন্টিয়ার কোলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫)

'আওয়ামী লীগের উপর তলায় যারা আছেন, তারা আরো জঘন্য যাদের মুক্ত করেছেন, সেই জনসাধারণের মেরুদন্ড ভেঙ্গে তারা আজ ফুলে ফেঁপে উঠছেন।' (জনাথন ডিম্বলবী, নিউ স্টেটম্যান, লন্ডন, ২৭ সেপ্টম্বর, ১৯৭৪)

'বেসরকারী হিসেবে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। লন্ডনের একটি পত্রিকার সংবাদদাতা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা রংপুর গিয়াছিলেন। তিনি জানান যে, শুধু এ এলাকায়ই ২৫ হাজার লোক মারা গিয়াছে।' –বিবিসি (ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'রিপোর্টে বলা হয়, প্রতি বছর ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টন চাল বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়। এর সবটুকু সরকারের হাতে এলে সরকারের বন্টন ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। খাদ্য উৎপাদন ও আমদানী বাবদ প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের কেবল উদ্বৃত্ত অংশ প্রায় ৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য পাচার হয়েছে।' (গার্ডিয়ান, লন্ডন, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৪)

'এ দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।' ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, 'স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়তো কয়েক ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি, কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি– সবই অনাহারজনিত মৃত্যু।'

'যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল– বোধ করি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশ কঙ্কালই শিশুদের।' (জন পিলজার, ডেইলী মেইল, লন্ডন, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪)

'জরুরী অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরানো জুজুর ভয়ই দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে 'প্রো-পাকিস্তানীরা' এখন সক্রিয়, কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী সরকার যে সরকার ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে– ব্যর্থ হয়েছে– সেজন্যই জরুরী অবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা যায় গ্রামবাংলায়– যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুন্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।' ডেভিট হার্ট, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, হংকং, ১০ জানুয়ারী, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

গণ-জিজ্ঞাসা

শেখ মুজিব তার মনিব রুশ-ভারত অক্ষ শক্তির মদদে পুষ্ট হয়ে এই জাতির স্কন্ধে যে নির্মম স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার অবসান ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। বাংলার অমিত তেজী, চিরজাগ্রত ও মুক্তিপাগল মানুষ যখন একদিকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল এবং অন্যদিকে এই শাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে মুক্তির আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিল, ঠিক তখনি ইতিহাসে মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়। সূচিত হয় ইতিহাসের নবতর অধ্যায়। কিন্তু তারপর, তারপরও গণ মানুষের অন্তরে ভয়ে গেল অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার জবাব হয়তো কেউ পেয়েছেন অথবা পাননি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের জিজ্ঞাসা, একটি গণ জিজ্ঞাসা এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

"স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫শে মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? কোন সাহসে, কিংবা কোন আস্থার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার-আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে।

[মেজর (অবঃ) এম এ জলিল : অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৭-৮]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

শেখ মুজিব ও মীরজাফরের চুক্তির সাদৃশ্য

মুজিব-ইন্দিরার গোপন চুক্তি

(১) বাংলাদেশে ভারত তার ইচ্ছামত, তার পছন্দসই লোক দিয়ে পছন্দসই নেতৃত্ব পাঠিয়ে একটি সামরিক বাহীন গঠন করবে, যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধাসামরিক বলে পরিচিত হবে, কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের দিক থেকে ও সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ রাখা হবে।

(ধারণা করা হচ্ছে, এই বাহিনীই হচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সৈন্যের পোষাক, ভারতীয় সেনানী মন্ডলীর নেতৃত্ব ও ভারতের অভিরুচি অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর লোককে শতকরা ৮০ জন এবং 'বিশেষ বাদ'-এর সমর্থক ২০ জন করে নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। অস্ত্র, গাড়ী, পোষাক, সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এই বাহিনীটি মূল বাহিনীকে ছাড়িয়ে গেছে। এ বাহিনীটি ব্যবহার করা হইবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারত বিরোধী কোন সরকার ঢাকায় ক্ষমতায় বসলেও এ বাহিনী দিয়ে তাকে উৎখাত করা হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী রাজনীতির সমর্থকদের এই বাহিনী দিয়েই দমন করা হবে। এই বাহিনীর মধ্যে ভারতপ্রেমিক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কোন দিন এদেরকে ভারতের বিরুদ্ধে লাগানো যাবে না। এদেশের জনগণ কোন দিন বিপ্লবে অবতীর্ণ হলে, রক্ষীবাহিনীর পোষাক গুণে ভারতীয় সৈন্যরা লাখে লাখে রক্ষীবাহিনী সেজে এদেশের অভ্যন্তরে জনগণকে দমন করতে পারবে)।

(২) বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে যে সামরিক সাহায্য নিয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে বিভিন্নভাবে ঃ (ক) ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের কাছ থেকে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারবে না। মাঝে মাঝে ঘোষণা করতে হবে ভারত থেকে এত কোটি টাকার অস্ত্র কেনা হলো। এর দাম ভারতই ঠিক করে দেবে। সরবরাহ দেওয়া হবে অর্ধেক অস্ত্র। সরবরাহকৃত অস্ত্রও ভারত ইচ্ছামত নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

(অর্থাৎ একই অস্ত্র বারবার দেখিয়ে ১৯৭১-এর পাওনা এবং ভারতের সম্পূর্ণ যুদ্ধ

www.pathagar.com

খরচ আদায় করা হবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনের জন্য সাধারণ অস্ত্র ছাড়া কোন ভারী অস্ত্র, সাজোয়া গাড়ী বা ট্যাংক বাংলাদেশকে দেওয়া হবে না)।

(৩) বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ভারতের অনুমতি ছাড়া কোন পণ্য বিদেশে রফতানী করা যাবে না। কোন পণ্য কত দরে বাইরে রফতানী করতে হবে ভারত সেই দর বেঁধে দেবে। এইসব পণ্য ভারত নিজেই কিনতে চাইলে বাংলাদেশ আর কারো সাথে সে পণ্য বিক্রির কথা আলোচনা করতে পারবে না। বাংলাদেশের আমদানী তালিকা ভারতের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বংলাদেশে বিদেশী পণ্য আমদানীর ব্যাপারে ভারত উদার থাকবে, যে সব পণ্য ভারতকেও আমদানী করতে হয়– সেগুলি আমদানী করানো হবে বাংলাদেশকে দিয়ে। বাংলাদেশ তার বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ভেঙ্গে বিদেশ থেকে যেসব সামগ্রী আমদানী করবে সেগুলি ভারত নিজে আমদানী করবে না। চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ থেকে সেই মালগুলি ভারতীয় টাকায় যোগাড় করবে। বিলাতের সেভেন-ও-ক্লক ব্লেডের বেলায় এবার এটা ঘটেছে। ভারত সেভেন-ও-ক্লক আমদানী করেনি। বাংলাদেশকে দিয়ে বিপুল পরিমাণে অর্থাৎ দেড় কোটি ব্লেড আমদানী করিয়েছে। এখন ভারত বিনা খরচায় সেই ব্লেড পেয়ে গেছে)।

(৪) বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি ভারতকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(বাংলাদেশ যেন স্বাবলম্বী হতে না পারে ভারত সেভাবে পরিকল্পনাগুলি কেটে ছিঁড়ে ঠিক করবে। আইয়ুবী আমলে বাংলাদেশে পরিকল্পনার অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদনশীল খাতে। ভারত বাংলাদেশের উন্নয়নকে অনুৎপাদনশীল রেখে দিতে চায়। ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাজেটে একই অবস্থা দেখা গেছে। আগামী মহাপরিকল্পনা এখন ভারতের কাছে পাঠানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাতেও অনুৎপাদনশীল খাত প্রাধান্য পাবে)।

(৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অনুবর্তী রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার চুক্তিগুলি বাংলাদেশ একতরফাভাবে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ভারত এ চুক্তিগুলির কার্যকারিতা অস্বীকার না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তিমালা বলবৎ থাকবে।

www.pathagar.com

(৭) ডিসেম্বর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় সৈন্যরা যে কোন সংখ্যায়, যে কোন সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধা প্রদানকারী কোন মহলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের অভিযানের প্রতি বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারত চুক্তিটি নাকচ না করলে বৎসর বৎসরান্তে এ চুক্তি বলবৎ থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে ভারত মোটামুটি এ ধরনের চুক্তিগুলি সম্পাদন করে। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাজুদ্দিন আহমদরা। বাংলাদেশকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে এমনি ঠগ ও শঠতাপূর্ণ চুক্তিতে বাঁধা হয়েছিল।

মীরজাফারের চুক্তি

"আমি আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জবীনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তবলী মানিয়া চলিব।

ধারা-১ ঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেইসব ধারা সম্মতি লাভ করিয়াছিল, আমি সেইসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা-২ ঃ ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা-৩ ঃ জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলি ইংরেজদের দখলে থাকিবে এবং আমি কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) ওই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা-৪ ঃ নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেইসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোড় তঙ্কা প্রদান করিব।

ধারা-৫ ঃ কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা-৬ ঃ কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু), মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে 'জেন্ট' এবং মুসলমানদেরকে 'মূর' ও 'মেহোমেটান' বলে চিহ্নিত করত)।

www.pathagar.com

ধারা-৭ ঃ কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ-ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, ইউলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

ধারা-৮ ঃ কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা-৯ ঃ কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারে থাকিবে।

ধারা-১০ ঃ আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

ধারা-১১ ঃ হুগলীর সন্নিকট গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা-১২ ঃ তিনিট প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আমি উপরিউক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিব।

---

www.pathagar.com

আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের খতিয়ান
(১৯৭২-১৯৭৫)

কালবাজারী	৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
পাচার	২ হাজার কোটি টাকার মালামাল
জালিয়াতী	১৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল
ব্যাংক লুট	৫ হাজারেরও বেশী
অস্ত্র লুট	দেড় শতাধিক (রাইফেল, এস এল আর, প্রভৃতিসহ প্রায় ১৫ হাজার)
ধর্ষণ	প্রায় ১৫ হাজার
সরকারী মিথ্যা আশ্বাস	প্রায় ১২ হাজার
অবৈধ দখল	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ঘর-বাড়ি মিলে প্রায় ১৩ হাজার, জমি ৫০ হাজার একর
সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়	৪ শতাধিক
দুর্ভিক্ষে মৃত্যু	১০ লক্ষ লোক
পুষ্টিহীনতায় মৃত্যু	২ লাখ লোক
বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু	১ লাখ লোক
জেলখানায় মৃত্যু	৯ হাজার লোক
আওয়ামী-বাকশালী গুন্ডা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে মৃত্যু	২৭ হাজার লোক
রাজনৈতিক হত্যা	১৯ হাজার লোক
গুম/খুন	১ লাখের উপর লোক
পিটিয়ে হত্যা	৭ হাজার লোক
আওয়ামী গুন্ডা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গু	২৬ শত লোক
গ্রেফতার ও নির্যাতন	২ লাখ লোক
হাইজ্যাক/ছিনতাই	২২ হাজারটি
চুরি-ডাকাতি/রাহাজানি/লুটপাট আগুন লাগানো হয়েছে	৭২টি পাটের গুদাম

www.pathagar.com

‘যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি।

বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।’

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ’
(ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)
স্টেটস্‌ম্যান, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮